আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

বহুমুখিতায় ও স্বপ্নচারিতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

বহুমুখিতায় ও স্বপ্নচারিতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

বহুমুখিতায় ও স্বপ্নচারিতায়

সম্পাদনা

আতাউর রহমান

মাওলা ব্রাদার্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন ঢাকা ১১০০

দাম
চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

অনলাইনে বই কিনুন
www.rokomari.com/mowlabrothers
www.porua.com.bd

ISBN 978 984 91325 2 3

ABDULLAH ABU SAYEED : BOHUMUKHITAY O SWAPNOCARITAY (a felicitation book on Abdullah Abu Sayeed) Edited by Ataur Rahman. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhrubo Esh. Price : Taka Four Hundred and Fifty only.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

বাবা ও মা-কে

মু. মুজিবুর রহমান, একজন অক্লান্ত শিক্ষাব্রতী
শওকত আরা বেগম, নেপথ্যাচারী সহযোগী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতজ্ঞতা কোথায় যে রাখি!

আমি কণ্ঠস্বর খুঁজে পেলাম উত্তাল
ছয়ের দশকে
(বাঙালিয়ানা আর বিশ্ববীক্ষার অপূর্ব যুগলে বন্দি)
দু'চোখে চশমা নয়, ঝিলমিল স্বপ্ন
মলমের মতো মেখে দিলেন সায়ীদ ভাই
আমাদেরই দুই চোখে
আমাদের সবেধন নীলমণি
আমাদের একমাত্র বুদ্ধদেব বসু।

ক্রমে ক্রমে ঢাকা বাড়ে
জোয়ান মরদ পোলা ঢাকা,
সুদর্শনা নয়ন-লোভন বুড়িগঙ্গা
আরও বৃদ্ধা হলো
নিজের দুর্গন্ধে কাতর
ভেসে যায় বিদেশি প্রসাধনের ঢেউ তুলে
নরনারী
আমার আমাদের চুল... পেকে গেল,

আমাদের কেউ কেউ খ্যাতি ও অখ্যাতির
সাগর পেরিয়ে গেছে,
কেউ কেউ ফিনফিনে স্মৃতি-বিস্মৃতির
সুরভিত ভাঁজ খুলে খুঁজে চলে
হৃদয় গহন দ্বারে
নিজেদের সেই কণ্ঠস্বর
হৃৎপিণ্ডে আল্লারাখার আঙুলের কারুকাজ।

কৃতজ্ঞতা কোথায় যে রাখি!

আসাদ চৌধুরী : কবি ও সাহিত্যিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পাদকের কথা

এ-সময়ে এদেশে আমরা যাদের ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, তাঁরা প্রত্যেকেই একেকজন কর্মালোকিত মানুষ। নিজের কাজ দিয়ে তাঁরা নিয়ত আলোকিত করে যাচ্ছেন চারপাশের মানুষ ও সমাজ এবং বৃহত্তর অর্থে গোটা জাতিকে। তাঁদের কেউ প্রতিনিধিত্ব করছেন কর্মজগতের, কেউ-বা করছেন চিন্তাজগতের প্রতিনিধিত্ব। কিন্তু এ-দুয়ের এক সুষম সমন্বয় ঘটাতে পেরেছেন এমন মানুষ আজকের সমাজে বিরল, বোধ করি সব কালে সব সমাজেই। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এ বিরলপ্রজ মানুষদেরই একজন। শিক্ষকতা, সাহিত্য আন্দোলন, লেখালেখি, উপস্থাপনা— সব মিলিয়ে একদিকে তিনি আপাদমস্তক একজন সৃজনশীল ও চিন্তাজগতের মানুষ; অন্যদিকে তাঁর রয়েছে এক সমৃদ্ধ ও সুবিশাল সাংগঠনিক কর্মযজ্ঞ— বইপড়া কর্মসূচি থেকে পরিবেশ আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত যার পরিধি।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ব্যক্তিচরিত্রের নানা দিক এবং তাঁর চিরায়ত মূল্যবোধ ও সংগঠন ভাবনা, দেশ-জাতি-মানুষের সম্ভাবনায় তাঁর অদম্য আস্থা, কর্মপ্রাণ আনন্দচিত্ততা— এমনি নানান কথা আমরা জানতে পারি অধ্যাপক সায়ীদের শিক্ষক, ছাত্র, অনুরাগী, সহকর্মী-সহযাত্রীদের সাদামাটা মূল্যায়নে, জীবনের নানা পর্যায়ে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ও তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন বিচিত্র রকম কাজের সূত্রে। বিভিন্ন সময়ে একাধিক জাতীয় দৈনিক ও স্মরণিকায় প্রকাশিত এবং অতিসম্প্রতি রচিত এমন কিছু লেখা নিয়েই এ সংকলন। উৎসাহী পাঠক হয়ত এর মধ্য থেকেই খুঁজে পেতে পারেন বহুমুখিতা ও স্বপ্নচারিতায় অনন্য একজন পূর্ণাঙ্গ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে।

যাদের লেখা এখানে স্থান পেয়েছে, এ সংকলনের জন্যে যারা নতুন করে লিখেছেন এবং আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লেখা দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেননি যারা, তাঁদের সবার প্রতিই জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ার পর থেকেই তাঁদের সবার আন্তরিক উৎসাহ, আগ্রহ, অনুপ্রেরণা এবং নানামুখী কর্মব্যস্ততার মাঝে সময় করে এর জন্যে লেখা, আক্ষরিক অর্থেই পুরো কর্মপরিকল্পনাটিকে বেগবান করেছে।

সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

২৫ জানুয়ারি, ২০১৫ **আতাউর রহমান**
ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাঁরা লিখেছেন

১৩ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
২৮ আনিসুজ্জামান
৩১ শঙ্খ ঘোষ
৩৫ মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
৩৯ মনজুরে মওলা
৪১ আবদুশ শাকুর
৪৩ আমিনুল ইসলাম
৫১ আবদুল মান্নান সৈয়দ
৫৫ আবেদ খান
৫৯ নির্মলেন্দু গুণ
৬৫ মতিউর রহমান
৬৭ আবুল মোমেন
৭১ ফকির আলমগীর
৭৯ মুহম্মদ নূরুল হুদা
৮২ অসীম সাহা
৯০ জুয়েল আইচ
৯৩ আবিদ আনোয়ার
৯৫ আমিনুল ইসলম ভুইয়া
১০১ আলী ইমাম
১০৭ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
১১১ হোসেন জিল্লুর রহমান
১১৪ খায়রুল আলম সবুজ
১১৯ মুহম্মদ জাফর ইকবাল
১২২ শামীম আজাদ
১২৬ আতিউর রহমান
১২৯ হাসান ফেরদৌস
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ১৩১
ফরিদুর রেজা সাগর ১৩৬
ইমদাদুল হক মিলন ১৪২
মোহন রায়হান ১৪৭
হাবীব আহসান ১৫৭
বুলবুল সরওয়ার ১৬৫
লুৎফর রহমান রিটন ১৬৯
আহমাদ মাযহার ১৭৫
আমীরুল ইসলাম ১৮১
আনিসুল হক ১৮৩
আবদুন নূর তুষার ১৯৩
ধ্রুব এষ ১৯৬
টোকন ঠাকুর ২০১
মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম ২০৫
গোলাম মোর্তোজা ২১৪
মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান ২১৭
আতিকুজ্জামান ২২৪
মাহমুদ হাশিম ২৩২
রাজীবন সরকার ২৩৭
নিশাত মজুমদার ২৪০
আঁখি সিদ্দিকা ২৪২
আতাউর রহমান ২৪৮

পরিশিষ্ট

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি ২৫৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ভূতেপাওয়া একজনকে নিয়ে আরেকজনের কথা

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নিশ্চয়ই একজন ভূতেপাওয়া মানুষ; নইলে তিনি অসাধারণ সব কাজ অমন অনায়াসে করেন কি করে? অধ্যাপনায় সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে সরকারী কলেজের নিশ্চিন্ত চাকরী ছেড়ে দেন, নিজে লেখেন, নতুন লেখকদের আধুনিকতার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, পত্রিকা সম্পাদনা করেন, টেলিভিশনের উপস্থাপক হিসাবে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেন, সর্বোপরি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো অতুলনীয় একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন— বিভিন্ন রকমের এতগুলো কাজ করা ভূতে না-পেলে সম্ভব নয়। মেধা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু কেবল মেধা থাকলে চলে না, বড় কাজের জন্য পাগলামিও চাই। ওই পাগলামিতে তাঁকে পেয়েছিল শৈশবেই, না-পেলে তিনি ভিন্ন মানুষ হতেন। সফল একজন অধ্যাপক হিসাবে অবসর নিতেন, নামী লেখক বলে পরিচিত হতেন; কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিশীলতা উদ্ভাবন ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে বহুমানুষকে কাছে টেনে-নেওয়া, তাদেরকে গ্রন্থমনস্ক করে তোলা এবং প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকা— এসব সম্ভব হতো না।

ভূতে আমাকেও পেয়েছিল। সাহিত্যের ভূতে। সে-জন্য এটা অনিবার্য ছিল যে, এক সময়ে না এক সময়ে এক ভাবে না এক ভাবে সায়ীদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটবে, এবং সে-পরিচয় অনতিবিলম্বে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হবে। সেটা ঘটেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে। ছাত্রজীবন শেষে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছি, তাও আবার সাহিত্যের শিক্ষক, আর সায়ীদ তার সাহিত্যপ্রীতির তাড়নায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে ছাত্র হয়ে, যা তাকে আসতেই হতো। যোগাযোগটা ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবাহেই। আমার শিক্ষকতার শুরু আর সায়ীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ একই সময়ের ঘটনা। দেখা হয়েছে সাবসিডিয়ারী ক্লাসে। সেখানে আরো অনেকে ছিল, কিন্তু সবচেয়ে আগ্রহী ও সপ্রতিভ ছিল আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

আমার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের একটি অভিযোগের কথা এখনো শুনতে পাই; ক্লাসে আমি তাদের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতাম না। সেটা সত্য। তাকাতাম না ভয়ে। না, মঞ্চভীতি নয়; মঞ্চে দাঁড়াবার অভিজ্ঞতা ছাত্রজীবনে বেশ ভালো পরিমাণেই সংগ্রহ করেছিলাম। আমার পিতা, যিনি আশা করতেন আমি আমলাতন্ত্রের সদস্য হবো, তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'দেখো বাবা, পা যেন না কাঁপে।' তাঁর ওই বলার মধ্যে উদ্বেগ ছিল, আবার ভরসাও ছিল বলে ধারণা করি। ভরসা ছিল পা কাঁপলে আমি শিক্ষকতার ভীতিজনক পথ ছেড়ে দিয়ে সরকারী চাকরীর জন্য পরীক্ষা দিতে বসে যাবো। না, পা কাঁপবে এমন ভয় করি নি, ভয় করেছি ছাত্রছাত্রীদের অন্যমনস্কতাকে। যদি দেখি তারা শুনছে না, উসখুস করছে, অথবা বিরক্ত হচ্ছে তাহলে আমার কথা বলা থেমে যাবে, আমি দমে যাবো, এটা ধরে নিয়েই তাদের সম্ভাব্য ভঙ্গিগুলোকে অবজ্ঞা করতে চাইতাম, তাদের দিকে তাকাতাম না। তবে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে ঠিকই টের পেতাম আমার কথা তাদের কাছে কতটা গ্রাহ্য হচ্ছে। ওই আমার শিক্ষকতার প্রারম্ভে সাবসিডিয়ারী ক্লাসে সায়ীদকেই মনে হয় মানদণ্ড হিসাবে বেছে নিয়েছিলাম। ওকে যদি সন্তুষ্ট করতে পারি তা হলে অন্যদেরকেও পারবো, চিন্তাটা ছিল এই রকমের। ধারণা করি একেবারে ব্যর্থ হই নি, কেননা সায়ীদের সঙ্গে নৈকট্যটা ক্লাসের মধ্যে আটকে থাকে নি, প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল বাইরেও। সেকালে ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে সভা সমিতি এবং বিভাগের আয়োজনে সেমিনার হতো, দেখা হতো সেখানেও। অচিরেই সম্বন্ধটা আর ছাত্র-শিক্ষকের থাকে নি, দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বন্ধুত্বের।

সায়ীদ আমাকে 'স্যার' বলতেন, এখনো বলেন। সেটা স্বাভাবিক। ওই সম্বোধন অনেকের কাছ থেকেই পেয়েছি, এখনো পাই। কিন্তু সায়ীদের স্যার বলাটা ছিল ভিন্ন রকমের। এখন দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা খুবই কম হয়, কিন্তু ওঁকে মনে পড়লে প্রথমেই ওই বিশেষ সম্বোধনটা শুনতে পাই। গলার আওয়াজে তো বটেই, সেটা তো ছিলই, টেলিভিশনে ওঁর ঈর্ষণীয় সাফল্যের একটি কারণ তো ওই প্রাণবন্ত কণ্ঠস্বর, কিন্তু ওঁর স্যার সম্বোধনের ভেতরে একটা প্রসন্নতা থাকতো, একটু টেনে উচ্চারণ করতেন, ধরা পড়তো আবেগ ও আন্তরিকতা।

বাংলাভাষায় সর্বনাম নিয়ে নানান ঝামেলা আছে। বিড়ম্বনা, দ্বিধা ইত্যাদি ঘটে। কিন্তু আমাদের সম্বোধনের বেলায় সেটা ঘটেনি। সায়ীদকে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে শুরু থেকেই 'আপনি' বলে এসেছি। একটা কারণ আমাদের বয়সের ব্যবধানটা খুব বেশী নয়; বড় কারণ পারস্পরিক সম্ভ্রমবোধ। অনুচ্চারিত অবস্থায় ভেতরে নিশ্চয়ই এই অনুভবটাও কাজ করেছে যে মাস্টারির দাবী নিয়ে তাকে যদি তুমি বলি তা হলে বন্ধুত্বের সম্পর্কটা সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা একটি আনুষ্ঠানিকতার শুকনো কাঠখোট্টা জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবো, সম্পর্কটা হবে ছাত্র-শিক্ষকের। সেটি হতো সর্বনাশা এক কাণ্ড। স্নেহ সবসময়েই যে নিম্নগামী হবে এমনটা নিশ্চয়ই নয়, একই সমতলেও সে চলতে পারে। বিশেষ করে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে বৈষম্য তো একেবারেই অগ্রাহ্য।

শিক্ষকতার ওই প্রাথমিক দিনগুলো ছিল আমার জন্য স্বর্ণযুগ। আমার স্ত্রী নাজমা জেসমিন ওর ছাত্রীজীবন শেষে একটি গল্প লিখেছিল, নাম দিয়েছিল *নানা রঙের দিনগুলো*। আমার নিজের দিনগুলো ছিল ঠিক ওই রকমের। ভূতেপাওয়া এই আমি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছিল আমার জন্য একটি রহস্য-রোমঞ্চের জগৎ, সেখানে তখন আমার অবাধ প্রবেশাধিকার। সন্ধ্যায় ক্লাবে গিয়ে সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশোনা; শিক্ষকদের সঙ্গে নানা উপলক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা; পত্রিকায় লেখা, নাজিমুদ্দিন রোডের রেডিও স্টেশনে আনাগোনা; সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করা, ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়ানো; মনে হতো যেন সবকিছু পেয়ে গেছি, কিছুই আর বাকি নেই।

এর মধ্যে ছিল সায়ীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব। আমরা ক'জন তরুণ শিক্ষক থাকতাম রেললাইনের গা-ঘেঁষা বখশি বাজারের একতলা একটি বাড়িতে। গাছপালা লতাপাতায় ঘেরা চমৎকার একটা আবাসগৃহ। সায়ীদ সেখানে আসতেন। আমার সহকর্মীরা ওর নাম দিয়েছিলেন আমার 'ছাত্রবন্ধু'। ঠাট্টা করেই নাম-দেওয়া, কেননা তাঁদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার তুলনায় সায়ীদের সঙ্গে আলাপ করাটা আমার জন্য কিছু কম আনন্দের বিষয় ছিল না। ভূতেপাওয়া দু'জনের আলাপচারিতা শেষ হতে চাইতো না। বাসায়, রাস্তায়, দোকানে জিনিস কিনতে কিনতে, বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে, রেস্টুরেন্টে বসে, সাহিত্য থেকে শুরু করে লোকজনের আচার-ব্যবহার সবকিছু নিয়ে কথাবার্তা চলতো। আমরা উভয়েই হাসতে ভালোবাসতাম। খুব ঘন ঘন হাসির প্রসঙ্গ এসে যেত।

সায়ীদের ছিল চমৎকার গল্পবলার দক্ষতা। একবার একজন জ্ঞানপিপাসু ছাত্র গ্রন্থাগারে আটকা পড়ে গিয়েছিল। সেদিন ছিল শনিবার, হাফ হলিডে, বিকেল পাঁচটায় দারোয়ানরা গ্রন্থাগারে তালা মেরে চলে গেছে। ছেলেটি খেয়াল করে নি। যখন খেয়াল করলো তখন শিকের ওপাশ থেকে তার আর্তধ্বনি। পরের দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিবার। তালা খুলবে সোমবার সকালে। স্বভাবতই সে ভয় পেয়ে গেছে। সায়ীদরা ছিল আশেপাশে। তারা তাকে উদ্ধারের চেষ্টায় লেগে গেছে, তালার চাবি কার কাছে আছে তার সন্ধানে লোক পাঠিয়েছে। সায়ীদ বর্ণনা করছিলেন পরিস্থিতির। 'স্যার, এর মধ্যেও আবার দেখি কেউ কেউ নানাবিধ কৌতুক নিষ্কাশনে ব্যস্ত।' বিবরণের অন্যকিছু মনে থাকুক না-থাকুক, 'নিষ্কাশন' শব্দটি এখনো মনে আছে। ওরকম যুৎসই শব্দ সায়ীদের কথায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে আসতো। মনে পড়ে একজন গবেষককে নিয়ে সায়ীদের উক্তির কথা। গবেষকের স্বাস্থ্য ভালো, আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড, তাঁকে সায়ীদ প্রশংসা করেন, কিন্তু ভদ্রলোকের আচার-আচরণ ছিল আক্রমণাত্মক। সায়ীদের ভাষায়— 'বুঝলেন স্যার, ভীষণ! একেবারে শত্রুর মতো চেহারা।' ওঁর সহজাত কৌতুকপ্রিয়তা এভাবেই বক্তব্যকে সজীব করে রাখতো।

কিন্তু সায়ীদ কেবল বন্ধু ছিলেন না, ছিলেন আমার অভিভাবকও। এই লেখাটা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছিল এর অন্যদু'টি নামও রাখা যেতে পারতো, একটি, 'আমার অভিভাবক', অপরটি 'এক যাত্রায় দুই যাত্রী'। দুটির কোনোটিই অযথার্থ হতো না। অভিভাবকত্বের কথাটিই প্রথমে বলা যাক। সায়ীদ তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা *নিষ্ফলা মাঠের কৃষক* বইতে লিখেছেন যে, আমার সম্পর্কে তাঁর খেদ আছে, কারণ তাঁর প্রত্যাশা আমি পূরণ করতে পারি নি। প্রত্যাশা ছিল বেশী, তাই খেদটা গভীর। ব্যাপারটাতে কোনো ভুল নেই। এই জায়গাটাতে আমার ব্যর্থতা আমি বুঝি, এবং ওঁর দুঃখের কারণে ব্যথিত হই। কিন্তু ঘটনাটি অনিবার্য ছিল। আর সেখানেই আসে দ্বিতীয় শিরোনামটির যথার্থতা। আমরা একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিলাম, অভিন্ন ছিল আমাদের সে যাত্রা, কিন্তু একসঙ্গে বেশী দূর চলা হয় নি; কিছু দূর গিয়ে আমরা নেমে গেছি একটি স্টেশনে, সেখান থেকে দু'জনের যাত্রা দুই পথে। এটি বন্ধুদের মধ্যে বিস্তর ঘটে। আমাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। কারণ সায়ীদের কাঁধে ছিল একটা ভূত, সাহিত্যের; আমার কাঁধে চেপে বসেছিল একটি অতিরিক্ত ভূত, সমাজবিপ্লবের। আমার অপ্রশস্ত কাঁধ থেকে ওই দু'টির কোনোটিই নেমে যেতে রাজি হয়নি; তাছাড়া আমি যে তাদের নামাতে চেয়েছি এমনটাও বলা যাবে না। ব্যাপারটা সায়ীদ জানেন, সে-কথা তিনি বলেছেনও তাঁর ওই লেখাতে। আমার 'ব্যর্থতা'র ব্যাখ্যা রয়েছে ওইখানেই, সাহিত্য ও সামাজিক বিপ্লবের যুগল ভূতের ওই ভুতুড়ে কাণ্ডে। যদি অদ্ভুতই না-হবে তবে ভূত কেন?

অভিভাবক পাওয়ার ব্যাপারে আমার ভাগ্য মোটেই অপ্রসন্ন নয়। ছাত্রজীবনে আমার বিশেষ বন্ধু ছিল আরেকজন সাঈদ; আবু জাফর আহমদ সাঈদ। ইতিহাস পড়তো, চট্টগ্রামের ছেলে, কর্মজীবন সেখানেই কাটিয়েছে; এখন নেই, কিছুদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে চলে গেছে। যতদিন একসঙ্গে ছিলাম জাফর আমার ভালোমন্দের ওপর চোখ রাখতো, সুবিধা-অসুবিধার খবর নিতো, সর্বদাই আমার উন্নতি চাইতো। সেটা এক ধরনের অভিভাবকত্ব, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদেরটা আরেক ধরনের। ওঁর চোখ ছিল আমি যাতে সাহিত্যচর্চায় সঠিকভাবে নিয়োজিত থাকি সে-দিকে। যেন পথচ্যুত না হই। সায়ীদের মতে সঠিক পথটা ছিল গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে একাগ্র চিত্তে সাহিত্যচর্চা করার, পারলে ওঁদের মতো আধুনিক হওয়ার। আমার সাহিত্যজীবনের দিকে আরেকজনও খেয়াল রাখতেন; তিনি কবি আবদুল কাদির। তাঁর সম্পাদিত *মাহে নও* পত্রিকায় আমার গোটা দুয়েক গল্প ছাপা হয়েছিল, তিনি আমার প্রবন্ধও পড়েছেন। আমার বন্ধু মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, যিনি এই সেদিন চলে গেলেন, কাজ করতেন *মাহে নও*-তে। আবদুল কাদির তাঁকে বলেছিলেন পত্রিকায় কলাম লেখার লোক আরো পাওয়া যাবে, আমি যেন ও-লাইনে না-গিয়ে সাহিত্যকে গুরুত্বের সঙ্গে নেই। বিবেকানন্দের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, চালাকি দিয়ে জগতে কখনোই কোনো মহৎ কর্ম সিদ্ধ হয় নি। ওদিকে মাহফুজউল্লাহ আমাকে উদ্বুদ্ধ করতেন তাঁর *পূবালী* পত্রিকায় *ঢাকায় থাকি* কলামটা লেখার জন্য। পত্রিকায় এর পরেও কলাম আমি লিখেছি, আনন্দের সঙ্গে, এবং ওই যে দ্বিতীয় ভূত, আদর্শবাদিতার, সেই ভূতের তাড়া খেয়ে। এখন আর লিখি না, আদর্শবাদিতা জিনিসটা এখন আগের তুলনাতেও অগ্রাহ্য হয়ে পড়েছে। তাই বলে সাহিত্যের ব্যাপারে পত্রিকায় কলাম লেখাটাই যে আমার প্রধান কর্তব্য এমনটা কিন্তু কখনোই মনে করি নি।

সায়ীদের অভিভাবকত্বের দরুন একবার আমরা দু'জনেই একটা বিপদের মুখে পড়েছিলাম, যা নিয়ে পরে আমরা বিস্তর হাসাহাসি করেছি। আমি ছোট্ট একটি লেখা লিখেছিলাম *দৈনিক আজাদের* সাহিত্যপাতায়। নাম ছিল *বাকিটা চাহিয়া লজ্জা দিবেন না*। তখনকার দিনে মুদীদোকানীরা দোকানে 'বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না' বলে একটি নোটিশ টানিয়ে রাখতো, ওই নিষেধাজ্ঞাকেই একটু ঘুরিয়ে আমার লেখাটা তৈরী। তাতে বক্তব্য ছিল এই রকমের যে, সাহিত্যে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই সই, এর বাইরে দাবী করাটা অন্যায়। বাকিটা রহস্য হিসাবে থাকা দরকার, নইলে সাহিত্যের সঙ্গে সাংবাদিকতার কোনো পার্থক্য থাকে না। দেশ-বিদেশের সাহিত্য থেকে দু'চারটি দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকব। *আজাদ* পত্রিকার সাহিত্যপাতার দায়িত্বে ছিলেন পরিচিত একজন, তাঁর অনুরোধেই ওটি লেখা। সায়ীদ তখন মুন্সিগঞ্জে, পিত্রালয়ে। সেখান থেকে পোস্টকার্ডে অত্যন্ত পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, এ ধরনের হালকা লেখা 'অমুকে' লিখবে, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

কেন লিখতে যাবো? অমুক সায়ীদের এক বন্ধু, সেই সময়ে সাহিত্যবিষয়ে যিনি প্রচুর লিখতেন। এর কয়েকদিন পরে সায়ীদ ঢাকায় এসেছেন। আমার বখশি বাজারের কামরায় আসছিলেন, পথিমধ্যে ওই লেখক বন্ধুটির সঙ্গে দেখা, এবং তিনিও চলে এসেছেন, সঙ্গী হয়ে। দু'জনে মিলে যখন আমার কামরায় ঢুকেছেন, সায়ীদের পোস্টকার্ডটি তখন আমার টেবিলের ওপর বেশ দৃশ্যমান অবস্থায় পড়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে আগন্তুক ভদ্রলোক, 'আরে আমার নাম দেখছি' বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সায়ীদ স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় পোস্টকার্ডটি হস্তগত করে নিজের পাঞ্জাবির পকেটে পুরে ফেলেছেন। 'না, কিছু না' জাতীয় অস্ফুট একটি মন্তব্য হয়তো করেছিলেন। নিজের নাম অন্যদের দখলে দেখে ভদ্রলোক কী মনে করলেন কে জানে, কিন্তু আমরা তিনজনই যে একটি ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম সেটি ধ্রুব সত্য।

নিষ্ফলা মাঠের কৃষক বইতে সায়ীদ ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে তাঁর জীবনে যে-সকল শিক্ষক প্রভাব ফেলেছেন তাঁদেরকে স্মরণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষকদের ভেতর আটজন 'উজ্জ্বল' শিক্ষকের মূল্যায়ন করেছেন তিনি, যাঁরা তাঁর ভাষায়, 'মতৈক্য ও মতানৈক্যের পথে আমাকে প্রভাবিত করেছেন এবং আজও আমার অস্তিত্বের গভীরে কোথাও-না-কোথাও বেঁচে আছেন।' তালিকার শুরুতে আছেন মুনীর চৌধুরী, শেষে আমি, মাঝখানে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, ড. আহমদ শরীফের মতো খ্যাতিমান শিক্ষকেরা। ওই তালিকায় স্থান পাওয়াটা আমার জন্য শ্লাঘার বিষয়। তালিকার অন্যসবাই একে একে চলে গেছেন, আমিই শুধু টিকে আছি, তার কারণ আমি ছিলাম কনিষ্ঠতম। আমার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যে ওই অভিভাবকত্বের কথাটা আছে। শুরু করেছেন বন্ধুত্বের বিষয়টা দিয়ে, উল্লেখ করেছেন আমার জীবনের খুব বড় একটি ঘটনার, যে উৎসবে তিনিও যোগ দিয়েছিলেন। সায়ীদের বিবরণে সেটা এসেছে এইভাবে, 'তাঁর (অর্থাৎ আমার) বরযাত্রাতেও আমি তাঁর সহকারী হিসেবে গাড়িতে তাঁর পাশে বসে গিয়েছি এবং বিয়েবাড়ির যুদ্ধমান পরিস্থিতিতে বরের সহকারীর ভূমিকা যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছি।' সায়ীদের এই বিশেষ ভূমিকাপালনটি খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে এবং সেটি ছিল অভিভাবকের দায়িত্ববোধেরই স্বতঃস্ফূর্ত সম্প্রসারণ। বরযাত্রীদের ভেতর আমার সহোদর ভাইরা এবং আপনজনেরা ছিলেন, কিন্তু কারো কাছেই এটা অপ্রত্যাশিত মনে হয় নি যে বরের পাশে সায়ীদ থাকবেন; ওঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতার বিষয়ে এঁরা অবহিত ছিলেন। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সেই নাজমা ছিল সায়ীদের সহপাঠী; তা সহপাঠী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো দূরবর্তী, পাত্রী যদি নিকট আত্মীয়ও হতো তবু সায়ীদের টানটা থাকতো আমার দিকেই। অভিভাবকত্বের দায়টা বড় সামান্য নয়। কোথায় আমার বিয়ে হয়, কার হাতে গিয়ে পড়ি, তাতে আমার ভেতরে যে-প্রতিশ্রুতি দেখা গিয়েছিল সেটির অগ্রগমন ব্যাহত হয় কি না, এ নিয়ে ওঁর উদ্বেগ ছিল। নাজমাকে জানতেন, তাই হয়তো মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে তেমন কোনো বিপত্তি ঘটবে না। ভালো কথা, নাজমা নিজেও গল্প লিখতো, কিন্তু অগ্রগামী পুরুষ সহপাঠীদের সঙ্গে এ কাজে তার কোনো যোগাযোগই ছিল না। থাকবে যে এমন সম্ভাবনাও দেখা দেয় নি। নাজমা দূরের কথা, কোনো মেয়েকেই দেখা যায় নি ওঁদের দলে। সায়ীদরা শুধু যে মেধাবী ছিলেন তা নয়, পুরুষতান্ত্রিকও যে ছিলেন, এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

ওই অনুষ্ঠানে আমার প্রধান অভিভাবক ছিলেন আমার পিতা। যদিও ভিন্ন কারণে, তবু তাঁরও উৎকণ্ঠা ছিল উপযুক্ত স্থানে আমার বিবাহের ব্যাপারে। সেই সন্ধ্যায় আমার ওপর তিনি কতটা চোখ রাখছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল ভিড় কমলে তিনি যখন একটি কমলালেবু আমাকে দিয়ে বললেন, 'নেও, খাও'। কমলালেবুর প্রতি আমার পক্ষপাত তাঁর জানা ছিল, এবং অতসব ব্যস্ততার ভেতরেও একটি ফল সঙ্গে নিয়ে আসতে ভোলেন নি। ওটিও অভিভাবকত্বই। বরযাত্রায় সায়ীদ যখন আমার সহযাত্রী ততদিনে তিনি নিজেও কিন্তু শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছেন। কেবল তাই নয়, ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের অপ্রত্যাশিত দায়িত্বও তাঁকে নিতে হয়েছে। অন্যদিকে *পূবালী*-তে আমার *ঢাকায় থাকি* কলামে যে-আধুনিকদের সাহিত্যচর্চার বিরুদ্ধে আমি লিখছি, তাঁদের নেতা ছিলেন সায়ীদ। আমি যে তাঁর নাম দিয়েছিলাম 'পালের গোদা' সেই নামও যে ওঁর নিজস্ব মহলে বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল, তার উল্লেখ আছে ওঁর বই *ভালোবাসার সাম্পান*-এ। বোঝা যায় যে, আমার ওই বিরুদ্ধতাকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নেন নি।

তবে দুঃখ যে পেয়েছেন, সেটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। কেবল দুঃখ নয়, হতাশাও আঘাত করেছে। অভিভাবকের হতাশা। *ভালোবাসার সাম্পান*-এ সায়ীদ লিখেছেন, আমি যেহেতু 'ইংরেজি সাহিত্যের সর্বশেষ আধুনিকতায় পরিশীলিত' তাই ওঁদের আশা ছিল আমার কাছ থেকে সমর্থন না হলেও সহানুভূতি পাবেন। 'কিন্তু তাঁর (অর্থাৎ আমার) আক্রমণ ছিল ছুরি দিয়ে পেঁচিয়ে ত্বক ফালি ফালি করে ফেলার মতো। এই রুগ্ন দলের "পালের গোদা"র উপাধিটা তিনিই এ লেখায় আমাকে দেন।' কলামটা ছদ্মনামে লেখা হলেও কে যে লিখতো তা সবাই জানতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সায়ীদ না করলেও তাঁর সহযাত্রীরা যে আমার সম্পর্কে কটুকাটব্য করতো তা আমার কানে পৌঁছাবে না, এমন সম্ভাবনা মোটেই ছিল না। পৌঁছাতো। 'নাগরিক' ছদ্মনামে লিখতাম; ওরা বলতো লোকটা নাগরিক হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না, চাষার মতো গ্রাম্যই রয়ে গেছে; ওর জুতোতে ক্ষেতের কাদা, যতই ঘষামাজা করুক সেটি মুছবে না।

প্রসঙ্গটা যখন উঠেছেই তখন আমার অবস্থানটা পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। আক্রমণটা মোটেই ব্যক্তিগত ছিল না, ছিল না মতাদর্শিক। আর আমি যে কেবল সাহিত্যচর্চার বিশেষ ধারারই সমালোচনা করতাম তা নয়, চলচ্চিত্র, নাটক, ক্রিকেট খেলা (আগ্রহটা তখন সদ্য তৈরী হয়েছে), চিত্রকলা সব নিয়েই মন্তব্য থাকতো। আমার অবস্থানটা ছিল সমাজপরিবর্তনের পক্ষে। এক্ষেত্রে আধুনিকতাই ছিল বিবেচ্য বিষয়। আধুনিকতা মানে যে সমসাময়িকতা নয়, সমসাময়িক রুচির দাসত্বও নয়, আধুনিকতার ভেতর যে থাকে, সব সময়েই থাকা দরকার হয়, সমসাময়িকতাকে অতিক্রম করে যাবার একটা আগ্রহ, আর সেটা না থাকলে আধুনিকতা যে নিছক সমসাময়িকতায় পরিণত হয়, এটাই ছিল বলবার কথা। স্বাভাবিকভাবেই এই বিবেচনাটা থাকতো যে শিল্প-সংস্কৃতি কেবল বাইরের ব্যাপার নয়, সেখানে বাইরের তুলনায় ভেতরের বস্তুই বরঞ্চ অধিক জরুরী। দেখতে পাচ্ছিলাম যে ওই মেধাবী তরুণেরা আধুনিকতার বহিরঙ্গটাকে অনুকরণে ব্যস্ত, সময়ের অধঃপতনকে তারা ঠিকই ধারণ করছেন এবং নিজেদের লেখার মধ্য দিয়ে তুলে ধরছেন, কিন্তু অধঃপতনের বৃত্তকে ভাঙার প্রয়োজনীয়তাটা বুঝতে চাইছেন না। আমার মতে ব্যাপারটা ছিল ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর।

সময়টা ছিল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের। শাসকেরা চাইছিল সমাজকে পিছিয়ে দিতে। ভোগবাদিতা ও আত্মনিমগ্নতাকে উৎসাহিত করা হচ্ছিল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, নবীন লেখকদের ওই গোষ্ঠীটি বুঝতে পারছেন না যে, তাঁদের রাজনীতিবিমুখ ও আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার কাজে সামরিক শাসকদের খুবই সন্তুষ্ট হবার কথা। কারণ তরুণরা ওই রকমের কাজে ব্যস্ত থাকুক এটাই শাসকদের কাম্য। নবীন যুবকেরা সমাজপরিবর্তনের আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে, এটা তো তাদের জন্য ছিল একটি দুঃস্বপ্নবিশেষ। যুবকেরা বামপন্থী না হয়ে দক্ষিণপন্থী হচ্ছে এটাই তো তারা দেখতে চাইছিল। তরুণ সাহিত্যসেবীরা ওই সময়ে এ ব্যাপারটা টের পাচ্ছিলেন না। আর আমার নিজের মধ্যেও একটা অভিভাবক অভিভাবক ভাব ছিল। সবে শিক্ষকতা শুরু করেছি!

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়ীদ যে-ভাবে আশা করছিলেন আমি সে-ভাবে কেন এগুলাম না তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ছাত্রজীবনে তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতার কথা স্মরণ করেছেন। এক্ষেত্রে তথ্যের অভাবে এবং আমার ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানের আন্তরিকতার দরুন তিনি বিভ্রান্ত হয়েছেন। তমদ্দুন মজলিসের সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা ঘটেছিল আমার কাঁধের ওই দুই ভূতের তাড়নাতেই। সংগঠনটি একটি সাপ্তাহিক ও একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতো— *সৈনিক* ও *দ্যুতি* নামে। এদের অফিস ছিল আজিমপুরে, আমাদের বাসার খুব কাছে। পত্রিকা দু'টিতে আমি লিখতাম, এবং একসময়ে মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। দ্বিতীয় ব্যাপারটা ছিল এই যে তমদ্দুন মজলিসও সমাজপরিবর্তনে বিশ্বাস করতো। আমাদের কৈশোরটা ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। সে-সময়ে *সৈনিক* পত্রিকাটির যে ভূমিকা ছিল সেটা অন্য কোনো পত্রিকা নিতে পারে নি। কিন্তু কেবল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তো নয়, সংগঠন ও পত্রিকা উভয়েই বিশ্বাস করতো সমাজপরিবর্তনের অত্যাবশ্যকতায়। তবে তাদের পথ এবং আমার পথ যে এক নয়, সেটা বুঝতে খুব যে সময় লেগেছে তা নয়। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তখন তাদের থেকে আমি অনেক দূরে। আমাদের সময়ে রাজনৈতিক বইপত্র তেমন একটা পাওয়া যেত না, কমিউনিস্ট পার্টি ছিল নিষিদ্ধ। আমরা নিতান্ত মফস্বলী পরিবেশেই বড় হয়েছি। আমার জন্য বড় একটা জগতের সঙ্গে পরিচয় সুযোগ ঘটে ১৯৫৯ সালে, যখন ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্কলারশিপে আমি ইংল্যান্ডে যাই। সেখানে তখন পুঁজিবাদবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন চলছে, তাতে নবীন সাহিত্যিকরাও আছেন, তাঁদের নাম দাঁড়িয়েছে এ্যাংগরি ইয়ং মেন। সমাজপরিবর্তনের পথকে যে অবশ্যই পুঁজিবাদবিরোধী হতে হবে এই ব্যাপারটা ওই সময়ে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সায়ীদদের সঙ্গে আমার দূরত্ব সৃষ্টির আসল কারণ ওইখানেই নিহিত। ১৯৬০ সালে দেশে ফিরে 'রাগী ছোকরাদের দল' নাম দিয়ে ইংল্যান্ডের ওই নতুন সাহিত্যধারা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধও লিখে ফেলেছিলাম। এর পরপরই *ঢাকায় থাকি* লেখা শুরু।

'রাগী ছোকরাদের' রাগটা ছিল পুঁজিবাদের ওপর। কিন্তু আমার চারপাশে যখন দেখা গেল হাংগরি, এ্যাংগরি, স্যাড ইত্যাদি জেনারেশনের নামে মেধাবান তরুণরা রাগ করছেন, কিন্তু জানেন না কার বিরুদ্ধে তাঁদের রাগ, তখন আমার ওই কলামে আমি পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধেই লেখা শুরু করি। হাংগরি জেনারেশনের অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ যে কতটা কদর্যতায় গিয়ে পৌঁছতে পারে সে-বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো সায়ীদের নিজেরই হয়েছিল কলকাতায় মাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুয়েক থেকে এবং ওই ধারার লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, যে-অভিজ্ঞতার কথা তাঁর বইতে আছে।

আমার পথভ্রান্তির বিষয়ে সায়ীদের একটি উক্তি কিন্তু পুরোপুরি ভ্রান্ত। সেটি হলো : 'প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভাবনার এমন সিঁড়ি নেই যা ডিঙিয়ে তিনি ওপরে উঠতে চেষ্টা করেন নি।' তাঁর এই ভ্রান্তি বলে দিচ্ছে আমরা একে অপরের কাছ থেকে কতটা দূরে সরে গেছি। দূরত্বটা কি জাতীয়তাবাদী অবস্থানের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অবস্থানের? কে জানে, হয়তো তাই। তবে এটা সত্য যে, এই ভ্রান্তি যে তাঁর একার তা নয়, এটি আরো অনেকের চোখেমুখেও আমি দেখেছি, এবং বোঝা গেছে আদর্শবাদিতার প্রতি মানুষের আস্থা কত কমে গেছে। সায়ীদ, আমি আর যে অপরাধই করে থাকি, বৈষয়িক উন্নতির পথ ধরি নি। মনে হয় চারপাশে ব্যক্তিগত উন্নয়নে শশব্যস্তদের তৎপরতা আপনি এত বেশী দেখেছেন যে আমাকেও ওই দলেরই ভেবেছেন। হ্যাঁ, আমার উন্নতি হয়েছে। লেকচারার হয়ে ঢুকেছিলাম, এক সময়ে প্রফেসর হয়েছি, পরে ইমেরিটাস প্রফেসর; কিন্তু পেশাগতভাবে এই উঁচুতে ওঠাটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে ঘটেছে, এর জন্য নানান সিঁড়ি খুঁজতে হয় নি, ডিঙানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। তদ্‌বিরের পথ ধরি নি, ধরবার সাধ্যও ছিল না।

প্রথমে মনে হয়েছিল সায়ীদের ওই মন্তব্যে আমার পক্ষে দুঃখিত হওয়া উচিত, পরে ভেবে দেখেছি ভ্রান্তিটা অস্বাভাবিক নয়; আদর্শবাদিতার পতন যখন সর্বত্র দৃশ্যমান তখন ভূতের তৎপরতার খবর কত জনেই-বা রাখে, তাকে কেই-বা মর্যাদা দেয়। আশঙ্কা করি সায়ীদকেও কেউ কেউ ভুল বুঝে থাকবেন, তাঁর কাঁধের ভূতটাকে চিনতে না-পেরে। সত্যের খাতিরে উল্লেখ করাটা দরকার মনে হচ্ছে— যে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার কারণে আমার ক্ষেত্রে উন্নতির স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় একবারই শুধু ছেদ ঘটেছিল, যে-ঘটনা তখনকার দিনে বেশ আলোচিত বিষয় ছিল। সেটি ঘটে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে। বিভাগে প্রফেসরের শূন্যপদ বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, সেটি আমারই পাবার কথা, কিন্তু উপাচার্য ঠিক করেছিলেন আমাকে ওই পদ দেওয়া হবে না। কারণ আমার মধ্যে বেয়াদপির লক্ষণ দেখা গেছে। বেয়াদপি অর্থ কর্তাভজা না-হওয়া। সিলেকশন কমিটির সোপারিশ ছিল আমার পক্ষে, কিন্তু উপাচার্য মহোদয় তাঁর হাতে-থাকা কৌশল প্রয়োগ করে একজন বহিরাগতকে সেখানে নিয়ে এসেছিলেন। পরে অবশ্য প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াতে এবং সিলেকশন কমিটির সোপারিশ জানাজানি হয়ে যাওয়াতে একটি নতুন পদ তৈরী করে সেটি আমাকে দেওয়ার ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। আমার উন্নতির ইতিহাসে ওইটিই একমাত্র বিচ্ছেদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈষয়িক উন্নতির জন্য ছোটাছুটি করছি, আমার সম্পর্কে এই ধারণাটা তৈরী একটা হবার কারণ হয়তো এই সত্য যে, স্বাধীনতার পর আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচনে ঘন ঘন অংশ নিতে হতো। বাইরে থেকে মনে হতে পারে যে, পেছনের প্রেরণাটা ছিল পদপ্রাপ্তির। সেটা মোটেই সত্য নয়। নির্বাচনে অংশ নিয়েছি, না-নিয়ে উপায় ছিল না বলেই। কর্তৃপক্ষ যাতে স্বৈরাচারী হয়ে না পড়ে, তাদের যাতে জবাবদিহিতার দায় থাকে, সে জন্যই আমরা নির্বাচনে দাঁড়াতাম। নির্বাচনে দাঁড়াতে হলে দল করতে হয়। সেটাও করতাম। আগবাড়িয়ে যেতাম বলে আমাকেই দলের আহ্বায়ক হতে হতো। আমাদের পক্ষ হয়ে নির্বাচনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে শিক্ষক মহলে যে বিপুল আগ্রহ ছিল তা মোটেই নয়। বরঞ্চ কর্তৃপক্ষের বিরাজভাজন হবার ভয়ে অনেকেই পিছিয়ে যেতেন। এমনও দেখা গেছে যে, আমরা পূর্ণ প্যানেল দিতে পারি নি। ভোট চাইতে হতো, তাতে যে-সব অভিজ্ঞতা হতো সেগুলোর অধিকাংশই ছিল নিরুৎসাহব্যঞ্জক। তবু উপায় ছিল না না-দাঁড়িয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক বিধান প্রবর্তনের সংগ্রাম আমরাই করেছিলাম, সেখানে জয়ী হয়ে পিছিয়ে যাওয়া হতো বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষতা।

উল্লেখ করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ভাইস-চ্যান্সেলারের প্যানেলেও আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে, এবং দু'বার নির্বাচিতও হয়েছিলাম। একবার পেয়েছিলাম সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট। সেবার আমাকে নিয়োগ দেবার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এরকম আভাস পেয়ে উল্টো তদবির করতে হয়েছিল নিয়োগ যাতে দেওয়া না-হয় সেজন্য। কারণ আমি বুঝেছিলাম যে ওই দায়িত্ব নেওয়া আমার স্বভাবের সঙ্গে মিলবে না, বিশেষ করে সামরিক শাসনের অন্ধকার সময়ে। বাছাই করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নির্বাচিত তিনজন প্রার্থীরই সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। আমার সাক্ষাৎকারের শুরুতেই তিনি বলেছিলেন, 'শুনলাম আপনি নাকি হতে চান না।' আমি জানিয়েছি যে কথাটা ঠিক, এবং তাঁর চোখেমুখে প্রশ্নরোধক চিহ্নটি ফুটে ওঠার আগেই বলেছি, 'প্রশ্ন উঠবে তবে দাঁড়ালাম কেন। দাঁড়িয়েছিলাম একটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করার প্রয়োজনে।' এর বেশী বলার দরকার হয় নি। কোন ধারার সে-খবর তিনি নিশ্চয়ই জানতেন, তাঁর গোয়ান্দারা নিশ্চয়ই নিশ্চেষ্ট ছিল না। এর পরে খুচরো কিছু কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎকারের সফল সমাপ্তি ঘটেছে। উন্নতি ঠেকাবার জন্য তদবিরের ঘটনা সায়ীদের নিজের বেলাতেও তো ঘটেছে, ভূতে পেলে অস্বাভাবিক আচরণ করাটা যে মোটেই অসম্ভব নয় সেটা তিনি নিশ্চয়ই জানেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে আমার ব্যাপারে তাঁর যে বিভ্রান্তি তার বিশেষ কারণ হতে পরে এই ধারণা যে, 'অধঃপতনে'র পথ যখন একবার ধরে ফেলেছি তখন নিশ্চয়ই থামতে পারি নি। অদৃষ্ট বিরূপ হলে এমনি হয়। এমন কি আপনজনেরাও খুব বিরক্ত হতেন আমার ওই নির্বাচনে দাঁড়ানো নিয়ে। বুঝতে পারতেন না, উন্নতি যখন চাই না তখন খামোখা অতসব ঝামেলার ভেতর কেন যাচ্ছি। কেউ কেউ বলতেন, 'তোমার অনেক কিছুই ভালো, ওই নির্বাচনে দাঁড়ানোটা ছাড়া। বুঝেছি, তুমি জনপ্রিয় হতে চাও।' পাছে অহঙ্কারী মনে করেন এই ভয়ে সহকর্মীদের সবার কাছেই ভোট চাইতে হতো। ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত এক সহপাঠী ও সহকর্মীকে একবার বলেছিলাম, 'এই যে, আমি কিন্তু দাঁড়িয়েছি।' জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি আবার বসলেন কবে?' আরেকজন বিশিষ্ট ও অতিপরিচিত ভোটারকে আমাদের প্যানেলটা পেয়েছেন কি না জিজ্ঞেস করায় মুখের ওপর জবাব দিয়েছিলেন, 'হা, অন্য প্যানেলও পেয়েছি। দাঁড়িয়েছেন তো অনেকেই।' আরেকজনকে একবার অনুরোধ করেছিলাম আমাদের পক্ষ থেকে দাঁড়াতে, তিনি বলেছিলেন, 'দেখুন, একটা ডিভিশন অব লেবার দরকার। আমাদেরকে একাডেমিক ও রিসার্চের কাজে থাকতে দিন।' যেন আমরা আন-একাডেমিক, আমাদের কাজ দরজায় দরজায় ভোটভিক্ষা করে বেড়ানো। আবার এমনও ঘটেছে যে পাছে বিরক্ত হন এই ভয়ে ভোট চাওয়া থেকে বিরত থাকায় একজন শিক্ষক আমাদের দলের এক ভোটপ্রার্থীকে বলেছেন, 'আপনাদেরকে ভোট দেবো কি! আপনাদের নেতা তো এইমাত্র পাশ দিয়ে চলে গেলেন, তাকালেনও না। এমন দাম্ভিক!' প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাজটা মোটেই উপভোগ্য ছিল না। হুমায়ূন আহমেদ একবার আমাদের পক্ষ থেকে প্রার্থী হয়েছিল, তখন তার তুমুল জনপ্রিয়তা, কিন্তু ভোট চাইবার ব্যাপারে তার সঙ্কোচের ফলে রটে গিয়েছিল যে সে ভীষণ অহঙ্কারী, সেই বদনামে সে জিততে পারে নি। বেচারা দুঃখ পেয়েছে, দ্বিতীয়বার দাঁড়ায় নি, বরঞ্চ ক্ষোভের সঙ্গে লিখে গেছে যে তার জীবনে ওটি ছিল মস্ত বড় ভুল, 'শ্রদ্ধেয়' আহমদ শরীফ ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর পাল্লায় পড়ে ওই ভোটে দাঁড়ানো। হুমায়ূন আজাদও আমাদের সঙ্গেই ছিল, আমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতার, কিন্তু আমি যে সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতি মিশিয়ে ফেলি এতে তার আপত্তি ছিল। অথচ সে প্রতিক্রিয়াশীলতার ওপর বই লিখতে বাধ্য হয়েছে, এবং সেই বই উৎসর্গ করবার বেলায় আমাকেই বেছে নিয়েছে। আরো বড় কথা যেটা, সেটা হলো মৌলবাদীদের রাজনৈতিক তৎপরতা দেখে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি রাজনৈতিক উপন্যাস না-লিখে পারে নি। সেই উপন্যাসটি লেখার জন্য হুমায়ূন আজাদকে যে কী মূল্য দিতে হয়েছে সেটা তো আমরা সবাই জানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য হলো এই যে, রাজনীতি জিনিসটা ঘাড়ে না-চেপে থাকলেও, নির্দয়ভাবে ঘাড়ে এসে পড়ে, এড়ানোর উপায় থাকে না।

সায়ীদের অভিযোগ আমি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছি কিন্তু বৈপ্লবিক দুঃসাহস দেখাতে পারি নি। সেটা ঠিক। নানাবিধ ভীতি আমার পিছু ছাড়ে নি। কিছু ব্যাপারে ভয়ের কথা তো এই লেখাতেই রয়েছে। তবে প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে কিন্তু আমার সাহসের অভাব হয় নি। রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণের বেলায় কতটা কী করতে পেরেছি জানি না, তবে বিভিন্ন সময়ে সরকারের অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে যে পড়েছি তা সত্য। একাত্তরে নিকেশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। একে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তার ওপরে আবার সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেছি, সই দিয়েছি বিবৃতিতে, প্রবন্ধ লিখেছি পত্রিকায়, অপরাধ নিতান্ত কম ছিল না। পাকিস্তানের পতন না ঘটলে ভাগ্যে কী ঘটতো বলা মুস্কিল; কেননা সেপ্টেম্বরে টিক্কা খান বিদায় নেবার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছয়জন শিক্ষককে নিজের হাতে সই করা চিঠিতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়ে গিয়েছে আমি তাদের মধ্যে একজন, এবং ১৪ ডিসেম্বর আলবদরের লোকেরা যাদেরকে হত্যা করবার জন্য তালিকা হাতে বের হয়ে পড়েছিল আমি সেই তালিকাতেও ছিলাম, ধরতে পারে নি বলেই জানে বেঁচেছি। ওদিকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরেও বিপদ কাটেনি, জলাভূমি রক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবার দায়ে ফৌজদারী মামলার আসামী পর্যন্ত হতে হয়েছে।

২

মনে পড়ে, ১৯৬৮ সালে আগস্ট মাসে যখন ইংল্যান্ড থেকে ফিরেছি তখন বছর তিনেক আগে যেরকম দেখে গিয়েছিলাম দেশের অবস্থা যে তার চেয়েও খারাপ হয়েছে সেটা বুঝতে সময় লাগে নি। পতনের ধ্বনি ও লক্ষণ চতুর্দিকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অন্যায় ও কৌতুককর নানাবিধ তৎপরতাকে সামষ্টিক পতনেরই অংশ মনে হয়েছিল। বন্ধুদের খোঁজে একদিন সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবে ঢুকে দেখি পরিবেশটা বেশ ম্রিয়মাণ। যাঁদের সঙ্গে দেখা তাঁদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন বিদেশ থেকে গাড়ি এনেছি কি না, আনি নি শুনে প্রকাশ্যে আমার বোকামিতে সমবেদনা প্রকাশ করলেও ভেতরে ভেতরে মনে হলো খুশি হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তখন মোটর গাড়ির উপস্থিতি যত্রতত্র। ক্লাবে কয়েকজন শিক্ষককে দেখি গাড়ির দরদাম নিয়ে আলাপ করছেন। এরকম ঘটনার মুখোমুখি পরে আরো একবার হয়েছি, নব্বইয়ের দশকে কলাভবনের শিক্ষকদের লাউঞ্জে, যখন সকালের দিকে সেখানে ঢুকলেই কানে আসতো শেয়ার বাজারে উত্থান পতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে কথাবার্তার শব্দ। পতনের এই অগ্রসরমানতায় কোনো বিরতি ঘটেনি। সন্ধ্যা সকাল একাকার। সে যাই হোক, ১৯৬৮-এর শরৎকালের সেই বিষণ্ন সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখি ক্লাবে সায়ীদ ঢুকছেন, আমি ফিরেছি শুনে খুঁজতে এসেছেন। মুহূর্তে পরিবেশটা উজ্জ্বল ও প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল।

চা খেতে খেতে অনেক বিষয়ে আলাপ হলো। সায়ীদ তখন টেলিভিশনের খ্যাতিবান উপস্থাপক। সে-বিষয়েও কথা হলো। সায়ীদ বললেন, টেলিভিশন ভবনে আমার অনেক পরিচিত ব্যক্তিত্বকে দেখা যায় বসে বসে লেজ নাড়ছেন, প্রোগ্রামের আশায়। উপমাটি আজো মনে আছে। ওটি সায়ীদের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব ছিল। তখনকার সাহিত্যচর্চার ধারা এবং *কণ্ঠস্বর*-এর ভূমিকা সম্পর্কে দেশে ফিরেই অবহিত হয়েছি; প্রসঙ্গটা স্বভাবতঃই উঠলো। আমি বলেছিলাম, 'পত্রিকাটি বন্ধ করে দিন।' অভিভাবকের সুরে। এমন একটি পরামর্শ সায়ীদ নিশ্চয়ই আশা করেন নি। তাই একটা ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল। সেটা ছিল এই রকমের যে, দেশ একটা পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় আছে, মানুষ ফুঁসছে, এমন পরিস্থিতিতে লেখক-বুদ্ধিজীবীদের কাজ হওয়া চাই পরিবর্তনে সাহায্য করা। যোগ দিতে না পারলেও *কণ্ঠস্বর* অন্ততপক্ষে নীরব হয়ে গিয়ে সমর্থন দিক। স্মরণীয় যে, সময়টা ছিল বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার। চীনে তখন সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলছে, ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে খোদ আমেরিকায় বিক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, ইউরোপে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল, স্থির লক্ষ্য না-থাকায় থেমে গেছে। আমার পরামর্শের জবাবে সায়ীদ কিছু বলেন নি, আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছি। হয়তো ভাবছিলেন— হায় রে, কে কাকে অন্ধ বলে। কথাটা তাঁরই। পরে বলেছিলেন একদিন। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পরে। তখনো আলাপ হচ্ছিল আমাদের পারস্পরিক ভিন্নতার বিষয়েই।

আটষট্টির সেই সন্ধ্যার পর ঊনসত্তর, সত্তর, একাত্তরের ঘটনা ঘটেছে। তখন ভিন্ন স্বর চতুর্দিকে। বাহাত্তরে *কণ্ঠস্বর* পুনরায় বেরিয়েছে। কিন্তু ততদিনে এর লেখকেরা নিজ নিজ অবস্থান ঠিক করে ফেলেছেন। গোষ্ঠীভুক্তিটা আর আগের মতো থাকে নি। যে তরুণ কবি একদা বিষণ্ন থাকতেন তাঁকে লিখতে হয়েছে *ভাত দে হারামজাদা*'র মতো কবিতা, বলতে হয়েছে, ভাত দে তা না-হলে মানচিত্র খাবো। দেয়ালের শ্লোগান দেয়ালে থাকতে চায় নি, উঠে এসেছে কবিতায়। ধ্বনিমাহাত্মের প্রভাবিত হয়ে নিরীহ যে তরুণ প্রিয়াকে সারমেয়-র সঙ্গে তুলনা করেছিল তাকে বুঝে নিতে হয়েছে যে শব্দটির অর্থ সারবস্তুময় নয়, কুকুর বটে। আত্মপ্রেমিক কবিকে আক্ষেপ করতে হয়েছে বিপ্লবী হতে পারে নি বলে। বোদলেয়ার জায়গা করে দিয়েছেন হুইটম্যানের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূতেপাওয়ার প্রসঙ্গটিতে ফেরত যাই। সায়ীদের প্রত্যাশা আমি পূরণ করতে পারি নি, কিন্তু তিনি যে আমার প্রত্যাশা পূরণ করেন নি এমনটা বলা যাবে না। হ্যাঁ, সায়ীদ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতেন তা হলে আমি খুশি হতাম; কিন্তু ফিরে তাকিয়ে মনে হয় তেমন ঘটনায় একটা বিপদের ঝুঁকিও ছিল। সেটা এই যে, সায়ীদ হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে আটকে পড়ে যেতেন। প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ছেড়ে বের হয়ে তিনি যে বিস্তৃত একটি কর্মক্ষেত্র তৈরী করে নিয়েছেন, সেটা হয়তো তৈরী করা হতো না। ওই ক্ষেত্রটা তাঁর নিজের জন্য যতটা নয়, সমাজের জন্য নিঃসন্দেহে ততোধিক উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সায়ীদের সঙ্গে মিলের দিকগুলো মনে পড়ে। সাহিত্যে আকর্ষণের সঙ্গে আমাদের উভয়ের ছিল পত্রিকা সম্পাদনায় আগ্রহ। সংগঠন এবং মাইক্রোফোন আমাকেও টানতো। আর ছিল গ্রন্থমনস্কতা। দেশের আনাচে-কানাচে পাঠাগার গড়ে উঠবে, এ স্বপ্ন আমারও ছিল। তবে এখানেও একটা পার্থক্য দেখি। আমি চাইতাম পাঠাগার প্রতিষ্ঠা হোক একটি সামাজিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। স্থানীয় উদ্যোগে পাঠাগার গড়ে উঠুক পাড়ায়, মহল্লায়, বিদ্যালয়ে, গ্রামে-গঞ্জে। সায়ীদের উদ্যোগটা কেন্দ্রীয়। কেন্দ্রে শুরু হয়ে তা পরিধিতে পৌঁছেছে। পার্থক্যটা, আবারও বলতে হয়, দৃষ্টিভঙ্গির।

এই যে আমার এতগুলো কথা বলা, এর কেন্দ্রে আছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলোতে তিনি আমার সঙ্গী ছিলেন; ওই স্মৃতি সতত সুখের। সাথে সাথে অন্যকথাও এসে গেলো। একসঙ্গে যাত্রা শুরু করে আমাদের পৃথক দুই পথের যাত্রী হওয়ার ঘটনা এবং তার পেছনকার কারণ নিয়ে কথাবার্তা সায়ীদকে বুঝতে সাহায্য করবে বলেও আশা করছি। কাঁধে যদি ভূত চাপে তা হলে স্থির থাকা অসম্ভব হয়, সায়ীদ সেটা জানেন, আর ভূতের সংখ্যা যদি একাধিক হয় তা হলে কী ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত আমার ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। তবে ভূতেপাওয়া জিনিসটা যে সব সময়ই খারাপ তা মোটেই নয়। কোনো কোনো ভূতের স্বভাবচরিত্রটা বেশ ভালো। ওই ধরনের ভূতপ্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়ুক। তাদের জয় হোক।

২০১৪

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : শিক্ষাবিদ ও লেখক
প্রফেসর ইমেরিটাস, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুজ্জামান

অনুজপ্রতিমকে অভিনন্দন

যে বছর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, সে বছরেই সেখানে প্রবেশ করলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ— একই বিভাগে। অল্প সময়ের মধ্যে গবেষণা ছাত্র হিসেবে আমি ফিরে এলাম— তখন আমরা উভয়েই পড়ুয়া, একটু আগের আর পরের। তারপর হঠাৎ করে আমি শিক্ষক বনে গেলাম— আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তখনো ছাত্র। তাঁদের সঙ্গে আমার টিউটোরিয়াল ক্লাস ছিল কিছুদিন। তারও পরে যখন আমার এত উপরের ক্লাসে পড়াবার কথা নয়, মুনীর চৌধুরী বললেন, তাঁর পড়াবার বিষয়ে যেন দুটি বক্তৃতা দিই ওই ক্লাসে— তিনি নিজেও উপস্থিত থাকবেন। ভয়ই পেলাম। শেষ পর্যন্ত বক্তব্যবিষয় প্রবন্ধের আকারে লিখে সেখানে পড়া হল। এই সুবাদেই সায়ীদ আমাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করেন, তা না বললেও ক্ষতি ছিল না।

ছাত্রজীবনে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ছাত্র-শিক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন একাধিক কারণে। সেটা তাঁর জন্যে অবিমিশ্র আশীর্বাদস্বরূপ হয়নি। একবার বাংলা বিভাগের একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিভাগের সকল শিক্ষকের নামে তিনি পদ্য বেঁধেছিলেন— অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই থেকে আমি পর্যন্ত— প্রত্যেকের জন্যে বরাদ্দ ছিল পয়ার ছন্দে দুটি চরণ। আমার সম্পর্কে কী বলেছিলেন, তা ভুলে গেছি, মনে আছে আহমদ শরীফেরটা : *অন্ধকার ঘরে বসে আহমদ শরীফ/ সারা মধ্যযুগ তিনি করেছেন জরিপ*। আমরা বেশ উপভোগ করেছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, বিভাগীয় প্রধান তা উপভোগ করেননি, ওর মধ্যে ছাত্রসুলভ বিনয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভাব দেখে তিনি বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন। তাতে সামান্য ক্ষতিও হতে পারত সায়ীদের— মুনীর চৌধুরী অবলম্বিত কৌশলের ফলে তা হয়নি।

সায়ীদের একটা বড়ো বন্ধুবর্গ ছিল— এঁরা সকলেই সাহিত্যচর্চা করতেন। জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, হায়াৎ মামুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রশান্ত ঘোষাল, রফিক আজাদ, ফারুক আলমগীর এবং আরো অনেকে। এঁরা সকলেই কল্লোল যুগের আদর্শে জ্যেষ্ঠ লেখকদের এবং প্রচলিত মূল্যবোধকে পাশ কাটিয়ে বা অস্বীকার করে নিজেদের কথা নিজেদের মতো করে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যেও যে মতান্তর বা ভাগাভাগি ছিল, বাইরে থেকে তা আমরা বুঝিনি। রফিক আজাদ, ফারুক আলমগীর এবং আরো কেউ কেউ 'স্যাড জেনারেশন' নামে নিজেদের অভিহিত করে কবিতার এক চটি সংকলন ছেপে বার করেন। তার একটা কপি বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষকে পাঠিয়ে দিয়ে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রোভোস্ট জানতে চেয়েছিলেন, এমন কবিতা যারা লেখে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচার করে, তাদের বিরুদ্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি বিবেচনা করেন কি না। মুহম্মদ আবদুল হাই এ বিষয়ে মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলে তিনি বিষয়টির মীমাংসা করার দায়িত্ব নেন। তাঁর পরামর্শে কবিরা এসব কবিতা প্রচারের জন্য— লেখার জন্যে নয়— দুঃখ প্রকাশ করলে বিষয়টির সেখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে।

সাহিত্যচর্চার ওই প্রয়াসই সায়ীদ এবং তাঁর বন্ধুদের পরিচিত করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু নয়, বৃহত্তর পরিসরে। রাগী নব্য যুবকের তকমা জুটেছিল তাঁদের— তাতে অবশ্য তাঁরা আদৌ অপ্রসন্ন হননি। *স্বাক্ষর, কণ্ঠস্বর* প্রভৃতি ছোট কাগজকে ঘিরে তাঁদের তৎপরতা চলেছিল। এই 'তরুণ' ও 'অনাস্থাবাদী' লেখকদের গদ্যরচনাকে মুনীর চৌধুরী বিশেষ স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন পূর্ব বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ধারার গদ্যরীতির ধারক বলে। *কণ্ঠস্বর* আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের স্থায়ী কীর্তি হিসেবে গণ্য হয়েছিল প্রায় দুদশক ধরে অব্যাহত প্রকাশনার জন্যে এবং অন্তত এক প্রজন্মের লেখকদের প্রতিনিধিত্বশীল কাগজ হিসেবে।

পেশা হিসেবে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপনাকে। ঢাকা কলেজে দীর্ঘকাল ধরে তরুণ শিক্ষার্থীরা তাঁর সান্নিধ্যে প্রেরণা লাভ করেছিল, জীবন ও জগৎকে প্রচলিত অর্থের বাইরে দেখতে শিখেছিল। তবে সায়ীদের অধ্যাপনার খ্যাতিকে অতিক্রম করে যায় টেলিভিশনের উপস্থাপক হিসেবে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা। বাক্‌পটুত্ব এবং নতুন ভাবনার অবতারণায় তাঁর ভাবমূর্তি পেয়েছিল ঈর্ষণীয় মাত্রা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর মধ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের জীবনের সর্বাধিক মূল্যবান কীর্তি হিসেবে দেখা দেয়। যেখানে আমরা অনেকে মিলে একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে পারি না, সেখানে একক প্রচেষ্টায় এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান গড়া যে তাঁর বিশেষ যোগ্যতার প্রকাশ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর ব্যাপ্তি সারাদেশে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশের সীমানা ছাড়িয়েও। এর ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গতি দেশের সর্বত্র। এর আহূত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তরুণ-তরুণীরা সদা উন্মুখ। এর জন্যে তিনি বিরল সম্মানজনক ম্যাগসেসাই পুরস্কার লাভ করেছেন, তাঁর খ্যাতি ছড়িয়েছে বিশ্বময়— বিশেষ করে বাংলাভাষীদের মধ্যে। তবে তিনি আফসোস করেছেন যে, এই কেন্দ্রের দায়িত্ব হস্তান্তরিত করার মতো যোগ্য উত্তরাধিকারী তিনি গড়ে তুলতে সমর্থ হননি।

হয়তো এ-খেদ একদিন দূর হবে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যে প্রায় সকল মহলের সহযোগিতা লাভ করছে, এদেশে তা সামান্য অর্জন নয়।

সায়ীদ লিখেছেন প্রচুর। কবিতা ও ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও ভাষণ, স্মৃতিকথা ও জার্নাল, নাটক ও অনুবাদ। তিনি যেমন হাল্‌কা ও সরস রচনা উপহার দিয়েছেন, তেমনি গুরুগম্ভীর ও চিন্তাউদ্রেককারী লেখাও রয়েছে তাঁর বিস্তর। তাঁর মধ্যে মিলিত হয়েছে শিল্পী ও কর্মী, ভাবুক ও উদ্‌যোগী। তাঁর চিন্তা ও সাধনায় দেশ ক্রমাগত উপকৃত হোক।

২০১৪

আনিসুজ্জামান : শিক্ষাবিদ ও লেখক
প্রফেসর ইমেরিটাস, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শঙ্খ ঘোষ

স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন নয়

চারদিক থেকে নানা খবর এসে পৌঁছয় আমাদের জীবনে, সে খবরের বড় অংশটাই ভরা থাকে কেবল না-এর কথায়, বিপর্যয়ের কথায়, ভ্রষ্টতার কথায়। কোথায় কতখানি কলঙ্ক ঘটল, তারই ওপর আমাদের সর্বাত্মক ঝোঁক। কিন্তু সুন্দরের খবরও কি খবর নয়, স্বপ্নের খবরও কি খবর নয়? কোথাও যদি একটু সুস্থতার চিহ্ন দেখা যায় কখনো, যত সামান্যই হোক না কেন সে চিহ্ন, সেটাকেই কি তবে অনেকখানি খবর করে তুলতে পারি না আমরা? মন যখন ঝিমিয়ে আসে, নিষ্ক্রিয়তা যখন গ্রাস করে নিতে চায় শরীর, সবদিকে তাকিয়ে যখন মনে হতে থাকে আশা করবার কিছুই আর মানে নেই যেন, ওইরকম এক-একটা সুস্থতার বা স্বপ্নের চকিত খবরে হঠাৎ হয়তো মুছে যেতে পারে সব বিকলতা, জেগে উঠতে পারে মন, বিশ্বাস হতে পারে যে, স্বপ্ন আজও স্বপ্নই নয় শুধু।

বাংলাদেশে গিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে। প্রায় এগারো বছর পরে এই আবার বাংলাদেশে যাওয়া, কোনো কাজের দায় নিয়ে নয়, এমনি এমনি। এগারো বছরে কতই না বদল ঘটে গেছে পৃথিবীর! আর এই উপমহাদেশে সে বদল আমাদের তাড়না করে ফিরেছে দুঃস্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্নে, নিরাশা থেকে নিরাশায়। ভাবা নিশ্চয় বাতুলতা যে, সেই এগারো বছর আগেকার সম্পূর্ণ ছবিটাকেই ফিরে পাব আবার। এ তো হওয়ারই কথা যে ভিন্ন এক পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পৌঁছব। কিন্তু সে ভিন্নতা কতদূর ভিন্নতা? সে কি আবারও কোনো হতাশার অতল গহ্বরের মধ্যে ফেলে দেবে আমাদের?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন নয় যে দুরবস্থার কোনো ছবি দেখিনি সেখানে, কেমন করেই-বা তা আশা করা যায়। দারিদ্র্যের, বিচ্ছিন্নতার, উগ্রতার নানারকমেরই ইশারা ছড়ানো আছে এখানে-ওখানে, যেমন আছে এদেশেও। আতিথ্যের সহৃদয় সমাদরে আপ্লুত হতে হতেও তার কিছু ছায়া ছড়িয়ে পড়ে মনে। কিন্তু এরই মধ্যে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে এমন সব ঘটনা, এমন সব মানুষ, এমন সব ভিতর থেকে উঠে আসা আস্থাময় উচ্চারণ, যে আরও একবার দু-চোখ ভরে স্বপ্ন দেখবার ইচ্ছে জাগে তখন।

আরও অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে এবার সেরকম বিশেষ এক স্বপ্নিল আয়োজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হল, আগে কেন জানতে পারিনি এর খবর। এই দশ-বারো বছরে চেনাজানা আরও কতজনই তো ঘুরে গেছেন বাংলাদেশ থেকে, কারও কাছেই কেন শুনিনি এটা? যে আয়োজনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল যেন সত্যিই আমি দাঁড়িয়ে নেই সেখানে, যেন অলীক কোনো ঘটনা সেটা, তা কি আগে দেখেননি আর কেউ? নাকি দেখেও তেমন উত্তেজনার বোধ হয়নি তাঁদের? তবে কি এটা তত বড় ঘটনা নয়, যত বড় করে মনে হচ্ছে আমার? নাকি বাংলাদেশ বলেই আমি একটু বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছি, পক্ষপাতদোষে?

অবশ্য আরও তো একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। হয়তো অনেকেই জেনেছেন ওই আয়োজনের কথা, অনেকেই হয়তো গিয়েছেন সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে। অনেকেরই হয়তো চমকে উঠেছে মন, আর এখানে ফিরে এসে হয়তো-বা সে কথা তাঁরা বলেওছেন কারো কারো কাছে। সবারই স্বর যে আমার কাছে পৌঁছবে, এমন তো নয়। আমার এত উত্তেজনার খবরটাই-বা জানবে কেমন করে অন্যে? সবাইকে ডেকে যা বলতে ইচ্ছে হয়, সব সময়ে কি তা বলবার কোনো পথ পাই আমরা?

কথাটা প্রথম বলেছিলেন আবুল মোমেন, চট্টগ্রামে এক সন্ধ্যায়। বলেছিলেন স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের বেড়ে উঠবার সমস্যার কথা। এদেশেও আমাদের অজানা নয় সে সমস্যা। সিলেবাসের চাপে কুঁজো হয়ে যাওয়া, প্রতিযোগিতার দৌড়ে দমবন্ধ হয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েরা অন্য কোনওদিকে তাকাবার অবসর পায় না আর, যতটুকু-বা পায় তা-ও টেনে নেয় দূরদর্শনের ঝলমলে পর্দা। কমিক্স আর টিভি, এর বাইরে বেরোবার আর কোনো উপায় রাখেনি পরিবেশ। কিন্তু ত্রাণের কি পথ নেই কোনো? কোনো প্রতিরোধ কি হতে পারে না এর? এই ভাবনা নিয়েই বাংলাদেশে একদিন হয়েছিল 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র'-র পত্তন, প্রায় পনেরো বছর আগে ছিল তার ক্ষীণ সূচনা, একজনমাত্র ব্যক্তিমানুষের চেষ্টায়। আর পরের কয়েক বছরজুড়ে সেই চেষ্টা দেশব্যাপী এক প্রতিষ্ঠানের চেহারা পেয়ে গেছে আজ, বাংলাদেশের শহরে-গ্রামে ছড়ানো আজ একশো চুরাশিটা তার শাখা, স্কুলের প্রায়

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়াল্লিশ হাজার ছেলেমেয়ে এখন তার সদস্য, বই পড়া, ছবি দেখা, গান শোনার সমৃদ্ধ আয়োজনের মধ্য দিয়ে নানাদিকে বেড়ে উঠছে তাদের মন।

এটা ঘটিয়ে তুলবার সংকল্প যে মানুষটির মনে প্রথম জেগেছিল, ঢাকায় পৌঁছে কথা হল সেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সঙ্গে। নিছক অধ্যাপক ছিলেন একসময়ে। বাবাও শিক্ষক ছিলেন বলে তাঁর মনে হয়েছিল, শিক্ষকতার চেয়ে বড় ব্রত জীবনে আর নেই। কিন্তু সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা অল্পে অল্পে সমস্ত প্রত্যাশা থেকে অনেক দূরবর্তী করে দিল তাঁকে। মনে হয় তাঁর— অবস্থানের জড়তা না ভাঙতে পারলে ঠিক ঠিক চলবার পথে ছাত্রদের দীক্ষিত করবার কোনো উপায়ই নেই আর। সমস্ত পৃথিবীর বিকাশের সঙ্গে কতটুকু যোগ তৈরি হয় এদের? বাইরের খোলা হাওয়ার সঙ্গে যথার্থ পরিচয়ের অভাবে কত আবদ্ধ হয়ে আছে এদের মন! কে ভাঙবে সেই আবদ্ধতা? কোনো আয়োজন কি আছে কোথাও? শিক্ষা আর মূল্যবোধের সমস্তরকম বিশৃঙ্খলা আর উদ্‌ভ্রান্ততা থেকে সরিয়ে এনে ছেলেমেয়েদেরকে একটা অনুকূল পরিবেশ গড়ে দিতে পারবে কে, স্বপ্নের দিকে এগোবার জন্যে অনুকূল? আত্মমর্যাদার বিকাশ ঘটে যে চর্চার মধ্য দিয়ে, কে করে দেবে তার আয়োজন?

কোনো সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানের ভরসায় না থেকে আবু সায়ীদ অল্প কয়েকজন মানুষকে নিয়ে নিজেই একদিন শুরু করেছিলেন সেই আয়োজন, ছেলেমেয়েদেরই কাছে জ্ঞানের মুক্তিকে পৌঁছে দেওয়ার আয়োজন। নাম দিয়েছিলেন 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র', যদিও কেবল সাহিত্যেরই জন্যে নয় সে কেন্দ্র; সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের সমস্ত দিকেই এতকালজুড়ে যেসব সিদ্ধি ঘটেছে দেশে-বিদেশে, স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে তার পরিচয় বয়ে নিয়ে গেলেন তাঁরা। লাইব্রেরি তো ধরে নেয় যে, সকলে এসে পৌঁছবে তার কাছে, সে নিজে থাকবে স্থির। কিন্তু ওঁরা তা ভাবেননি। ওঁরা ভেবেছেন, লাইব্রেরিই পৌঁছবে সকলের দুয়ারে দুয়ারে। এক-এক ক্লাসের এক-এক বয়সের উপযোগী কিছু বইয়ের তালিকা করে নেন তাঁরা, সে বই পৌঁছে দেন ছেলেমেয়েদের হাতে, এক-একখানি বই পড়ে ফেলবার পর তাদের সমবেত করেন কোনো সাপ্তাহিক বৈঠকে, ছোট ছোট পড়ুয়ারা তাদের পঠিত বই নিয়ে কথা বলে পরস্পর, করে তর্ক, ভাবনা বিনিময়। উৎসাহ দেওয়ার জন্যে তাদের পুরস্কৃতও করে কেন্দ্র, বই পড়বার জন্যে বই পুরস্কার। তারপর, শুধু আর বইপড়াই নয়, গানের বা ছবির বা চলচ্চিত্রের আস্বাদন করতে হয় কীভাবে, তারও জন্যে এইসব ছেলেমেয়ে পেয়ে যায় যথাযোগ্য উপকরণ, কোনো বিশেষজ্ঞ এসে একটি-দুটি প্রাথমিক কথা বুঝিয়ে বলেন তাদের, তারপর শোনানো হয় গান কিংবা দেখানো হয় ছবি। এইভাবে জানায়-শোনায়, গল্পে-গুজবে, আনন্দে-উৎসবে ভরে

ওঠে দেশব্যাপী একটা সঙ্ঘ, তরুণ সঙ্ঘ। সে তরুণেরা একদিন বলতে পারেন পরে : 'জানছি নিজে আমরা কতখানি। নিজেকে জানার এ আনন্দ তুলনাহীন। ... কেন্দ্র আমাদের সাহসী করে তুলছে, যুক্তিনিষ্ঠ করে তুলছে। অন্তত নিজের কথাকে, নিজের চিন্তাকে নির্ভয়ে বলতে শেখাচ্ছে। মনের ভিতর প্রতি মুহূর্তে জন্ম দিচ্ছে প্রশ্ন, কৌতূহল, জিজ্ঞাসা। ... বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আমাদের স্বপ্নিল ভালোবাসা।'

কোনো কি প্রতিরোধ ছিল না এই আয়োজনের? তা কি আর হয় নাকি, প্রতিরোধ তো থাকবেই। অভিভাবকেরা ভেবেছেন, সময় নষ্ট করে স্কুলের পড়াশোনার ক্ষতি ঘটে যাচ্ছে অবিরত, সন্দিগ্ধরা ভাবছেন কোনো গোপন পথে বৈদেশিক টাকার ষড়যন্ত্র চলছে পিছনে। কিন্তু এসব ভাবনার সঙ্গে অকারণে কোনো লড়াইয়ের চেষ্টা করেননি আয়োজকেরা, তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে প্রাথমিক স্তরে একেবারে অবশ্যম্ভাবী এই প্রতিক্রিয়া। এ অপধারণা প্রতিহত করবার চেষ্টায় বলক্ষয় বা কালক্ষয় করবার মানে নেই কিছু, বুঝেছিলেন তাঁরা। আর সেইটে বুঝেছিলেন বলেই অল্পে অল্পে একদিন স্তিমিত হয়ে আসে এসব বিরোধিতা, অনেকেই আজ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এ কেন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ান। আবু সায়ীদের মতো হয়তো তাঁরাও আজ বিশ্বাস করেন যে, 'বিরাট এবং সমৃদ্ধ ও আলোকিত জাতি সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন সম্পন্ন মানুষ তৈরি করা। আর এজন্যে দরকার একটি দেশভিত্তিক আন্দোলন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এই আন্দোলনেরই উৎসস্থল।'

একজন ব্যক্তিমানুষের স্বপ্ন নয়, তিনি ঘটিয়ে তুলেছেন সবই, তিনি আর তাঁর বন্ধুরা। আর এতটাই যদি ঘটে উঠতে পারে, অন্যসব হীন সংকীর্ণতার আয়োজনকে কেনই-বা তবে মুছে দিতে পারবে না মুক্তবুদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়া এইসব ছেলেমেয়ের দল, কোনো একদিন? পারবে বলেই ভাবতে ইচ্ছে হয় না আমাদের?

১৯৯৫

শঙ্খ ঘোষ : কবি, সাহিত্য সমালোচক, রবীন্দ্র গবেষক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ

একজন উজ্জ্বল মানুষের গল্প

লালুর (আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ) সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের ক্ষণটির কথা মনে নেই, তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা এবং বন্ধুত্ব। একই বছর আমরা ভর্তি হয়েছিলাম— লালু বাংলায়, আমি ইংরেজিতে। সেটা ছিল ১৯৫৭ সাল। পাঠ্যসূচির বাইরে সাহিত্য নিয়ে যাদের প্রবল আগ্রহ ছিল লালু ছিল তাঁদের অন্যতম। ওরা কয়েকজন মিলে 'নীরব সংঘ' নামে একটি পাঠচক্র গড়ে তুলেছিল। নিয়মিত আসরের আয়োজন হত। সেখানে যাঁরা যেতেন তাদের মধ্যে যাদের নাম এ মুহূর্তে মনে করতে পারছি তারা হলেন মোস্তাক, আতাউল হক, মনিরুজ্জামান, মনজুরে মওলা, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। আমিও দু'একটি আসরে গেছি বলে মনে করতে পারছি।

লালুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত প্রায় এক দশক পর ঢাকা কলেজে। আমি সবে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরেছি। আমার পোস্টিং হল ঢাকা কলেজে। ঢাকা কলেজের ইংরেজি বিভাগ তখন কয়েকজন অত্যন্ত সফল সুপণ্ডিত শিক্ষকের উপস্থিতিতে ধন্য। কলেজের প্রিন্সিপাল জালালউদ্দিন নিজে ছিলেন ইংরেজির নামকরা পণ্ডিত। তিনি প্রশাসক হলেও নিয়মিত ক্লাস নিতেন। পড়ানোটা তাঁর কাছে ছিল একটা নেশার মতো। সেজন্যই প্রশাসনিক কাজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও ইংরেজি সাহিত্যের মহৎ কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম ছাত্রদের কাছে উপস্থাপন করাটা তাঁর কাছে ছিল পরম আনন্দের কাজ। এছাড়া ছিলেন কিংবদন্তিসম নোমান সাহেব। রফিক সাহেব ছিলেন বিভাগীয় প্রধান। এছাড়া একঝাঁক তরুণ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাস করা। বাংলা বিভাগে ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত ওসমান, আশরাফ সিদ্দিকী, রওশন আপা, সুলতানা এবং ছাত্রদের অতি প্রিয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ— তাদের সায়ীদ স্যার। এ দুই বিভাগে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল প্রচুর; যাদের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না তাঁদের কাছে করজোড়ে মাফ চাই। তারাও সবাই সুযোগ্য ছিলেন। কারণ ঢাকা কলেজে তখন কোনো অযোগ্য শিক্ষকের চাকরি করা সম্ভব ছিল না। আমরা যাদের পড়াতাম তারা ছিল সারা (তদানীন্তন) পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে নামিদামি ছাত্র। কলেজটিকে এ হিমালয়সম উচ্চতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল প্রিন্সিপাল জালালউদ্দিন সাহেবের প্রশাসনিক দক্ষতার ফলে।

ঢাকা কলেজের কথা বলছি এজন্য যে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এখানেই একজন তরুণ শিক্ষক হিসেবে প্রায় কিংবদন্তিতে পরিণত হন। ঢাকা কলেজই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। তাঁর জীবনে যা কিছু তাঁকে পরবর্তী সময়ে খ্যাতি এবং সফলতা এনে দিয়েছে তার বীজ উপ্ত হয়েছিল এখানে থাকতেই। কিন্তু কেবল একজন সফল শিক্ষক হিসেবেই তিনি থেমে যাননি। আমাদের সাহিত্যে তরুণদের জন্য একটা যুৎসই মঞ্চ তৈরির স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এ সময়টাতেই। *কণ্ঠস্বর* সম্পাদনা ও প্রকাশনা তাঁর জীবনের একটি আকাশচুম্বী সাফল্য। তিনি হয়ে ওঠেন তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের অঘোষিত কর্ণধার। তরুণদের নতুন ধ্যানধারণায় উৎসাহিত করা, তাদের লেখা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়া— এ সবই তিনি করেছেন অক্লান্ত শ্রমে। আর শুধু কি তাই? *কণ্ঠস্বর* প্রকাশের পেছনে অর্থের যোগান দিতে গিয়ে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে সে রক্তঋণের ইতিহাস অনেকেরই জানা নেই। কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর কাছাকাছি থাকতেন। এ সময় দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে একটি অনন্য সৃজনশীল সখ্য। *কণ্ঠস্বর*সহ আরো অনেক নতুন ভাবনা নিয়ে চলত অবিরাম আলোচনা। আন্দাজ করি এ সময়টাতেই আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর পরাবাস্তব কবিতা এবং জীবনানন্দ দাশ নিয়ে কাজ করছেন। এতে লালু যে তাকে উৎসাহিত করেছেন তা অনুমান করা কঠিন নয়। *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছের* কোনো কোনো কবিতার প্রথম পাঠক যে লালু তা সম্ভবত নিঃসন্দেহে বলা যায়। *কণ্ঠস্বর*-এ *জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছের* সুদীর্ঘ আলোচনা যা কিনা তার প্রথম সাহিত্যিক মূল্যায়ন তার উৎস খুঁজলে এ দাবির সমর্থন মিলবে।

সায়ীদ আমাকে টেনে এনেছেন তাঁর *কণ্ঠস্বর*-এ। শহীদ কাদরীর *উত্তরাধিকারের* একটি সুদীর্ঘ আলোচনা *কণ্ঠস্বর*-এ ছাপা হয়েছিল। অনুবাদ সাহিত্যে আমার প্রবেশও তাঁর হাত ধরে। মনে পড়ে, *ক্লাসিক কী?*, *সাহিত্যে প্রভাব*, এবং *সংগীত*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও *সাহিত্য* লেখাগুলো *কণ্ঠস্বরেই* ছাপা হয়েছিল। এ প্রবন্ধগুলো পরে বাংলা একাডেমি থেকে 'তিনটি ফরাসি প্রবন্ধ' শিরোনামে ছাপা হয়। এরপর রুশোর একটি দীর্ঘ লেখা এবং *সার্ত্রের মাছি*— এ দুটো অনুবাদের পেছনেও তাঁর উৎসাহ ছিল। পরে *সার্ত্রের মাছি* নাটকটি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়।

তরুণদের মাঝে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা এবং তার মাধ্যমে 'আলোকিত মানুষ' গড়ে তোলার আইডিয়াটা তাঁর মাথায় ঠিক কখন আসে জানি না। সত্তরের দশকে তাঁর মাঝে এ সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ করেছি। দীর্ঘদিন তিনি এর পেছনে শ্রম দিয়েছেন। প্রথম দিকে কেউ কেউ এটাকে উদ্ভট আখ্যা দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সমালোচনাটা এসেছে বেশি, যদিও আজ তাঁর পাশে বসতে পেলে অনেকেই নিজেকে ধন্য মনে করেন। অর্থসংগ্রহের জন্য দাতা গোষ্ঠীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। সরকারকে সমর্থন দেবার জন্য অনুরোধ করেছেন। তাতে খুব বেশি ফল হয়নি। তাঁরা কনডমের পেছনে লক্ষ লক্ষ ডলার দিতে রাজি, কিন্তু মননের উন্নয়নে নয়। একমাত্র সরকারি সাহায্য যা চোখে দেখতে পাই তা হচ্ছে বর্তমান জমিটি, যার উপর আজ কেন্দ্রের বহুতল ভবন নির্মিত হয়েছে। কিন্তু সেটাও সম্ভব হয়েছে আমাদেরই এক সহপাঠী মন্ত্রীর একান্ত আগ্রহে। সে কঠিন দিনগুলোর কথা লালু ভুলে যাননি নিশ্চয়ই।

কিন্তু সময়ের বিবর্তনে দাতাগোষ্ঠীও এগিয়ে এল। আজ ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠকদের কাছে বই পৌঁছে দিচ্ছে। লালু নিজে ম্যাগসাইসাই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

আজ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একটি নন্দিত নাম। দেশে তো বটেই, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও। তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছেন। দেশের মানুষের ভালোবাসায় তিনি সিক্ত হয়েছেন। আমার একজন কাছের মানুষ হিমালয়কে ছুঁতে পেরেছেন এটা আমার পরম সৌভাগ্য।

সবশেষে এ বলব— সত্যিকারের বন্ধু কেবল প্রশংসা করে না। তাঁর ভুলভ্রান্তিও ধরিয়ে দেয়। তাই তাঁর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলতে চাই— বই পড়ে বিদ্বান হওয়া যায়। বই পড়ার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু কেবল বই পড়ে সব মানুষ আলোকিত হয় না। আলোকিত মানুষের সাহচর্য না পেলে মানুষ আলোকিত হয় না। আমাদের সমাজপতিরা, আমলারা, আইনজ্ঞরা বই পড়েছেন কিন্তু আলোকিত হয়েছেন এমন দাবি স্বয়ং সায়ীদ নিজেও করবেন না। বাংলা একাডেমির মেলায় যে পরিমাণ বই বিক্রি হয়, সে পরিমাণ আলো বিকিরণ করে কি?

সুতরাং সময় এসেছে আরেকটা আন্দোলনের সূচনা করার। আলোকিত নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মানুষ' গড়ার আন্দোলন চাই। তাতে হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করবে এমনটা আশা করব না। আশা করব একটি মোমবাতির আগুন আরেকটি সলতেকে জ্বালিয়ে দিলে সে আগুন ছড়িয়ে যাবে দিকে দিকে। সুতরাং কেবল বুদ্ধি নয়, আত্মার পরিবর্তন চাই।

সায়ীদকে তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্নের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই।

২০১৪

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ : প্রাবন্ধিক, অনুবাদক
প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজুরে মওলা

জয়তু সায়ীদ

মহাকাশে মানুষের চলাফেরা তখনও শুরু হয়নি। ইউরি গাগারিন পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে আসেননি। নিল আর্মস্ট্রং চাঁদে পা রাখেননি। এমন সময় কোন হতচ্ছাড়া মাস্টারের শখ হল, তিনি ইংরেজি পরীক্ষায় 'স্পেস ট্রাভেল'-এর ওপর রচনা লিখতে দিলেন। 'স্পেস'-এর একটা মানে তো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার দূরত্ব, দুটো জিনিসের মধ্যকার ফাঁক, যা থেকে, মনে হয় 'স্পেশাস' শব্দটি এসেছে। এক ছেলে তো প্রশ্ন দেখে ভারি খুশি। সে মহানন্দে তার ঢাকা থেকে মুন্সিগঞ্জ, না, মানিকগঞ্জ যাবার কথা লিখে দিয়ে এল।

আমার মনে হয় এ গল্পটি আমি সায়ীদের কাছেই শুনেছি।

এ ছেলেটি যদি সায়ীদ নিজেই হয়ে থাকে, তাহলে?

তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। সায়ীদ কেন, আমরা যে কেউই সে সময় এমনটি লিখতে পারতাম। সায়ীদ যে খুব মেধাবী ছাত্র ছিল, এমন কথা কখনও শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না। সায়ীদ খুব বড়লোকের সন্তান ছিল না, ইতিহাসে কীর্তিত কোনও বংশে সে জন্মেছিল বলেও শুনিনি। ভালো খেলোয়াড় ছিল না, ভালো গায়ক ছিল না, ভালো অভিনেতা ছিল না, ভালো আঁকিয়ে ছিল না, ভালো রাজনীতিক ছিল না, এমনকি কীর্তিমান ধাপ্পাবাজদের তালিকাতেও তার নাম কখনও ওঠেনি।

সায়ীদ খুবই সাধারণ একজন মানুষ। হ্যাঁ, শিক্ষক হিসেবে সে জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু সে একাই যে কেবল শিক্ষক হিসেবে জনপ্রিয় ছিল, এমনটি বলা যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মতো বহু শিক্ষক আগেও ছিলেন, ভবিষ্যতেও আশা করি হবেন। টেলিভিশনে মজার মজার অনুষ্ঠান করত, সেগুলোর উদ্দেশ্য যে সবসময় মানুষকে অনাবিল আনন্দ দেয়া, এমনও হয়তো নয়। এখনকার ছেলেমেয়েরা কি সে-সব অনুষ্ঠানের কথা জানে?

তারপরও সায়ীদ সব সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা। সে অসাধারণ— এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, থাকতেই পারে না।

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর সময় তার কাজ, তার *কণ্ঠস্বর* বের করার ও টিকিয়ে রাখার সাহস, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র-এর মতো একটি অসম্ভব জিনিসকে সম্ভব করে তোলা ও দিনে দিনে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করা— এ সব যদি অসাধারণ কাজ না হয়, তাহলে আর কী হবে!

সায়ীদ স্বপ্ন দেখেই যায়। সে হার মানতে চায় না। সে ভয় পায় না। তার উৎসাহের কখনও ঘাটতি হয় না। সে মানুষের মঙ্গল চায়। সে জরাকে জয় করতে চায়।

জয়তু সায়ীদ।

২০১৪

মনজুরে মওলা : কবি ও সাহিত্যিক
প্রাক্তন সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুশ শাকুর

তন্দুরতাজা উপাদেয়

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বস্তুত একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। প্রতিষ্ঠানটি স্বতন্ত্র : ব্যক্তিত্বেও তো বটেই, চলনে বলনে লিখনে চিন্তনেও। দেখার পর্দায় কি লেখার পাতায় কক্ষের প্রভাষণে কি মঞ্চের ভাষণে উপস্থিতি তাঁর হীরকোজ্জ্বল। বহু গুণের মধ্যে যে গুণটি তাঁকে সর্ব অঙ্গনেই অনন্যতা দান করে সেটা সায়ীদের হিরণবরন সৃজনশীলতা যা সর্বদাই সক্রিয় এবং সর্বথা। সমানে সৃজনশীল তিনি কথাশিল্পে কথনশিল্পে কাব্যশিল্পে রচনাশিল্পে এমনকি সংগঠনশিল্পেও— বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যার মূর্ত দৃষ্টান্ত। বৈঠকি বিনোদন থেকে গুরু বিচরণ— প্রতিভা তাঁর সর্বত্রই দ্যুতিময়।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্বাধিকারবলেই একের ভেতরে অনেক : কবি কথাশিল্পী প্রবন্ধকার ভাষ্যকার বক্তা প্রভৃতি।

ভাষার অঙ্গে তিনি সততই কাব্যিক আর চিন্তার অংশে স্বভাব-দার্শনিক। তাঁর তাবৎ বক্তব্যই স্বকীয় উপলব্ধিজাত এবং সেজন্যেই সাগ্রহে পড়াশোনার মতো। রচনামাত্রেই তিনি স্বয়ংকৃত স্বয়ংপ্রকাশ এবং তদ্দরুন সর্বদাই তন্দুরতাজা উপাদেয়। প্রবন্ধ নিবন্ধ ভাষণ বক্তৃতা— সবতাতেই তিনি মনোহরণ মন্তব্যময়। মন্তব্য তাঁর স্বচ্ছ সপ্রাণ নির্দ্বিধ নির্দ্বন্দ্ব।

সরাসরি শৈলীতে স্বপ্রকাশিত সুরসিক সারবান সায়ীদকে শ্রোতা পাঠক গ্রহণ করুন কি বর্জন— পাঠ করেন সানন্দেই। কেননা আপাদশির অধ্যাপক এই লেখক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাষণে প্রণয়নে কেতাবি নন কখনো। মাস্টারমাফিক ভার তাঁর নেই। কারণ মিতায়তন বচন রচন সায়ীদের সবই যেন নাঙ্গা তলোয়ার— খাপের ভারটুকুও বর্জিত। তার ওপর অন্তরগত সদাতৎপর শিল্পীটি তাঁর চতুর্পাণ্ডিত্যকেও করে রাখে সততই রসমণ্ডিত।

সারকথা : ভাষার আধারে পরিবেশিত যে কোনো আয়োজনেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অতিশয় উপাদেয় এক আধেয়।

২০০০

আবদুশ শাকুর : কথাসাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ
প্রাক্তন সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিনুল ইসলাম

কাছের মানুষ

১৯৬০ সালের জুলাই-আগস্টের কথা। সবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। উঠেছি ঢাকা হলে (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল), আবাসিক ছাত্র হিসেবে। এ শহরে তখনও আমি আগন্তুক প্রায়। এখানকার মানুষজন আর গোটা পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে ভীষণ উৎসুক।

সে সময়কার এক বিকেলের কথা। হলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহল নিয়ে আমি এদিক-ওদিক দেখছি, ঠিক তখনই চোখে পড়ল সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক সুদর্শন সপ্রতিভ তরুণকে— মজার মজার কথা বলতে বলতে সহাস্যে সদলবলে হলের মূল ফটক দিয়ে প্রবেশ করছেন। প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁকে দারুণ আকর্ষণীয়, আমুদে, এবং অন্যদের চেয়ে আলাদা— অনেকটা দলনেতা গোছের মানুষ বলে ঠাহর হল।

সেদিনকার পুরো ঘটনাটাই আমার কাছে ছিল নাটকীয়। তারপর সেই তরুণকে অনেকবারই হলে আসা-যাওয়া করতে দেখেছি। এবং পরে খোঁজ নিয়ে তাঁর পরিচয় জানতে পারি— তিনি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। বাংলা বিভাগের ছাত্র (আমার বছর তিনেকের সিনিয়র), সাহিত্য-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সমঝদার এবং নিরহংকার, মিশুক প্রকৃতির একজন অমায়িক মানুষ। কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ করলাম তাঁর ব্যাপারে শোনা এসব কথা একদম ঠিক।

শুরু থেকেই ঢাকা হল ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের নানান অনুষ্ঠানে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেখি। তাঁর কথাবার্তা-আলোচনা সবসময় আমি প্রাণভরে উপভোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতাম। মিষ্টি বাচনভঙ্গি, কথাবার্তায় মনোহর। এভাবেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে আরো একটু কাছ থেকে দেখা ও শোনার সুযোগ হয়। দেখতাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, নির্ধারিত বক্তৃতা, পর্যায়ক্রমে গল্প বলা, উপস্থিত বক্তৃতা ইত্যাদি নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করতেন এবং অধিকাংশ সময়েই লোভনীয় পুরস্কারগুলো কুড়িয়ে নিতেন।

এরপর আস্তে আস্তে জানতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জনাকয়েক উদ্যমী মেধাবী সহপাঠীকে নিয়ে 'নীরব সংঘ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেন তিনি। এরও কিছুদিন পর সম্পাদনা করতে শুরু করেন একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও মানসম্পন্ন সাহিত্য পত্রিকা *কণ্ঠস্বর*, যা সেকালের তরুণ লেখকদের মাঝে ব্যাপক প্রাণসঞ্চার করে। এ সবকিছুর মধ্য দিয়ে তাদের লক্ষ্য ছিল একটাই— নতুন ধারার সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলা, রুচি-গভীরতাহীন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সর্বোপরি সুস্থ শালীন একটা নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা। তাদের বিশ্বাস, এভাবেই সম্ভব আনন্দময় জীবনযাপনের মাধ্যমে পূর্ণ বিকশিত মানুষ হওয়া। গোটা ব্যাপারটাকেই আমার কাছে খুব বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছিল, কারণ এত অল্প বয়সে একজন তরুণ সমবয়সী কিছু বন্ধু নিয়ে এমন দুঃসাহসিক কাজে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন, ইতিমধ্যেই যথেষ্ট যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছেন— এ তো রীতিমতো এক দুঃসাহসিক কাজ! এর পরিণতি কী হবে? কারণ দেশ তখন যাচ্ছিল আইয়ুব খানের নিষ্ঠুর সামরিক শাসনের ভেতর দিয়ে। বাঙালির সংস্কৃতিচর্চার পথ অবরুদ্ধ। অনেক রাজনীতিক, সংস্কৃতিকর্মী, বুদ্ধিজীবী কারা-অন্তরালে। যাঁরা বাইরে আছেন তারাও প্রায় নিশ্চুপ, হতবিহ্বল। ঠিক এই ছিল যখন সেদিনকার সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি, তখন এ বীর-হৃদয় তরুণের নেতৃত্বে নীরব সংঘের সদস্যরা অবলম্বন করেছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত নানা কৌশল। যার ফলে তৎকালীন খ্যাতিমান ও শ্রদ্ধেয় জাতীয় ব্যক্তিত্বরা জড়ো হয়েছিলেন এক প্লাটফর্মে, একটি বৃহত্তর লক্ষ্যে। এর সূচনা ঘটেছিল ১৯৬১ সালের মে মাসে ঢাকায় সাত দিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের এবং সেদিন নেপথ্যে থেকেই নীরব সংঘের সদস্যরা একে সফল করে তুলতে ভূমিকা রেখেছিলেন। সত্যিই এ ছিল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাধিকার ও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে চেতনা থেকে এবং যে লক্ষ্য সামনে রেখে রচিত হয়েছিল, সেদিনের এই তরুণদের এমন একটি অনন্য সাহসী উদ্যোগের পেছনেও যে সেই একই মহতী উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এ কারণেই তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ সত্যিই অপরিশোধ্য।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর সবকিছুই ঘটেছিল মূলত আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের গতিশীল নেতৃত্বগুণ এবং পরিশীলিত সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পটভূমির কল্যাণে। বয়সে তরুণ হলেও তাঁর মধ্যে ছিল এক অসাধারণ সাহিত্যপ্রতিভা, যার সূত্রপাত ঘটে যুগপৎ বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের নিবিড় চর্চার মধ্য দিয়ে। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক পিতার প্রণোদনা আর ব্যক্তিগত পাঠাগারের কল্যাণে সেই কলেজজীবনেই তরুণ সায়ীদ সন্ধান পান ইংরেজ কবিদের সেরা কবিতা ও একটি সমৃদ্ধ সাহিত্যসম্ভারের। শেক্সপিয়ার তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়াও শেলি কিটস মিল্টন টেনিসন লরেন্স ওয়ার্ডসওয়ার্থ ব্রাউনিং কোলরিজ প্রমুখের কবিতা আর গোল্ডস্মিথ বার্ক কার্লাইল ইমারসন ও ম্যাথু আর্নল্ড এবং এমন আরো অনেকের প্রবন্ধ তিনি পড়তে শুরু করেন সেই তরুণ বয়সেই।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর মুগ্ধতার শুরু রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। তাঁর নিজের লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি, সায়ীদের সাহিত্যভাবনা মূলত গড়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল মজুমদারের রচনা পড়ে। অতঃপর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঠেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র হয়ে এবং পরবর্তী ৩০ বছর কাটিয়ে দেন বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান অধ্যাপক হিসেবে। এ সময় তিনি নানা কাজের ফাঁকে নিবিষ্ট হন সাহিত্যচর্চায়। কবিতা প্রবন্ধ ছোটগল্প নাটক অনুবাদ এবং পরবর্তী সময়ে খণ্ডে খণ্ডে আত্মজীবনী রচনা করে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন একজন বহুমাত্রিক সাহিত্যিক হিসেবে।

এ প্রসঙ্গে তাঁর রচনাশৈলির গুণ-মানের কথাটি এসে যায়। তাঁর রচনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাতে পাওয়া যায় জগৎ ও জীবনের বিচিত্র সমস্যার চিত্তাকর্ষক বিচার-বিশ্লেষণ, একদিকে দার্শনিক ধী আর ক্ষুরধার যুক্তি, অন্যদিকে কাব্যিক রসমাধুর্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। এখানে তাঁকে দেখি গদ্যের মুদ্রায় অপূর্ব পদ্য রচনা করতে। কথাটা আমি বলছি বিখ্যাত দার্শনিক-লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক ইমারসনের কাছ থেকে ধার করে। প্লেটোর অমর গ্রন্থ *রিপাবলিক* পাঠ করে ইমারসন এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন যে, তিনি তখন মন্তব্য করেন : Plato has written poetry in prose. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের লেখা পড়তে পড়তে এ কথাটি আমার বার বার মনে পড়ে। কারণ, তাঁর যেকোনো গদ্য রচনার পরতে পরতে লক্ষ করি উচ্চায়ত কাব্যের গতিময় ছন্দ আর পোক্ত দর্শনতত্ত্বের মনিকাঞ্চন যোগ। তাইতো তাঁর রচনা হয়ে দাঁড়ায় প্রগাঢ় জ্ঞান ও আকণ্ঠ উপভোগের বিষয়।

এখন আসা যাক, এ বাণীশিল্পীর লাইফস্টাইল ও জীবনদর্শন প্রসঙ্গে। তিনি লিখেছেন, কলেজে ভর্তি হওয়ার পর তাঁর বাবা প্যান্ট-শার্ট কেনার জন্যে যে টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিলেন, তা দিয়ে তিনি খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবি বানিয়ে নিয়েছিলেন। কেন? কারণ তাঁর বিশ্বাস, বিত্তবৈভব, ধনসম্পদ ও বিলাসব্যসন দিয়ে নয়, বরং কম নিয়ে বেঁচে থেকেই আনন্দময় জীবনযাপন করা যায়। এ বিশ্বাসের সমর্থনে তিনি উল্লেখ করেছেন গ্রিক দার্শনিক ডায়োজিনিসের কথা। একদিন নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে ডায়োজিনিস দেখলেন, একজন মানুষ দু-হাতের আঁজলা দিয়ে নদী থেকে পানি পান করছেন। তখন তিনি ভাবলেন, এভাবে যদি কোনো পাত্র ছাড়াই দিব্যি পানি পান করা যায়, তবে আমার আবার একটা গ্লাস লাগবে কেন? যেমন ভাবনা তেমন কাজ। ডায়োজিনিস তাঁর একমাত্র সাদামাটা গ্লাসটি নদীর পানিতে ফেলে দেন এবং আঁজলা ভরে পানি পান করেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। ডায়োজিনিসের এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ শুরু করেন সাদাসিধে বাহুল্যবর্জিত এক অনাড়ম্বর জীবন। সেই থেকে আজ অবধি তিনি এটি মেনে চলেছেন অক্ষরে অক্ষরে, মনের আনন্দে। আর এর পেছনে তাঁর অকাট্য যুক্তি— কি ভোগের জিনিস, কি বিলাসী জীবন, এদের কোনোটিই মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয় না; উল্টো তার মনে অসুস্থ অনুভূতি জাগায়, তার সহজাত জান্তব প্রবৃত্তিগুলোকে উস্কে দেয়। সবচেয়ে বড় কথা, ভোগসর্বস্ব বিলাসী জীবন দিয়ে মহৎ মানবিক বোধ অর্জন করা যায় না, যেতে পারেও না। অন্যদিকে যার জীবনের সমৃদ্ধি যত বেশি তার জীবন ততটাই সরল, অনাড়ম্বর। এ জীবনই প্রকৃত ঐশ্বর্যময় জীবন। এ থেকেই পাওয়া যায় প্রকৃত আনন্দ। ক্ষণিকের বস্তুসুখ নয়, স্বপ্ন আর হৃদয়ের স্থায়ী আনন্দ। এ জীবনের শুরু উন্নত মূল্যবোধ ও সামাজিক চেতনা থেকে। এর সারকথা— সবাই মিলে বাঁচব। সবার সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে বাঁচব। মানুষের মতো বাঁচতে হলে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে। আর এই শ্রদ্ধাকে সার্থক করে তুলতে হবে প্রেমে ও সেবায়। কেবল আত্মচিন্তা ও আত্মসাধনা নয়, অপরের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলিয়ে ধন্য হতে হবে আমাদের সকলকে।

ঠিক এ কথাটাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একটি প্রদীপের দৃষ্টান্ত দিয়ে। শুধু একটি প্রদীপ যেমন রাতের আঁধার ঘোচাতে পারে না, তেমনি একজন মানুষের একক প্রচেষ্টায়ও সমাজের সার্বিক কল্যাণ আশা করা যায় না। পূর্ণতাও অর্জন করা যায় না। তবে এই যে সমাজচিন্তা ও সামগ্রিক কল্যাণের কথা বলা হল এটা এমনিতে হয় না, এমনিতে আসেও না। এর জন্যে চাই নীতিবোধসম্পন্ন আলোকিত মানুষ গড়ার শিক্ষা, যার মধ্য দিয়েই ঘটাতে হবে ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের চেতনার আলোকায়ন। এ লক্ষ্যটি সামনে রেখেই সায়ীদ যোগ দেন অধ্যাপনায়, তিন দশক ধরে সাধ্যমতো চেষ্টা করেন তাঁর অগণিত প্রিয় ছাত্রদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয়কে জ্ঞান ও উন্নত মূল্যবোধের আলোয় উদ্বুদ্ধ করতে। এর পাশাপাশি এই চেষ্টা তিনি চালিয়ে যান অন্যান্য বিকল্প মাধ্যমেও।

এ দেশে প্রথম টেলিভিশন আসে ১৯৬৪ সালে, এক প্রভাবশালী প্রচারমাধ্যম হিসেবে। এ সুযোগটাই তিনি গ্রহণ করেন— সুস্থ শালীন বিনোদনের মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দেন, চেষ্টা করেন শিক্ষামূলক নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার। সেই প্রথম থেকেই এ মাধ্যমের একজন প্রাণবন্ত কথক-উপস্থাপক হিসেবে সরগরম করে রাখেন টেলিভিশনের পর্দা। খ্যাতিমানও হয়ে ওঠেন অল্পদিনের মধ্যেই। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তাঁর কর্মতৎপরতা আরো বেড়ে যায়। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত তাঁকে আমরা দেখি *হারজিৎ*, *সপ্তবর্ণা*, *চতুরঙ্গ*, *আনন্দমেলা* প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, নির্মাণ ও উপস্থাপনায়। এর মাধ্যমে তিনি খুলে দেন টেলিভিশনের মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিস্তারের নতুন দুয়ার-জানালা। জনসাধারণ, বিশেষত তরুণদের মাঝে সৃষ্টি করেন আনন্দ ও বিনোদনের মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জনের চমৎকার সুযোগ। বিনোদনের ফাঁকে ফাঁকে ইতিহাস ভূগোল কাণ্ডজ্ঞান দর্শন বিজ্ঞান শিক্ষায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন তিনি। একজন খ্যাতিমান অধ্যাপক কী করে গণমাধ্যম পরিবেশক হিসেবে যশস্বী হতে পারেন, তা-ই তিনি দেখিয়ে দিলেন শ্রেণিকক্ষে, সভা-সমিতিতে এবং টেলিভিশনের পর্দায়, তাঁর অনবদ্য কুশলতা দিয়ে। এ নিয়ে তাঁর রচিত *আমার উপস্থাপক জীবন* বইটি পড়লে বোঝা যায়, কী প্রচণ্ড শক্তি, সাহস, প্রেরণা ও কর্মোদ্যম দিয়ে তিনি তখন এ কাজগুলো করেছেন।

শুধু তত্ত্বীয় দর্শনচর্চা কিংবা সুন্দর কথামালা দিয়ে নয়, বরং মাঠপর্যায়ে শ্রম ও সাধনা দিয়ে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর আসল লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়েছেন। এখানে তাঁর ভূমিকা ছিল অনেকটা বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মতো, যিনি বলেছিলেন— 'আমি চাই বলিষ্ঠ বাক্য, বলিষ্ঠতর কাজ'। এই বলিষ্ঠ বাক্য আর বলিষ্ঠতর কাজের সংকল্প নিয়েই অধ্যাপক সায়ীদ ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। এ কাজে গভীরতর অভিনিবেশের জন্যে তিনি তখন অব্যাহতি নেন টিভি-অনুষ্ঠান থেকে, এরও প্রায় এক দশক পরে ছেড়ে দেন অধ্যাপনা। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনি নিরন্তর কাজ করে চলেছেন ক্লান্তিহীন উদ্যম ও নিমগ্নতায়। তাঁর 'আলোকিত মানুষ চাই' স্লোগানটি আজ প্রায় মুখে মুখে উচ্চারিত। এছাড়া জনকল্যাণমূলক বিবিধ সামাজিক আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ প্রশংসার দাবিদার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই হোক, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়ে অধ্যাপক সায়ীদের স্বপ্ন ও সাধনার কথা বলে শেষ করার নয়। আর সে সাধ্যও আমার নেই। তবে আমি এই প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে যাই, অনেকটা আকস্মিকভাবেই। গল্পটা এরকম : আশির দশকের গোড়ার কথা। আমি তখন থাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডের বাসায়। এক সন্ধ্যায় বাসার কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই আমি রীতিমতো হতবাক। খ্যাতিমান অধ্যাপক ও টেলিভিশন স্টার আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্বয়ং আমার সামনে দাঁড়িয়ে, স্বভাবসুলভ স্মিত হাসিমুখে। আমি হতবাক এজন্যে যে, এর আগে ষাটের দশক থেকে সেদিন পর্যন্ত তাঁর একজন মুগ্ধ ভক্ত হিসেবে কিছু ছিটেফোঁটা আলাপ ছাড়া কখনো তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ আসেনি। আজ তিনি নিজেই উপস্থিত, আমার অপার বিস্ময় ও আনন্দের কারণ হয়ে। ঘোর কাটতেই তাঁকে ভেতরে নিয়ে এলাম। তারপর একান্তে অনেক কথা। যার শেষ ও মূলকথা ছিল আমাকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের দর্শন পাঠচক্রে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হবে, বিশেষ করে তরুণদের উন্নত জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে। কথা দিলাম, এবং সাগ্রহে শামিল হয়ে গেলাম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্লাটফর্মে। মনে পড়ে পাঠচক্রের বক্তৃতাগুলো বেশ দর্শকপ্রিয় হয়েছিল। মজার মজার গল্প, উপমার অনুপানে সহজ-সরলভাবে পরিবেশন করতাম দর্শনের নানাবিধ গুরুগম্ভীর তত্ত্ব। ফলে বক্তৃতায় উৎসুক তরুণদের বিপুল সমাবেশ ঘটে এবং তারা উপভোগও করে প্রাণভরে। এ বিষয়ে বিশদ সংবাদ প্রকাশিত হয় কেন্দ্রের মুখপত্রে। ক্লাসের একটি ছবিও ছাপা হয়েছিল তাতে, যার ক্যাপশনটা ছিল : *ড. আমিনুল ইসলামের দর্শনের ক্লাস, উপচে-পড়া ভিড়*।

এভাবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে কত বক্তৃতা যে দিয়েছি— কত তরুণদের, আবার কখনো-বা সুধীজনদের সামনে, তার হিসেব রাখিনি। তবে এটুকু বলতে পারি, গত পঞ্চাশ বছর ধরে অধ্যাপনাসূত্রে এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তরুণদের সংস্পর্শে থেকে তাদের মধ্যে যে নিরতিশয় প্রাণশক্তি ও অপার সম্ভাবনার স্ফুরণ প্রত্যক্ষ করেছি, ঠিক তা-ই যেন এক নতুন রূপে দেখতে পেলাম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে— কাছের মানুষ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সানুগ্রহ আমন্ত্রণে। সত্যিই এই মানুষটির প্রতি আমার কেন যে এত আকর্ষণ, আমি নিজেই তা বুঝতে পারি না!

এখানে নেহাতই একটি ব্যক্তিগত আবেগের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। বছর দুয়েক আগের কথা। কেন্দ্রের এক অনুষ্ঠানে তিনি হঠাৎ আমার হাতে তুলে দিলেন তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা *বহে জলবতী ধারা*-র দ্বিতীয় খণ্ড। স্নিগ্ধ হাসি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়িয়ে শুধু বললেন, 'পড়বেন'। বইটা খুলতেই দেখি উৎসর্গপত্রে লেখা রয়েছে— *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপক, সচেতন জীবন-রসিক ও চিত্তহারী বক্তা ড. আমিনুল ইসলাম প্রিয়বরেষু*। এ ছিল আমার জন্যে এক পরম আনন্দের ব্যাপার। আমার সরাসরি শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধে প্রয়াত অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেবের কাছ থেকে স্নেহ-উপহার হিসেবে পাওয়া তাঁর লেখা *তত্ত্ববিদ্যা-সার* বইটি ছাড়া আর কোনো উপহার জীবনে আমাকে এতটা পুলকিত করে নি।

যাই হোক, সাধারণ্যে সায়ীদ স্যার নামে সুপরিচিত এই ত্যাগী কর্মবীরের নাম আমি যথার্থই দিতে চাই কর্মানন্দ স্বামী। এই নাম আমার মনে এসেছে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর একটি স্মরণীয় উক্তির অনুকরণে। নিজের জ্ঞানচর্চা প্রসঙ্গে তিনি একবার অনেকটা কৌতুকচ্ছলে বলেছিলেন, 'সাধারণত অবিবাহিত ব্যক্তিরাই ঘর-সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে জ্ঞানানন্দ স্বামী, দয়ানন্দ স্বামী প্রভৃতি অভিধা গ্রহণ করে থাকেন। আমি তাদের মতো সন্ন্যাসী নই। আমার স্ত্রী আছে, ঘর-সংসার আছে, কিন্তু তবুও আমি তাদের মতোই একজন স্বামী। আমার নাম জ্ঞানানন্দ স্বামী। জ্ঞানচর্চাই আমার আনন্দ।' একই বিবেচনায় অধ্যাপক সায়ীদও একজন স্বামী— কর্মানন্দ স্বামী। জ্ঞানচর্চায় যেমন, সৎকর্ম ও সেবাধর্মেও তেমনি তাঁর নির্জলা আনন্দ।

Plain living and high thinking আদর্শের মূর্ত প্রতীক ও নিষ্ঠাবান এই মানুষটি কি ক্লাসকক্ষে, কি লেখালেখিতে, কি বক্তৃতামঞ্চে, কি টিভির জ্বলিত পর্দায় এককথায় আপামর জনমানুষকে যেমন জ্ঞানদান ও উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তেমনি মাঠপর্যায়ে তিনি জ্ঞান ও কর্মের এলেম ও আমলের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে চলেছেন। যেমনটা আগেও বলেছি, সেই ১৯৬৫ সালের পয়লা মার্চ থেকে শুরু করে বিগত অর্ধশতক কাল ধরে শিক্ষকতা ও শিক্ষা-প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থেকে আমি শিক্ষাঙ্গনে, বিশেষ করে প্রাণোচ্ছল তরুণদের মধ্যে যে প্রাণশক্তির বিভা দেখতে পেয়েছি, ঠিক সেটাই প্রত্যক্ষ করছি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বহুমুখী কর্মযজ্ঞে।

এ সবই সম্ভব হয়েছে নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা ও সেবামূলক কর্মস্পৃহায় ভরপুর কেন্দ্রের স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের নিদ্রাহীন প্রচেষ্টায়। নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও এই নাছোড়বান্দা মানুষটি অটল রয়েছেন, ত্যাগ ও সেবার আদর্শে, আলোকিত মানুষ গড়ার মহান ব্রতে। তাঁর প্রতি হৃদয়ের গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। তবু বলি, তিনি যে সংকল্প নিয়ে আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেছেন এবং সেজন্যে বৈষয়িক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোগ-সুখের জীবন বিসর্জন দিয়ে মানবকল্যাণে তাঁর সমগ্র জীবন, মন ও অন্তরাত্মাকে উৎসর্গ করেছেন তা কিছুতেই বৃথা যেতে পারে না; বরঞ্চ তিনি যে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার মনন ও অনুশীলন আজ জরুরি হয়ে পড়েছে সংঘাতময় বিশ্বপরিস্থিতিতে। সমাজ রাজনীতি শিক্ষা সংস্কৃতি সমাজ রাজনীতি ব্যবসাবাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক মানবসম্পর্ক— সর্বত্রই চলছে সংকীর্ণ স্বার্থের লড়াই। ক্ষমাহীন হিংস্রতা, বিবেকহীনতা ও শক্তিমদমত্ততার এক কুৎসিত খেলা। কিন্তু তাই বলে আমরা থেমে থাকতে পারি না। এর মধ্যেই এগুতে হবে। ভাঙা হাল ও ছেঁড়া পাল নিয়েই সচল রাখতে হবে ভবিষ্যৎ আলোর পথে যাত্রা। এক্ষেত্রে বন্ধু, দার্শনিক ও দিশারী হিসেবে নিশ্চয়ই পাশে পাব প্রিয় মুখ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে। আর তাই পরিশেষে তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই, তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি ঈশ্-উপনিষদের একটি শ্লোক দিয়ে : *কুর্ব্বন্নেবেহ কর্মানি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ*। সৎ কাজ করে একশ বছর বেঁচে থাকুন গুণী।

২০১৪

আমিনুল ইসলাম
দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ও লেখক
কলা অনুষদের সাবেক ডিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল মান্নান সৈয়দ

কাঁচা-তাজা জোশ

'৬০-এর দশকে সাহিত্যে যাঁরা প্রাণঝরনা সৃষ্টি করেছিলেন, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সেইসব প্রধান পুরুষদের একজন। *কণ্ঠস্বর* সম্পাদনা করে আমাদের সাহিত্যের একটি বড় কাজ সম্পন্ন করেছিলেন তিনি। নতুন সাহিত্য-কেন্দ্রী গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের তিনটি স্বতন্ত্র সংকলন সম্পাদনার দীপ্ত কৃতিত্ব আছে তাঁর। নিজেও তিনি কবি, এবং উজ্জ্বলতরভাবে প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। গদ্যকর্মে তখন যে অত্যল্প কতজন সত্যিকার নতুন চিন্তা ও প্রকাশের পথ পেয়েছিলেন ও দেখিয়েছিলেন সায়ীদ তাঁদের অন্যতম। সেইসব গদ্যকর্মেরই এক-একটি নিয়ে সায়ীদের প্রথম ও এখন পর্যন্ত একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ *দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ* প্রকাশিত হয়েছে।

দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ তারুণ্যজনিত দুরুক্তিতে ভরা, এটাই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের প্রথম প্রবন্ধ, যা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর অনেক যুক্তি শিবনারায়ণ রায় ও বুদ্ধদেব বসুর রচনা থেকে আহৃত হলেও ভিতরে ভিতরে সায়ীদ তাঁর নিজস্ব কিছু মন্তব্য গেঁথে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথে বাস্তবতার অভাব, শারীরিকতার অভাব, কবিত্বের প্রতি উন্মুখিতা, বন্দিত জীবনদেবতা— এই সবকেই আর একবার অতীব্র আক্রমণ করেছিলেন সায়ীদ। যুগে যুগে অবশ্যই নতুন নতুন রবীন্দ্রবিচার চলতেই থাকবে; রাবীন্দ্রিক অভাবগুচ্ছেরও শনাক্তকরণ ও বীথিকরণ আমাদের জন্য অপ্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু তার জন্যে চাই সুস্থ শান্ত দৃঢ় যুক্তিপূর্ণ শিল্পবিবেচনা— আবেগী নির্মুক্তি নয়। এই বোধ অচিরকালের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোজগার করে নেন সায়ীদ, এবং তাঁর উত্তরকালিক রবীন্দ্রবিচার *সান্ধ্যসংগীতের রবীন্দ্রনাথ* ও *প্রভাতসংগীতের রবীন্দ্রনাথ* প্রবন্ধদ্বয়ে সুশান্ত ও নিরুত্তেজ, গুণগ্রাহী ও বিশ্লেষণশীল হয়ে উঠেছে। বোঝা যায়, অন্তর্বর্তী কয়েক বছরের মধ্যে লেখকের বয়স অনেক বেড়েছে। বোঝা যায় তাঁর রবীন্দ্র-সমালোচনা অগ্রসর হয়েছে একটি রেখা ধরে। সায়ীদের সাহিত্যিক লিপ্ততা যদি ইতিমধ্যে অশিথিল থাকত, তাহলে এই পথে হয়তো দেখতাম তাঁকে অনেক দূর অব্দি এগিয়ে যেতে। দুটি প্রবন্ধ থেকে দুটি অংশের আমি উল্লেখ করব : সুকুমার সেনই অবশ্য প্রথম দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসংগীত-এর সঙ্গে জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র কোনো কোনো উচ্চারণ ও দৃষ্টির আশ্চর্য সাযুজ্য। এই উক্তিই সমর্থিত হয়েছে সায়ীদের মন্তব্যে : *ঝরা পালক* ও বিশেষ করে *ধূসর পাণ্ডুলিপি*তে অক্ষরবৃত্তের যে বিশেষ ও স্বকীয় ঢঙ আধুনিক কাব্যপাঠকের জিভে নতুন আস্বাদ এনেছিল, তা প্রায় পুরোপুরি সন্ধ্যাসংগীতের জগৎ থেকে নিয়ে আসা।' অনুরূপ উক্তি করেন অরুণকুমার সরকারও : 'সন্ধ্যাসংগীতের কয়েকটি কবিতা— জীবনানন্দ দাশের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* যেগুলির প্রায় আক্ষরিক অনুকরণ।' সায়ীদ সুন্দর সাযুজ্যবোধক পাশাপাশি বসিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের *দহিত, দহিত তারে দহিত কেবল* ও জীবনানন্দের *সে আগুন জ্বলে যায়/ সে আগুন জ্বলে যায়/ সে আগুনে জ্বলে যায়/ দহে নাকো কিছু*। দ্বিতীয় প্রবন্ধে সায়ীদের একটি উক্তি উদ্ধৃতিযোগ 'প্রভাত সংগীতে *নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ* কবিতার ররীন্দ্রনাথ অস্তিত্বের অকর্মক নিশ্চলতা থেকে উজ্জীবিত প্রবহময়তায় ঝর্ণার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনের যে অপার উদ্দাম ও অকুণ্ঠ মুক্তিতে অভিষিক্ত হয়েছিলেন, সেই একই মুক্তির উল্লাস উচ্চকিত করেছিল নজরুল ইসলামকে যখন তিনি রচনা করেছিলেন *অগ্নিবীণা* কাব্যগ্রন্থের বিদ্রোহী কবিতাটি, মাইকেলকে বঙ্গভাষা সনেটে কিংবা বুদ্ধদেব বসুকে বঙ্গীয় বন্দনায়।'

রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক এই তিনটি প্রবন্ধ বাদে আছে সাহিত্যবিষয়ী আরো কয়েকটি রচনা। বক্তা মুনীর চৌধুরী একজন বিরল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটি কান্তিমান নিবন্ধ। মুনীর চৌধুরীর যে-তিনটি গুণের কথা তিনি 'অসাধারণ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বামপন্থী চিন্তাধারা, নাটক ও বক্তৃতা, তার সঙ্গে চতুর্থ একটি গুণ অবশ্যই উল্লিখিত হতে পারত : তাঁর মেধাবী ও দিকদর্শী গদ্য রচনা। ওই প্রবন্ধের শেষে মুনীর চৌধুরীর একটি টেপ-ধৃত বক্তৃতা অবিকল উদ্ধৃত ও যোজিত হওয়ায় লেখাটি হয়ে উঠেছে মূল্যবান। কবিতার অনুবাদ প্রবন্ধে কাব্যানুবাদ ব্যাপারটিকে সায়ীদ 'প্রয়োজনীয় পাপ' এই উদ্ধৃতি যোগ্য অভিধায় অভিহিত করেছেন, সমকাল প্রবন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধটি জীবন্ত ও প্রচুর কৌতূহলপ্রদ। সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত *সমকাল* পত্রিকা প্রকাশের মধ্য পর্যায়েই এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল। অনুজ সম্পাদকের চোখে অগ্রজ সম্পাদক ও তাঁর পত্রিকা কিরকম প্রতিভাত হয়, সেদিক থেকেও রচনাটি কৌতূহল জাগিয়ে দ্যায়। 'বাংলা সমালোচনা' প্রসঙ্গে প্রবন্ধে সায়ীদ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটি দ্রুত রেখালেখ্য এঁকেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল, সুধীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বিবেচনা জানিয়েছেন। একটি উদ্ধৃতি : 'না মানলে ভুল হবে যে, বাংলা সাহিত্যের প্রধান ক্লাসিক্যাল লেখক মাইকেল নন, বঙ্কিম। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে সৎ মন্তব্য : তিনি সর্বজ্ঞ। একবার মনে হয়, জীবনের সব রহস্য, সব গভীরের শেষ দেখেছেন তিনি, সব সমস্যার সমাধান জানেন, বাঙালি লেখকের মধ্যে তিনি সবচেয়ে 'প্রৌঢ়'। তিনি সবচেয়ে ভারসাম্যময়; সবচেয়ে সর্বদর্শী সর্বগামী ও স্মিত; প্রগাঢ় সীমা ব্যথিত বেদনাময়।' কাজী দৌলত ও চলচ্চিত্র সম্পর্কিত রচনা দুটি বর্জিত হলেই ভালো হত।

বইটি ছোট, কিন্তু দারুণভাবে উদ্দীপক ও সন্দীপক : সায়ীদের স্বভাবশোভন কাঁচা-তাজা জোশে— আনন্দে ও ক্রোধে— ভরপুর। তাঁর তর্কপ্রবণতা, তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চকণ্ঠ গ্রন্থেও ছত্রে-ছত্রে কীর্ণ ও উচ্চকিত। হয়তো একটু অতিভাষী, একটু বেশিমাত্রার উচ্চকণ্ঠ, একরোখা, বিশেষণবহুল কূটাভাসিত অত্যুক্তিপ্রবণ— কিন্তু এই সব দোষই আবার গুণ হয়ে দেখা দিয়েছে, বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। কূটাভাসের মধ্য দিয়েই নিংড়ে বের করে এনেছেন সত্যবোধ, বিশেষণের পর বিশেষণ প্রয়োগ করে একটি সত্যবোধকে মূর্ত করে তুলেছেন, একরোখা ভঙ্গিতে কথা বলে আমাদের বুদ্ধিকে জাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর লেখা যেন পদে পদে পাঠকদের আহ্বান করে তর্কযুদ্ধে, পাঠককেও এইভাবে তিনি অংশ করে নেন, তাঁর যে কোনো বিষয়ের আলোচনায়। প্যারাডক্স বা কূটাভাস থেকে তাঁর বোধ স্পষ্ট-স্বচ্ছ করার কয়েকটি দৃষ্টান্ত : ১. কোনো বই [রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা*] যে একইসঙ্গে এত সুন্দর অপূর্ব অথচ এমন প্রাণহীন, অনুভূতিহীন, শীতল, কঠিন ও ভয়ঙ্কর হতে পারে তা এই বই পড়তে গিয়ে আমরা অনুভব করি। ২. রবীন্দ্রনাথের মহত্তম ত্রুটি সম্ভবত যে তাঁর অসাধারণ একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। ৩. বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার প্রভাব উত্তর-তিরিশের সমালোচনাকে উপকৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সায়ীদের লেখার মনোমণ্ডল সবসময় বিশাল; তাঁর আবেগ ও আদর্শ সবসময় উচ্ছ্বসিত ও উচ্চারিত। তাঁর গদ্যবাক্য দীর্ঘ ও দূরান্বিত। সব মিলিয়ে তাঁর পদ্য রচনায় সেই ব্যক্তিগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পর্শখানি লেগে থাকে, যা রচনাকে করে তোলে অন্তরঙ্গ, মোহন ও সুস্বাদু। কোনো প্রচ্ছদ সন্ধ্যাভাষা ব্যবহার করেন না তিনি, এই গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশের মতোই তাঁর প্রবন্ধাবলি দীপ্ত রৌদ্রময়।

১৯৭৬

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের প্রবন্ধ সংকলন 'দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ'-এর গ্রন্থ সমালোচনা হিসেবে উপরিউক্ত নিবন্ধটি '৭০-এর দশকের শেষার্ধে মাসিক সচিত্র সন্ধানী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আবদুল মান্নান সৈয়দ : কবি, প্রাবন্ধিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেদ খান

স্বপ্নকে চ্যালেঞ্জ

'মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়।' প্রথম যখন এই কথাটি শুনেছিলাম তখন স্বপ্নের পরিধি নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু এই সংশয়ের অপনোদন ঘটালেন প্রিয়দর্শন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। বাংলার অধ্যাপক। বাংলাদেশ টেলিভিশনের জনপ্রিয় উপস্থাপক, কবি, প্রবন্ধকার এবং সংগঠক হিসেবে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব এই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তিনি বলেছিলেন, আকাশই হল স্বপ্নের শেষ সীমা। সায়ীদ সেটা প্রমাণও করেছেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন তিল তিল করে। এই কেন্দ্রের পিছনে গত এগারো বছর ধরে তিনি দিয়ে চলেছেন শ্রম, স্বেদ আর সাধনা। কীভাবে এই কেন্দ্রের সূচনা হল— সে এক মজার কাহিনী।

আটাত্তর সালের জুলাই কিংবা আগস্ট মাসের কোনো এক সন্ধ্যায় আমার সেগুনবাগিচার বাসায় আড্ডা বসেছিল। কথায় কথায় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলে উঠলেন, এমন একটা কিছু করা উচিত যা তৈরি করবে সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষ। আড্ডা সমস্বরে বলল : 'উচিত তো বটেই, কিন্তু করার পথটি কী?' সায়ীদ বললেন : 'আমাদের দেশে পড়াশোনার পাট প্রায় চুকে গিয়েছে। ধরতে হবে ওই জায়গাটাই। মানুষকে সাহিত্য দর্শন এইসবের দিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার খুলে ধরতে হবে চোখের সামনে। টেনে নামিয়ে ফেলতে হবে অন্ধত্বের কালো পর্দা। তবে বুড়োদের দিয়ে হবে না। অজ্ঞানতা এবং মূর্খতা তাদের মজ্জায় ঢুকে গিয়েছে। এজন্যে চাই টগবগে তরুণ, যে দ্বিধাহীন চিত্তে পুরনো আবর্জনা ঝেড়ে ফেলবে। প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, তাকে রক্ষা করবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা বললাম : 'তাহলে কী করতে হবে?'

'একটা আন্দোলন তৈরি করতে হবে— আলোকিত এবং সম্পন্ন মানুষ তৈরির আন্দোলন। এই আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টির জন্যে চাই একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকে সঞ্চারিত হবে অনুপ্রেরণা, সাহায্য, সহযোগিতা। এই কেন্দ্রে থাকবে বিশ্বসাহিত্যের যাবতীয় উপকরণ, অত্যন্ত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, থাকবে মিউজিক লাইব্রেরি, থাকবে প্রকাশব্যবস্থা, সবরকম শিল্পের শাখা। এই কেন্দ্রে গড়ে উঠবে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ওপর পাঠচক্র, সেমিনার হবে, ওয়ার্কশপ হবে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে এক-একটি পাঠচক্র। প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক পর্যায়, তারপর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হবে সেই পাঠক্রম।'

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ যখন এই কথাগুলো বলছিলেন তখন তাঁর গভীর দুই চোখে গোটা পৃথিবীকে আদ্যোপান্ত আবিষ্কারের তৃষ্ণা। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন : 'এজন্যে তো অনেক অর্থ দরকার। কে দেবে এত টাকা? অসম্ভব স্বপ্ন দেখছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। ইউটোপিয়ান স্বপ্নবিলাস।' দুম্ করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তিনি : 'এ আমি করবই। মানুষের মধ্যেও মানুষ থাকে। তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে। এই কেন্দ্র হবেই।'

এই ঘটনার কয়েক মাস পর একদিন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ খবর দিলেন ঢাকা কলেজ সংলগ্ন এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টারের (এখনকার 'নায়েম') একটি কক্ষে শুরু হচ্ছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম অনুশীলন। হাজির হলাম আমরা কয়েকজন। সাতষট্টি বছরের প্রবীণ ছাত্র এবং রেডিও'র সাবেক মহাপরিচালক জনাব আশরাফউজ্জামান খান দিলেন পঁয়ত্রিশটি টাকা। সেটিই হল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম অর্থ-সংগ্রহ। এই ঘটনাটি ১৯৭৮ সালের ১৭ ডিসেম্বরের।

সেই থেকে চলছে কেন্দ্র। পরিসর স্ফীত হচ্ছে— পরিচয়ের গণ্ডি প্রসারিত হচ্ছে। ১৯৮২ সালের ১৮ জুন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র একটি সুপরিসর ভবন ভাড়া নিল ইন্দিরা রোডে। ততদিনে কেন্দ্রের নিজস্ব গ্রন্থাগার হয়েছে, মিউজিক লাইব্রেরি হয়েছে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিয়মিত ক্লাসও নেয়া হচ্ছে— বাড়ছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। দলে দলে ভিড় করছে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী।

১৯৮৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র চলে এল রাজধানীর কেন্দ্রস্থলের একটি ঠিকানায়— ১৪ ময়মনসিংহ রোড— সোনারগাঁ হোটেল আর শেরাটন হোটেলের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। ঠিকানাটি সম্পূর্ণ নিজস্ব, ঢাকা নগর করপোরেশনের বরাদ্দকৃত ভবন। সামনে প্রশস্ত আঙিনা। সেখানে সাজানো ফুলের বাগান, দুপাশে সারিবদ্ধ নানা ধরনের গাছ। এসব কেন্দ্রেরই সাজানো। পিছনদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোতলা ভবনে আছে অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি। এই ভবনটির একটি শাখা প্রসারিত হয়ে কম্পিউটার কক্ষ, বসার এবং অফিসঘর হয়েছে।

এ তো গেল ভবন-কাঠামোর কথা। এরপর কার্যক্রম। বিভিন্ন শিল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাপদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হয়। সপ্তাহজুড়ে চলে কার্যক্রম। নির্দিষ্ট করা রয়েছে সময়। মন ও মননের উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রয়োজনে এখানে জ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বিষয়গুলোকে উপস্থাপন এবং সকল বিষয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপন করার পরিকল্পিত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে যে সমস্ত বিভাগের কার্যক্রম চলছে তা হল : স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে প্রাক-মৌলিক উৎকর্ষ বিভাগ, মৌলিক উৎকর্ষ বিভাগ, সাহিত্যচক্র, রাজনীতিচক্র, অর্থনীতিচক্র, আবৃত্তিচক্র, রবীন্দ্র অধ্যয়নচক্র, অনুষ্ঠান বিভাগ, চারুকলা বিভাগ, চলচ্চিত্র বিভাগ। এই সমস্ত বিভাগে যোগদানের অন্যতম যোগ্যতা হচ্ছে জ্ঞানজিজ্ঞাসার ন্যূনতম তৃষ্ণা।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের গ্রন্থাগার বাংলাদেশের সেরা গ্রন্থাগারগুলোর একটি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিরায়ত সাহিত্য থেকে শুরু করে বাংলাসাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জিতে সমৃদ্ধ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের গ্রন্থাগারটি। সর্বশ্রেণির পাঠকের জন্যে গ্রন্থাগার উন্মুক্ত থাকে বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

কেন্দ্রের অনুষ্ঠান বিভাগটি অত্যন্ত সক্রিয়। প্রতিটি বিভাগের জন্যে মাসে একবার করে বড় আকারের অনুষ্ঠান হবেই এবং তাতে আমন্ত্রিত হয়ে আসবেন দেশের নামিদামি ব্যক্তিরা।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উদ্যোগে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে মাসিক কিশোর পত্রিকা *আসন্ন*। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন এবং অর্থনীতি ও রাজনীতিসংবলিত ত্রৈমাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিত। এছাড়া প্রকাশনা বিভাগের উদ্যোগে বের হচ্ছে বাংলাভাষা ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বইগুলো। প্রকাশনা বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হল, বাংলাভাষা ও বিশ্বজ্ঞানের ক্রমাগত বই প্রকাশ করে যাওয়া।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একটা বড় অবদান হল আড্ডা। 'ক্যান্টিনে আড্ডা, সবুজ চত্বরে আড্ডা, খোলা বারান্দায় আড্ডা, সর্বত্রই আড্ডা। তরুণ-প্রবীণ কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, শিল্পী, সাংবাদিক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী সবাই আসছেন— নাড়ু-মুড়ি-পায়েস-চিঁড়াভাজা চলছে অবিরাম— আর চলছে অবিরাম আড্ডা।' একজন কবির মন্তব্য : 'দিনে অন্তত একবার নিজের মুখোমুখি হই এখানে।' আর-একজন সংস্কৃতিপ্রেমীর মন্তব্য : 'কোথাও কিছুই হচ্ছে না। তবু এখানে কিছু হচ্ছে।' কারো মতে : 'এটা হল বিখ্যাত হওয়ার মঞ্চ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান স্কুল-কলেজ কর্মসূচি। দেশের সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে চালু হয়েছে এই পড়াশোনার কর্মসূচি। ইতোমধ্যে ছেচল্লিশটি জেলার স্কুল-কলেজে ছড়িয়ে পড়েছে এই কর্মসূচি। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠক্রম। বিশ্বের সেরা গ্রন্থাবলি এই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। পড়া হয়, আলোচনা হয়, মূল্যায়ন হয়, সার্টিফিকেট এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয় প্রতিটি স্কুল-কলেজের প্রতিটি শ্রেণিতে আলাদা আলাদা করে। পাঠক্রমের বইগুলো সরবরাহ করা হয় বিনামূল্যে। একমাত্র লক্ষ্য সম্ভাবনাময় পাঠক সৃষ্টি করা, আলোকিত শিক্ষিত নতুন প্রজন্ম তৈরি করা। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সারা দেশের ছেচল্লিশটি জেলায় গড়ে উঠেছে একই ধরনের সুযোগসুবিধাসম্পন্ন ছোট ছোট বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

কেন্দ্রের প্রাণপুরুষ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ কেবল একটি কথাই বলেন : 'বিরাট সমৃদ্ধ ও আলোকিত জাতি সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন সম্পন্ন ও আলোকিত মানুষ, আর এই মানুষ গড়ে তোলার জন্যে দরকার একটি দেশভিত্তিক আন্দোলন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এই আন্দোলনেরই উৎসস্থল। সব সমাজেই কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের সংখ্যা কম কিন্তু যাঁদের মধ্যে থাকে জ্ঞানের ব্যাপ্তি, উন্নত মূল্যবোধ, জীবনোৎকর্ষ, আত্মমর্যাদার মহিমা। এসবকিছুর অসাধারণ বিকাশ সমাজকে রক্ষা করে, সামনের দিকে নিয়ে যায়। কেন্দ্র এই মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির আন্দোলন রচনা করেছে।'

গোড়াতেই বলেছিলাম : মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নামের আটচল্লিশ বছর বয়স্ক সুপ্রিয় ব্যক্তিটি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তোলার ভিতর দিয়ে নিজের মাপটিই আমাদের জানিয়ে দিলেন। তাঁর স্বপ্ন যদি আকাশ স্পর্শ করে, তবে তিনিও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই দীর্ঘতর হবেন। স্বপ্নকে চ্যালেঞ্জ করে সত্যে পরিণত করার মতো ক্ষমতা থাকে ক'জনের?

১৯৮৯

আবেদ খান : সাংবাদিক
প্রাক্তন সম্পাদক, সমকাল ও কালের কণ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মলেন্দু গুণ

আমার কণ্ঠস্বর

ঢাকা আমার ঢাকা
আমার কাজ কি তোমাকেই শুধু
শাশ্বতে ধরে রাখা?

আমি যখন ঢাকায় পৌঁছলাম তখন দুপুর। চতুর্দিকে চিকচিক করছে রোদ। শোঁ-শোঁ করছে হাওয়া। তেজগাঁও স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটেই পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের হোস্টেলে চলে গেলাম। বাচ্চু আর মামুন আমাকে লালগালিচা সম্বর্ধনা দিয়ে গ্রহণ করল। শুরু হল আমার ঢাকার জীবন। বাচ্চু আমার পুরনো বন্ধু। কিন্তু সে শুধু আমার বন্ধুই। ঢাকার শিল্প-সাহিত্যের আন্দোলনের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক ছিল না। ওর জগৎজুড়ে ছিল শিবানী আর শিবানী। ও ছিল ছাত্র সংসদের একজন নির্বাচিত নেতা। সাধারণ সম্পাদক।

শিল্প-সাহিত্যের নতুন আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল মামুন। মামুনুর রশীদ। নাটক-পাগল মামুনুর রশীদ। বাচ্চু আমাকে মামুনের হাতে সঁপে দেয়। মামুন পরম বন্ধুর মতো তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। এই নতুন বন্ধুটিকে পাওয়ার ফলে আমি যেন ঢাকার চাবিটিই আমার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাই।

একদিন সন্ধ্যায় মামুন আমাকে নিয়ে গেল তেজগাঁও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের হোস্টেলে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের খুব কাছেই সেই কলেজটি। *কণ্ঠস্বর* পত্রিকার সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ওই কলেজে বাংলার অধ্যাপক। থাকেন হোস্টেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়ীদ ভাইয়ের সঙ্গে মামুনের পরিচয় ছিল। তাছাড়া গ্রাম থেকে লেখা আমার পত্রের উত্তরে ঢাকায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সায়ীদ ভাই আমাকে লিখেছিলেন। এই আমার সম্পর্কেও তাঁর একটা মানসিক প্রস্তুতি আগে থেকেই ছিল। পরিচয়মাত্র সায়ীদ ভাই আমাকে তাঁর স্বভাবসুলভ কৌতুকমিশ্রিত হাসিতে আপন করে নিলেন। বললেন, *কণ্ঠস্বর* পত্রিকার কিছু ছোটখাটো কাজ : যেমন, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা, সম্পাদকের চিঠি নিয়ে বিভিন্ন লেখক ও বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠানের কাছে যাওয়া, বিজ্ঞাপনের টাকা তোলা, বিভিন্ন বুকস্টলে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া... তাদের কাছ থেকে বিক্রি হওয়া কাগজের টাকা সংগ্রহ করা— ইত্যাদি কাজের জন্য তাঁর একজন সাহায্যকারী দরকার। আমি চাইলে কাল থেকেই ওই কাজে লেগে যেতে পারি।

আমি সায়ীদ ভাইয়ের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। সায়ীদ ভাই ছিলেন খুবই রসিক মানুষ। তখন তিনি সদ্য বিয়ে করেছেন। ভাবী সঙ্গে থাকেন না— তিনি থাকেন সায়ীদ ভাইয়ের পৈতৃক বাড়ি উত্তর শাজাহানপুরে। সায়ীদ ভাইয়ের বাবা ছিলেন হরগঙ্গা কলেজের প্রিন্সিপাল। উত্তর শাজাহানপুরে একটি ছোট্ট বাড়ি করেছিলেন। আমি ওই বাড়িতেও অনেকবার গেছি। সায়ীদ ভাইয়ের একটি পিক্-আপ ভ্যান ছিল। ব্যবসায়িক কারণে তিনি সেটি ক্রয় করেছিলেন। সেটি কলেজসংলগ্ন হোস্টেলের মাঠে থাকত। যখন জানলাম ওটি তাঁর, তখন আমি সায়ীদ ভাইকে বললাম, আমি যদি এটি চালাতে শিখে নিই, তাহলে *কণ্ঠস্বর*-এর কাজে ওটাকে ব্যবহার করা যায়— আমারও একটা নিশ্চিত আয়ের পথ হয়। আপনি কী বলেন?

সায়ীদ ভাই মুচকি হেসে বললেন, তার দরকার হবে না, আমার একটি বাই-সাইকেল আছে, আপনি ওটাই ব্যবহার করতে পারবেন। সাইকেল চালাতে পারেন তো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, পারি না মানে?

কাল থেকে ওটা আপনার হেফাজতেই থাকবে। শুধু লক্ষ রাখবেন যেন হারিয়ে না যায়।

আমি বললাম, আমি হারিয়ে যেতে পারি কিন্তু আপনার সাইকেল কখনো হারাবে না।

আমি আমার কথা রেখেছিলাম। সায়ীদ ভাইয়ের সাইকেলটি আমি দীর্ঘদিন ব্যবহার করেছি। সারা ঢাকা শহর আমি চষে বেড়িয়েছি ওই সাইকেলে চড়ে। হারাইনি।

আমি পরদিন থেকে *কণ্ঠস্বর*-এর কাজে লেগে যাই। সায়ীদ ভাই আমার হাতে-পায়ে বাই-সাইকেলটি হস্তান্তর করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঘোষিতভাবে আমার বহুবিড়ম্বিত শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটিয়ে, *কণ্ঠস্বর* পত্রিকার একজন কর্মী হিসেবে আমার কর্মজীবন শুরু হল। বেতন অস্থির। মানে স্থির হয়নি। সায়ীদ ভাই বললেন, নির্ধারিত বেতন না থাকলেও, মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকে খাই-খরচ বাবদ কিছু পাবেন এবং আপনি যেসব বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করবেন, তার কমিশন পাবেন শতকরা ১০% হারে। তাতে আপনার কোনোক্রমে চলে যাবে। একটু কষ্ট তো করতেই হবে। হা-হা। তাঁর প্রাণখোলা হাসি।

সাইকেলটি পাওয়াতে আমার খুব লাভ হল। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবার কষ্ট এবং খরচ দুই-ই কমল। তাছাড়া সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার বিচরণক্ষেত্রকে প্রসারিত করার কাজে ওই যন্ত্রটি আমাকে বেশ সাহায্য করতে থাকল। তখন প্রতিদিনই নতুন নতুন কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-সংলগ্ন শরীফ মিয়ার কেন্টিনটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ। সেখানে দুই আনায় চা, আট আনায় ছোট এক প্লেট খাসির বিরিয়ানি পাওয়া যেত। অতি অল্প দামে পাওয়া যেত 'মাক্ষন-মারা' টোস্ট বিস্কিট। ফলে সেখানে ছিল আঁতেল ছাত্রদের ভিড় এবং নবীন সাহিত্যিকদের আড্ডা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও, সংলগ্ন আর্ট কলেজ এবং একটু দূরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আঁতেলরাও শরীফের কেন্টিনে আসতো।

মলয় ভৌমিকের মাধ্যমে ওই শরীফ মিয়ার কেন্টিনেই আমার পরিচয় হয় আবুল হাসানের সঙ্গে। হাসানের কবিতা আমি আগেই *কণ্ঠস্বর* পত্রিকায় পড়েছিলাম। এবং ওর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বিশেষ করে *কণ্ঠস্বরে* প্রকাশিত আবুল হাসানের *বন্ধুকে : মনে রাখবার কিছু* কবিতাটি আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। পরিচয়মাত্র আমি হাসানকে সে-কথা জানালাম। হাসান ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিল। হাসানও জানাল যে, সে-ও আমার কবিতা পড়েছে *আজাদ*, *সংবাদ* এবং *সমকালে*। তবে সেগুলো যে হাসানের কবিতাটির মতো মনে দাগ কাটার মতো কবিতা ছিল না, তা আমিই বললাম। হাসান লজ্জা পেল খুব। খুশিও হল। আমি লক্ষ করলাম, করমর্দনের জন্য আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়া আবুল হাসানের হাতটি এক অজানা আবেগে কাঁপছে। একাকার হয়ে মিশে ছিল বলেই হাসানের স্নায়ুবিক দুর্বলতাকে ওর রোমান্টিক আবেগ থেকে পৃথক করা কঠিন ছিল। ওর যখন কোনোকিছু ভালো লাগত তখন ওর হাত-পা ও ঠোঁট কাঁপত। রেগে গেলেও। এটা আমি আমৃত্যু হাসানের মধ্যে লক্ষ করেছি। আমি বেশ দীর্ঘ সময় হাসানের আবেগকম্পিত হাতটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মুঠোর মধ্যে বন্দি করে রেখেছিলাম। আবুল হাসান তা ছাড়িয়ে নেয়নি। হাসানকে আমার খুব ভালো লেগে গেল। হাসানের আচরণ থেকে মনে হল আমাকেও তার পছন্দ হয়েছে।

ইতিমধ্যে সায়ীদ ভাই আজিমপুর সরকারি হাউজে বাসা বরাদ্দ পান এবং ভাবীকে নিয়ে সেখানে উঠেন। ওই বাসায় *কণ্ঠস্বর*-এর কর্মী-লেখকরা নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ওখানেই কবি আসাদ চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি তখন বি-বাড়িয়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। মাঝে মাঝে ঢাকায় আসেন। 'নতুন রীতির গল্প' সম্পাদনা করবেন বলে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। বাইবেলের ফর্ম অনুসরণ করে লেখা তাঁর একটি কবিতা আমার ভালো লেগেছিল। আমুদে মানুষ। আড্ডাবাজ। আমি *কণ্ঠস্বর*-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি জেনে খুশি হলেন। আমাকে উৎসাহ যোগালেন। বললেন, বাহ্।

ওখানেই আমার সঙ্গে পরিচয় হয় হুমায়ুন কবির এবং সাযযাদ কাদিরের সঙ্গে। সাযযাদ কাদিরের কথা জানতাম না, কিন্তু হুমায়ুন কবিরের কবিতা তখন প্রচুর ছাপা হত। সাযযাদ পরে *কণ্ঠস্বর*-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। সে ছিল একজন দক্ষ প্রুফ-দেখক, আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিবিড়-পাঠক এবং মুদ্রণ সম্পর্কে তার ভালো অভিজ্ঞতা ছিল। সে থাকত মহসীন হলে। পরে ওই দুজনের সঙ্গেই আমার গভীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিশেষ করে সাযযাদের সঙ্গে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবীর কৃপায় পার্টি হাউজের ওই ছোট্ট বাসাটিতে দ্বিপ্রাহরিক আহার সম্পন্ন করতে পারতাম। অবশ্য আহারটা পুরোপুরি শ্রম-বিনিময়হীন ছিল, তা বোধহয় বলা যাবে না। কাছেই নিউমার্কেট। আমি মাঝে মাঝে ভাবীকেও বাজার করে দিতাম। দু-একদিন কি আর এঁটো বাসনকোসনও ধুইনি? ধুয়েছি ধুয়েছি। পরে তাঁদের প্রথম কন্যা লুনার জন্ম হওয়ার পর একটু আধটু বাচ্চা-রাখার কাজও করেছি। তা না করলে ভাবীই-বা এমন চমৎকার রান্না করতে পারবেন কী করে? *কণ্ঠস্বর* পত্রিকার মতোই রান্না জিনিসটা হল একটা যৌথ কর্ম। মহিলাদের ভালো রান্নার জন্য পুরুষদের সহযোগিতার প্রয়োজন ১৯৯৪ সালে যেমন আছে, ১৯৬৭ সালেও ছিল। ভবিষ্যতেও থাকবে। বিকেলের দিকে লুনা যে আমার কাঁধে চড়ে নিউমার্কেটে ঘুরত, সে-কথা আজকের লুনা বিশ্বাস করতে চাইবে কেন? সম্প্রতি লুনা নিজেই যে মা হয়েছে। লুনা, তোমার মেয়েটি এখন যেমন, আমার সময় তুমি ঠিক সেরকম ছোট্টটি ছিলে। *কণ্ঠস্বর*-এর সূত্রে আমি ছিলাম তোমার বাবা কর্তৃক নিয়োজিত তোমার মায়েরও এক অঘোষিত সেবাদাস। যদিও তখন তার বাইরের আত্মগর্বিত ভব্য-পরিচয়টি ছিল অমরত্বলোভী তরুণ কবির।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি পলিটেকনিক হোস্টেলেই নিশিযাপন করি। দিনে এখানে-ওখানে *কণ্ঠস্বর*-এর বিজ্ঞাপনের সন্ধানে বের হই। লোকজনকে *কণ্ঠস্বর* পত্রিকা সম্পর্কে একটা খুব উঁচু ধারণা দেবার চেষ্টা করি। পত্রিকার নাম শুনে তাঁরা আঁতকে ওঠেন। কেউবা আমার কথা শোনেন। কেউ কেউ বিরক্তিসহকারে আমাকে তাড়িয়ে দেন। কেউ এখন নয়, পরে আসার জন্য বলেন। আমি বিজ্ঞাপনের জন্য ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠানের কাছেই ধর্না দিই। বলা তো যায় না, যদি লাইগা যায়! কিন্তু না, সহজে লাগে না। *যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই;/ পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন*— এই নীতিবাক্যের প্রতি আমি আস্থা রাখি। ফলে আমার বিজ্ঞাপন অনুসন্ধানক্ষেত্র খুবই প্রসারিত হয়। কিন্তু কাজের কাজ হয় না। ঢাকার মানুষের মন বড় শক্ত। শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তাদের অনুরাগেরও বড় অভাব। কোনো কোনো ব্যক্তি আমার সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করেন যে, মনে হয়, দেই শালার পেটে চাকু ঢুকিয়ে। কিন্তু চাকু পাব কোথায়? এটা তো আর বারহাট্টা নয়, এটা ঢাকা। চাকু না ঢুকিয়েই যে অবস্থা, চাকু ঢোকালে তো কথাই নেই। একেকবার মন ভেঙে পড়ে। ... হতাশা এসে ভিড় করে। তখন ভাবি, নতুন কাজে নেমেছি, ভেঙে পড়লে তো চলবে না। গুনগুন করে কবিগুরুর গান গাই : *বারে বারে ঠেলতে হবে হয়তো দুয়ার খুলবে না./ তাই বলে তো ভাবনা করা চলবে না*। মনে পড়ে, *কণ্ঠস্বর*-এর বিজ্ঞাপনের জন্য আমি ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়নের বড়কর্তা রশিদ সাহেবকে তাঁর গুলিস্তান-সংলগ্ন অফিসটিতে গিয়ে বিরক্ত তো করতামই, মাঝে মাঝে তাঁর শাজাহানপুরের বাসায় গিয়েও হানা দিতাম। আমার সঙ্গে থাকত সায়ীদ ভাইয়ের লেখা চিঠি এবং বাই-সাইকেল। ভদ্রলোক আমার অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য একপর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বিজ্ঞাপন দিতেন।

নয়াবাজারে যে দোকান থেকে *কণ্ঠস্বর*-এর জন্য ৯২ পাউন্ড কার্টিজ কাগজ এবং কভারের জন্য আর্ট বোর্ড কিনতাম, ওই দোকানের ঢাকাই মালিকের (নাম সম্ভবত মালেক সাহেব) কাছ থেকেও আমি *কণ্ঠস্বর*-এর জন্য অর্ধপাতা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছিলাম। কাগজের দোকানের নাম ছিল 'পাকিস্তান ট্রেডিং হাউস'। ৩১ নওয়াব ইউসুফ রোড, নয়াবাজার। আমার শাসনামলেই *কণ্ঠস্বর*-এর পাতায় জুয়েলার্স ও টেইলার্সের বিজ্ঞাপন যুক্ত হয় (নিউমার্কেটের জেবা জুয়েলার্স এবং তেজতুরি বাজারের বাসস্টপ-সংলগ্ন ডিজাইন টেইলার্স)। বাংলাবাজারের একজন হিন্দু, যিনি আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের আত্মীয় ছিলেন, পরোক্ষে 'ওই জিনিসের' ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকেও একটি সিকি-পাতার বিজ্ঞাপন আমি সংগ্রহ করেছিলাম। ভদ্রলোক ব্যাটারির ব্যবসা করতেন। নওরোজ কিতাবিস্তানের বিজ্ঞাপনটি অবশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনাব কাদের খান সাহেবকে ভয় না দেখিয়েও পাওয়া যেত। বাংলা একাডেমি ছাড়া, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নওরোজ কিতাবিস্তানই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যে *কণ্ঠস্বর* পত্রিকাকে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করত।

বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমার বিশেষ-পারদর্শিতার কথা *কণ্ঠস্বর*-সম্পাদক এখনও স্বীকার করেন। কিন্তু ওই কাজ আমার বেশিদিন করা হয়নি। মাস দুয়েকের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম, এটা আমার কাজ নয়। এর চেয়ে ঢাকা শহরে রিকশা চালানো ভালো। ভালো কমলাপুরে ট্রেনযাত্রীদের মাল ওঠানো-নামানোর কাজ করা। তার চেয়ে যা ভালো মনে হয়েছিল, সে কথা তো ইঙ্গিতে আগেই বলেছি। তবু যতদিন ওই কাজটি করেছিলাম, ভালোভাবেই করেছিলাম বলে আমি দাবি করব।

১৯৯৪

নির্মলেন্দু গুণ : কবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতিউর রহমান

আমি তাঁর অনুরাগী

আমাদের বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের যে সীমাহীন অপূর্ণতা, সেই অপূর্ণতা ঘোচাবার দায় নিয়ে ৩০ বছর আগে একদিন আলোকিত মানুষ গড়ার আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। এখনো পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে যাচ্ছেন সেই আন্দোলন। পূর্ণ হয়েছে তাঁর ৩০ বছরের পথচলা। কিন্তু থেমে নেই তিনি। আলোকিত মন আর আলোকিত মানুষ গড়ার কাজে নিরলস, নিরন্তর হেঁটে চলেছেন এই আলোর ফেরিওয়ালা।

এরকম কোনো মহৎ কাজের জন্য বা কোনো বড় অর্জনের জন্য চাই স্বপ্ন, চাই স্বপ্নতাড়িত মানুষ। শুধু স্বপ্ন থাকলেই তো হয় না। চাই স্বপ্নপূরণের উদ্যম আর কর্মনিষ্ঠা। নিঃস্বার্থ মানুষ চাই, চাই ঔদার্য আর সংবেদনশীলতা, সর্বোপরি একটি পরিশীলিত মন চাই। আমি গভীর বিস্ময়ে লক্ষ করি, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মধ্যে এর সবকটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যই প্রায় সমভাবে বর্তমান।

একটা কথা আমি প্রায়ই বলি, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সঙ্গে আমার আরও আগে কেন পরিচয় হল না, ঘনিষ্ঠতা হল না? হয়তো কিছুটা হালকা চালেই কথাটা বলি। কিন্তু আমার মনের গভীরে কথাটা সত্যি হয়ে বাজে। সেই ষাটের দশকে উনি যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ছেন, আমরা তখন ঢুকছি। বয়সেরও ব্যবধান আর তেমন কী। আমরা সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত থেকেছি, সক্রিয় হয়েছি। তাঁর নানা কর্মকাণ্ডের খবরও আমাদের জানা ছিল। তাঁর *কণ্ঠস্বর* পত্রিকা দেখেছি, তাঁকে টিভি চ্যানেলে দেখেছি জনপ্রিয় উপস্থাপক হিসেবে। আরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানাভাবে তাঁকে দূর থেকে চিনেছি। অথচ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কুড়ি বছর পেরোনোর পর নতুন শতাব্দীতে, ২০০০ সালে তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়। অতঃপর চেনাজানা, ঘনিষ্ঠতা। ভাবি, তাঁর সঙ্গে আগে পরিচয় হলে কত কাজই-না একসঙ্গে করা যেত! আজ দেখি, চিন্তায়, কাজে আমরা তো একই পথের যাত্রী। কত আকাঙ্ক্ষাই তো অভেদ আমাদের। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মৌলিক যে চিন্তা— শিক্ষা সংস্কৃতিকে বিকশিত করা, দেশ ও মানুষকে এগিয়ে নেওয়া, ভালো মানুষ সৃজনে সহায়ক হওয়া— এসব তো প্রথম আলোরও স্বল্প। দুই-ই তো বদলে দিতে চায় মানুষকে, সমাজকে, দেশকে। সংকুচিত মনে আরেক ব্যক্তিগত কাকতালীয় মিলের কথা বলি, তিনি ২০০৪ সালে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পেলেন, আমি পেলাম ২০০৫ সালে। তাঁর পথেই তো চলেছি আমরা। গত এক দশকে একসঙ্গে নানা কাজ করেছি, শামিল হয়েছি কত-না সমচিন্তায়। সামনের দিনগুলোতেও চলতে চাই পাশাপাশি।

তাঁর দক্ষতা, যোগ্যতা, মেধা, মনন আর সৃজনশীলতার অনুরাগী আমি। তাই, এ দুঃখ আমার রয়েই যাবে যে কেন তাঁর সঙ্গে আগে পরিচয় হল না। তবু আজ, এ কথাও বলব, অনেক পরে ঘনিষ্ঠতা হলেও যেটুকু পেয়েছি, যা পাচ্ছি সেইটুকুতেই খুশি আমার মন।

২০০৯

মতিউর রহমান : সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবুল মোমেন

আনন্দপথের অভিযাত্রী সায়ীদভাই

সায়ীদ ভাইয়েরও বয়স হয়েছে। অনেক কাল ধরেই শরীর নিয়ে নানা অনুযোগ করে আসছেন। তবে এ সত্ত্বেও তাঁর উপস্থিতি বরাবর প্রাণশক্তিরই প্রকাশ ঘটিয়েছে। আর সে কারণে তাঁর যে বয়স হয়েছে তা আমাদের মনে হয় না। এখনও তাঁর উপস্থিতির এই সহর্ষ প্রকাশের ব্যতিক্রম ঘটে না। সায়ীদ ভাই মানেই প্রাণবন্ত সাহচর্য। এর আকর্ষণ কেউ ফেলতে পারে না, তরুণ-তরুণীরা তো নয়ই। যিনি সহজাতভাবে বা স্বভাবগুণেই অন্যদের আকৃষ্ট করতে পারেন তাঁকে ঘিরে স্বভাবতই গুণগ্রাহীদের পরিমণ্ডল তৈরি হবেই। তাতে তারুণ্যেরই আধিক্য থাকা স্বাভাবিক। এবং তাই সেই পরিমণ্ডল হবে পরিবর্তনশীল সেটাও স্বাভাবিক, এবং এটা যে সজীবতারই লক্ষণ তা-ও মানতে হবে। আর এর অর্থ হল বিকাশমানতা—এই স্থবিরতা ও অচলায়তনের দেশে এ মস্ত পাওয়া। তাঁকে ঘিরে বাস্তবে এরকমটাই ঘটে চলেছে।

সায়ীদ ভাই সাহিত্যের ছাত্র, ছোটবেলা থেকেই তাঁর সাহিত্যানুরাগের কথা তিনি বলেছেন। আর দশটা বাঙালি বালকের মতোই কাব্যচর্চার মাধ্যমে এই অনুরাগের প্রকাশও তিনি ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁকে নিভৃত একাকীর সাধক হতে দেয়নি। বরং তিনি বরাবর থেকেছেন সমবয়সী ও অনুজদের প্রাণোচ্ছল গোষ্ঠীর দলপতি, এবং সেইসাথে কবিসত্তা তাঁকে দিয়েছে স্বপ্ন বুনবার মায়াবী মন। আর এ দুই অন্তর্নিহিত প্রবণতাকে মেলানোর ব্রতেই তিনি কাটিয়ে যাচ্ছেন জীবন। মস্তবড় স্বপ্নকে ঘিরে গড়ে উঠেছে তাঁর সংগঠন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নামটি উচ্চারণমাত্র এ প্রতিষ্ঠানের নামটি মনে পড়ে যাবে।

মনে রাখতে হবে, এ প্রতিষ্ঠান কোনো সীমিত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে গড়ে ওঠেনি, এ কোনো বাজেট-নির্ভর ছকবাঁধা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নয়। অর্থাৎ একজন বা কয়েকজন মিলে শলাপরামর্শ করে একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করল, তারপর বাস্তবায়নের জন্যে বাজেট প্রাক্কলন করা হল এবং শেষে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করে কাজে নেমে পড়ল— ব্যাপারটা সেরকম নয়। এটি মূলত নবীন সৃষ্টিশীল নাগরিকদের মহৎ স্বপ্নে উজ্জীবিত করার কাজই করে যাচ্ছে। তাই এ প্রতিষ্ঠানের কোনো চূড়ান্ত ও স্থায়ী রূপ নেই, এ হল ক্রমবিকাশমান একটি প্রতিষ্ঠান। কাজের প্রাণপ্রবাহ আসে মূলত সাহিত্যপাঠ থেকে, তাই বই এ প্রতিষ্ঠানের মূল অবলম্বন। বইকে ঘিরেই ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, বিশাল ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা, লোকবল ইত্যাদি। মূলে কিন্তু স্বপ্ন— বড়লোক নয়, বড় মানুষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা— তাঁর ভাষায় আলোকিত মানুষ।

সায়ীদ ভাই এই বীজমন্ত্রটি কখনও ভোলেননি, ছাড়েনওনি। যে বীজটি সতেজ, প্রাণবন্ত সেটি একটু পরিচর্যা পেলেই তরতর করে বেড়ে উঠবে। এবং বাইরের ঝড়ঝাপটা ও প্রতিকূলতা সামলানোর ক্ষমতাও থাকবে এর বেশি। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বরাবর এগিয়ে গেছে। আজও এগিয়ে চলেছে।

আমাদের এটি আবার কর্তাভজা দেশ, সবসময় এ সমাজ ভজনা করার বা সামনে ঠেলে দেওয়ার জন্যে কর্তাব্যক্তি খুঁজে বেড়ায়। সায়ীদ ভাই সত্তরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সমাজের একজন কর্তাব্যক্তি হয়ে উঠেছেন— গণমাধ্যমের ভাষায় বলা যায় পাব্লিক ফিগার বা গণব্যক্তিত্ব। ব্যক্তির বন্দনাও চলবে, আর সেই সাথে সামাজিক, আধা-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক নানা উদ্যোগের খুচরো ও পাইকারি পৌরোহিত্যের দায় তাঁর ওপর চাপানো হবে। অনেক সময় সামাজিক দায়ের চাপে মূল কাজই লাটে ওঠার উপক্রম হয়। সৃজনশীল শিল্পীদের ক্ষেত্রে এভাবে সৃষ্টিশীলতার ক্ষতি হতে আমরা দেখেছি। জয়নুল আবেদীন তাঁর প্রথমজীবনের অসাধারণ শিল্পকর্মের মান ও প্রাচুর্যের দৌলতে শিল্পচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সরকারের শিল্প উপদেষ্টার দায় বহন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা দায়িত্ব পালন করেও টিকে গেছেন। কিন্তু এই সৌভাগ্য অনেকের হয় না, এই যোগ্যতাও অনেকের থাকে না।

সায়ীদ ভাইয়ের কবিখ্যাতি তেমন হয়নি। তাঁরই অবহেলায় কাব্যদেবীর প্রসন্নতা তিনি হারিয়েছেন। নাকি ভুল বললাম, নিছক ব্যক্তিগত কাব্যসাধনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বার্থপরতার গণ্ডি ছেড়ে তিনি মানুষ ও ভবিষ্যৎ বা মানুষের ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যতের মানুষ তৈরির এক মহৎ ও ব্যাপ্ত অভিযাত্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কারও রচিত কবিতা মহৎ হবে কিনা তা বলা মুশকিল, কিন্তু বাস্তবায়নে সফল না হলেও ভাবনার মহত্ত্ব খাটো হয় না কখনও। সায়ীদ ভাই এবং আমাদের সবার জন্যে স্বস্তি ও আনন্দের বিষয় হল তাঁর স্বপ্ন ও ভাবনা সফল হয়েছে, হয়ে চলেছে— এ কথা অতি বড় নিন্দুককেও স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া সাহিত্যের অঙ্গনে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পরোক্ষ অবদান থাকছেই।

কিন্তু এই বিশাল সফল কর্মযজ্ঞের নিচে সাহিত্যাঙ্গনে সায়ীদ ভাইয়ের যে প্রত্যক্ষ অবদান তা ঢাকা পড়ে গেলে কি ঠিক হবে? আজকাল খুব অ্যাকাডেমিক বা গবেষণার প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন তাঁর সম্পাদিত সাহিত্য সাময়িকী *কণ্ঠস্বর*-এর ভূমিকার কথা তোলেন না। সাময়িকীটি তারুণ্যের স্পর্ধা বা জয়বার্তা নিয়েই হাজির হয়েছিল। সম্পাদকের প্রাথমিক ঘোষণায় মানানসইভাবেই ছিল তারুণ্যের অহঙ্কার, এবং উপযুক্ত রকম বেপরোয়ামি। ছিল যা কিছু প্রচলিত, স্বীকৃত, প্রতিষ্ঠিত তাকেই অমান্য করবার দুঃসাহস, এমনকি উপহাস করার মতো সারল্য। স্বভাবতই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত মহলে এতে আলোড়ন উঠেছিল, অনেকেই তারুণ্যের সাময়িক খেয়াল হিসেবে একে খারিজ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে কেউ কেউ এর মধ্যেকার সম্ভাবনাকে দেখতে ভুল করেননি।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি এক দশক *কণ্ঠস্বর* ছিল সায়ীদ ভাইয়ের সকল মনোযোগের কেন্দ্র। ভাবনায় তারুণ্য ও বেপরোয়া মনোভাবের প্রকাশ ঘটলেও সম্পাদনা ও প্রকাশনায় সায়ীদভাই কিন্তু সর্বোচ্চ পরিণত চিন্তার ছাপ রাখতে চেয়েছেন। তাই *কণ্ঠস্বর* তারুণ্যের আর দশটা হুজুগের মতো অকস্মাৎ জ্বলে উঠে নিভে যায়নি। বরং মনে হয়, যে মনোযোগ ও যত্ন নিয়ে তিনি সম্পাদনার কাজটি করে গেছেন তার একটা অন্তর্নিহিত চাপ স্বভাবগত তারুণ্যপ্রবণ ও স্বপ্নবাজ মানুষটিকে ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত করে তুলেছিল। ভেতরকার স্বপ্নের বেগ-আবেগ তারুণ্যের পক্ষে চেপে রাখা কি সম্ভব? অধ্যাপনা আর সম্পাদনার সূত্রে যারা তাঁর পাশে এসেছিল একসময় তাদের মানসিক সমৃদ্ধির আরও ব্যাপ্ত ক্ষেত্র ও বড় সম্ভাবনা বাস্তবায়নের কাজ তাঁকে পেয়ে বসেছিল। সাহিত্যপাঠ ছাড়া যে প্রকৃত শিক্ষিত হওয়া যায় না, সে বোধ তাঁর প্রখর। ফলে সাহিত্যের পাঠচক্র চালানো অবধারিত হয়ে ওঠে তাঁর জন্যে। সাহিত্যের অধ্যাপক যাঁর বাগ্মিতার ক্ষমতা ঈর্ষণীয় তাঁর পক্ষে আগ্রহী সমঝদার জুটিয়ে নেওয়া কঠিন হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মধ্যে বিপরীত দুটি শক্তি বরাবর সক্রিয় ছিল। তারুণ্যের উদ্দীপনা-উচ্ছ্বাস আর পরিণত মনের পরিমার্জন-সম্পাদনের মনোভাব তাঁকে বরাবর নতুন নতুন কাজে টেনেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁকে দিয়ে সে কাজ গুছিয়ে করিয়েও ছেড়েছে। তাঁর জীবনপরিক্রমা অনুসরণ করলে বোঝা যায় এই দ্বৈতসত্তা তাঁর ভেতরে নিরন্তর টানাপড়েন চালিয়েছে। এতে নির্ঘাত ভেতরকার সৃজনশীল মানুষটা রক্তাক্ত, যন্ত্রণাক্ত হয়েছে। কিন্তু নিশ্চয় পরিণত অভিভাবক মানুষটি তাঁরই অন্তরে তাঁরই প্রশ্রয়ে লালিত তরুণের নতুনতর অভিযানের স্বপ্নের উচ্ছ্বাস ও স্রোত কখনও ঠেকাতে পারেনি। তাতে নতুন ক্ষেত্র, নতুন কাজ তাঁকে জড়িয়েছে। এভাবে কর্মক্ষেত্রের মাঝখানে এসে পড়া ভেতরের পরিণত মানুষটা নিশ্চয় কাজটিকে সার্থক করে তোলার দায় নিয়ে কঠিন কাজেই বাঁধে তাঁকে, যখন দ্বৈতসত্তার অপরজনের তারুণ্য পুনরায় নতুন স্বপ্নের নতুন উচ্ছ্বাসের বেগ তৈরি করে তাঁকে উদ্বেল করে তোলে। সম্ভবত টানাপড়েনে দীর্ণ হতে হতে এই এক পরিক্রমাই করে চলেছেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

তাঁর দুর্মর তারুণ্য আর মজ্জাগত নেতৃত্বগুণ সায়ীদ ভাইকে থামতে দেবে না। উপনিষদের শ্লোক বলছে— চরৈবেতি, এগিয়ে চলো। কারণ জীবন এক আনন্দময় যাত্রা, কারণ এই মহৎ জীবনে দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম— আনন্দের মতো অমৃতময়। হ্যাঁ পথিক, যিনি স্বভাবতই অগ্রপথিক, তাঁকে নীলকণ্ঠ হতেই হবে, কারণ এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর তো কিছু তাঁর জানা নেই। এ হল এক চিরায়ত আধুনিকতা— পথ চলতেই আনন্দ, এগুনোতেই সার্থকতা। এঁরা হলেন সভ্যতার মশালচি— প্রাচীনতম অর্জনকে নবীন যুগেও বহন করে নিয়ে আসেন।

আলোর মতোই উৎস হয়তো একদিন নির্বাপিত হবে কিন্তু আলোর প্রসাদে যাদের জীবন অভিষিক্ত হয় তারা সে আলোর ছটা ছড়িয়ে যেতে থাকবে। তাই এমন জীবন বস্তুত অফুরন্ত, নির্বাণেও অনির্বাণ।

২০১৪

আবুল মোমেন : কবি, সাংবাদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফকির আলমগীর
একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর পরিচয়ের প্রায় সব দিক সমন্বিত হয়েছে তাঁর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সংগঠক সত্তায়। 'আলোকিত মানুষ চাই' সারাদেশে এই আন্দোলনের অগ্রযাত্রী হিসেবে তিনি রয়েছেন সংগ্রামশীল। যিনি বলেছেন, 'বই একটি জাতির মুক্তি দিতে পারে।' এই প্রত্যয়ী বক্তব্য বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের। যিনি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সুশীল করে তোলার কাজটি করে চলেছেন। তিনি অনুভব করেছেন যে, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের প্রয়োজন অসংখ্য উচ্চায়ত মানুষ। আলোকিত মানুষের জন্য যিনি অবিরাম সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। যিনি বিশ্বাস করেন বই একটি জাতির মুক্তি দিতে পারে। যেমন এই যে রাজনৈতিক টানাপড়েন, সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র চেতনাসম্পন্ন মানুষ আমাদের দায়িত্বে, এরা সবাই দেশকে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। এ থেকে বাঁচানো এদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন উচ্চতর মানুষ। সুতরাং বই ছাড়া তো আমাদের কোনো পথ নেই।

এর পাশাপাশি ২০০০ সাল থেকে তাঁর বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে উদ্যোগী ভূমিকার জন্য তিনি দেশব্যাপী প্রশংসিত হয়েছেন, অভিনন্দিত হয়েছেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধ আন্দোলন, এসিড নিক্ষেপসহ নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে, ভূমিদস্যুদের বিরুদ্ধে, নদীদখলের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ আন্দোলন, নানান আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বে প্রাণ পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল দেশের মধ্যেই নয়, দেশের বাইরে বহু দেশে তিনি তাঁর আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আলোকিত মানুষ গড়ার গল্পের শুরু থেকেই স্যারের সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। ১৯৭৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পথচলা শুরু হয় রাজধানীর ফার্মগেট সংলগ্ন ইন্দিরা রোডের একটি ছোট বাড়ি থেকে। সেই থেকে প্রতিষ্ঠানটি আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে দেশব্যাপী কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে নানা আঙ্গিক ও ব্যঞ্জনের বইপড়া আন্দোলনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। ইন্দিরা রোডের সেই ছোট বাড়িতে আয়োজিত ছোটখাটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছুটে যেতাম সদলবলে। স্যারের অনুরোধে পরিবেশন করতাম তাঁর কিছু প্রিয় গান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও স্যারের নির্দেশে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতাম। আজ মনে পড়ে সেসব দিনের সেসব কথা। মনে পড়ে সুশীল সূত্রধর, শফিউজ্জামান খান লোদী, দীপেন, সোউদসহ আরও অনেকের কথা। তারপর রাজধানীর বাংলামটর কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবনে স্যারের সঙ্গে আনন্দ আড্ডায় কিংবা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে, যুক্ত হতে থাকে জনপ্রিয় ছড়াকার আমীরুল ইসলাম, লুৎফর রহমান রিটন, প্রাবন্ধিক আহমাদ মাযহার, কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, জাদুকর জুয়েল আইচ, খায়রুল আলম সবুজ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ফরিদুর রেজা সাগর, শিরিন বকুল, মিজারুল কায়েস, রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কামাল চৌধুরীসহ আরও অনেকে। আমরা স্যারের সঙ্গে কাজ করেছি সাংস্কৃতিক কর্মীর মতো। কোনো বৈষয়িক লাভের জন্য নয়, আমাদের যত আয়োজন, আনন্দ আড্ডা, তোড়জোড় সবই ছিল প্রাণিত আনন্দে। লোভ, লালসা এবং স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে আমরা কেবল কাজ করে গিয়েছি। ভালোলাগা থেকেই আমরা তখন কাজে মেতেছি। তবে স্যারের সবচেয়ে সান্নিধ্যে আসার সুযোগ ঘটে তার টেলিভিশনে উপস্থাপকজীবনের দিনগুলোতে। এ কেবল উপস্থাপকজীবনের গল্প নয়, বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম তিন দশকের গল্প, এককালে অনেক বছর টেলিভিশনের পর্দায় অনুষ্ঠান উপস্থাপনা নিয়ে মাতাল সময় কাটিয়েছেন তিনি। সে সময়ে তাঁর উপস্থাপিত *সপ্তবর্ণা* ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। আর তাঁর সেই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান গায়ক হিসেবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ ঘটে আমার। অনুষ্ঠানের পদ্ধতি অনুযায়ী একদিকে আমি, ফিরোজ সাঁই, এবং মালা খান, অন্যদিকে ফেরদৌস ওয়াহিদ, পিলু মমতাজ এবং ফাহিম হোসেন চৌধুরী অংশগ্রহণ করি।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠানটি যেমন ছিল মজার তেমনি জমজমাট। উদ্দেশ্য ছিল সুপরিকল্পনা আর পরিশীলনের মাধ্যমে যতটা নিখুঁত আর আকর্ষণীয় করে অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করা যায়। একদিকে অনুষ্ঠানটি গায়কদের প্রাণবন্ত পরিবেশনায় জমজমাট করে তোলা, অন্যদিকে পপসংগীতের নতুন ও অপরিচিত স্বাদের শ্রেষ্ঠ গানগুলো দর্শকদের শোনানো। এ জন্যে প্রথমেই গোটা অনুষ্ঠানটির একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি করা হত। অর্থাৎ অনুষ্ঠানে প্রথম দল কোন গান দিয়ে শুরু করে কোথায় গিয়ে ছেড়ে দেবে, তারা শেষ করলে দ্বিতীয় দল কী গাইবে, কোথায় শেষ করবে— এভাবে এগিয়ে গিয়ে সারা অনুষ্ঠানে কোন দলের কোন গানের পর অন্য দলের কোন গান হবে, তার নীলনকশা তৈরি করা হত। এছাড়া কোন গানের পর কোন গান দিলে অনুষ্ঠান ক্রমাগতভাবে জমজমাটের তুঙ্গে উঠবে সেদিকে লক্ষ রাখা হত। আমরা স্যারের নির্দেশে এ ব্যাপারে খুব সজাগ ছিলাম। পুরো অনুষ্ঠানটাই ছিল চতুর অভিনয়ের মাধ্যমে সংগীত পরিবেশন করা, অর্থাৎ একটা পাতানো খেলা। তারপরও গানের ধাঁধাটি দর্শকদের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। একে সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচের অনুষ্ঠান, তার ওপর সম্পূর্ণ নতুন সব জম্পেশ গান। যতদূর মনে পড়ে, কোনো কোনো অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট আমি তৈরি করেছি। বিশেষ করে গণসংগীতসহ বিভিন্ন ধরনের গান গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করতে সমর্থ হই, পপ বাদ্যযন্ত্রে গণসংগীত প্রাণ পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলতেই হয়, এদেশের পপগান এবং পপগানের শিল্পীরা উপস্থাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কাছে চিরঋণী। *সপ্তবর্ণা* আর পপগান দুয়েই দুয়ের কাছ থেকে লাভবান হয়েছিল, বিশেষ করে *সপ্তবর্ণা*-র মাধ্যমে পপগানের জনপ্রিয়তার মুকুটে সবচেয়ে রঙিন পালকটি বসিয়ে দিয়েছিল কালজয়ী উপস্থাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। যে মুহূর্তে পপগান এবং গায়কদের নতুন ঢং-ব্যাকরণের গান সংগীতের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তাদের কাছে বিশেষ করে রেডিও-টেলিভিশনের কর্তৃপক্ষের কাছে এক ধরনের উৎকট ও অসাংগীতিক চিৎকার বলেই মনে হচ্ছিল সেই মুহূর্তে উপস্থাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ টেলিভিশনে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে, প্রাণোচ্ছলভাবে আমাদের সংগীত পরিবেশনের সুযোগ করে দেন। প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিক, আত্মমগ্ন, নিষ্প্রাণভাবে সংগীত পরিবেশনের বিরুদ্ধে এটি ছিল একটি সাহসী পদক্ষেপ, পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের মাতাল আওয়াজের সঙ্গে জনপ্রিয় গানগুলো যেন দর্শকের মাঝে আরও দুর্বার হয়ে ওঠে। *সপ্তবর্ণা*-র জনপ্রিয়তা নিয়ে সায়ীদ স্যার তাঁর *আমার উপস্থাপক জীবন* গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, "এই অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানটা নিয়ে আমি প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমার দিনরাত্রির সমস্ত ভাবনাচিন্তা স্বপ্নে আনন্দে এ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের আর সমস্ত কাজ প্রয়োজন চিন্তা ভাবনা স্বপ্ন আমার কাছে মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল।" বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে ১৯৭৬ সালে প্রচারিত *সপ্তবর্ণা* অনুষ্ঠানটি এক বৎসর যাবৎ সফলতার সঙ্গে প্রচারিত হয়। তারপরও স্যার এ অনুষ্ঠান নিয়ে ছিলেন পুরোপুরি উদ্দাম আর বেপরোয়া। সেই ধারাবাহিকতায় *সপ্তবর্ণা*-র শেষ অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল বিশাল পরিসরে। ধাঁধা, কৌতুক, নাটিকা, গান, চুটকি, আবৃত্তি, নৃত্য আর পপসংগীতের সমন্বয়ে প্রায় সোয়া তিন ঘণ্টার জমজমাট অনুষ্ঠান। আমাদের বন্ধু প্রয়াত আজম খান *সপ্তবর্ণা*-র গানের ধাঁধায় অংশগ্রহণ না করলেও শেষ অনুষ্ঠানটিতে গেয়েছিলেন তাঁর নতুন গান। *আলাল ও দুলাল, তাদের বাবা হাজি চান*, অসম্ভব হিট করেছিল গানটি। অনুষ্ঠানটিও সাফল্যের তুঙ্গে উঠেছিল। স্যারের উপস্থাপনায় *সপ্তবর্ণা, আনন্দমেলা, চতুরঙ্গ, হারজিৎ, চারুপাঠ*সহ বিভিন্ন জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে শফিউজ্জমান খান লোদী, মঞ্জুর এলাহী, আরশাদ মাহমুদ সেলিম, পরবর্তী পর্যায়ে ডা. আরিফ, সুশীল কুমার সূত্রধর, আমীরুল ইসলাম, লুৎফর রহমান রিটন প্রমুখ। সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে স্যার বলেছেন, যখন বড় হয়েছি তখন তারুণ্যের আত্মদানের ওপর ভর করে এগোতে হয়েছে। জীবনে যখনই কোনো বড় বা আদর্শিক কাজ করতে গেছি তখনই দরকার পড়েছে তরুণ-সম্প্রদায়ের। এখনও আলোকিত মানুষ গড়ার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড ৩৫টি বছর এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সেই তারুণ্যশক্তির ওপর ভর করেই।

যাহোক, আমার সৌভাগ্য সায়ীদ স্যারের সঙ্গে সেই *সপ্তবর্ণা* থেকে *আনন্দমেলা, চতুরঙ্গ, চারুপাঠ* ইত্যাদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটেছে। এছাড়া ইন্দিরা রোডে অবস্থিত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে কিংবা বাংলামটরস্থ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গেয়েছি। গান গেয়েছি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ঢাকার যেখানেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার আমার সরাসরি শিক্ষক না হলেও আমার জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক শাহানা তালুকদারের মাধ্যমেই সায়ীদ স্যারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম স্ত্রী নার্গিস আক্তার খানমের কন্যা শাহানা ম্যাডাম একসময় ঢাকা কলেজের শিক্ষক ছিলেন এবং সায়ীদ স্যারের বন্ধু ছিলেন। শাহানা ম্যাডাম সায়ীদ স্যারের সৃজনশীলতা এবং মেধা-মননের গুণমুগ্ধ ছিলেন। জগন্নাথ কলেজে আমি তখন বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় ছিলাম। অধ্যাপক শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হারুন স্যার, রাহাত খান, শামসুজ্জামান খান প্রমুখ শিক্ষকের স্নেহধন্য ছিলাম। সেই সময়েই শাহানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাডাম আমাকে তাঁর কলতাবাজারের বাসায় নিয়ে গিয়ে তাঁর মা নার্গিস আক্তার খানমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এবং এর কয়েকদিন পরই ম্যাডাম আমাকে সায়ীদ স্যারের কাছে নিয়ে যান। ফেরদৌস ওয়াহিদ তার সরাসরি ছাত্র, আমিও শাহানা ম্যাডামের মাধ্যমে তাঁর ছাত্রের মর্যাদা লাভ করি।

স্যার তখন থাকতেন কলাবাগান স্টাফ কোয়ার্টারে। শাহানা ম্যাডামের মাধ্যমে সায়ীদ স্যারের অনেক ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পাই। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদুল্লাহ হলের ছাত্র, সময় পেলেই আমি স্যারের বাসায় ছুটে যেতাম। মনে পড়ে স্যার আমাকে তখন অনেক জায়গায় নিয়ে যেতেন, বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জে তাঁর চাচার বাসায়। সাবেক সচিব সিরাজউদ্দিন সাহেবের ধানমণ্ডিস্থ লেকের পাড়ের বাসায়। সিরাজউদ্দিন সাহেবের বাসায় তখন দেশের প্রথিতযশা শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও আমলাদের জমজমাট আসর বসত। কবি শামসুর রাহমান, ওবায়দুল্লাহ খান থেকে শুরু করে শিল্পী জাহাঙ্গীর, কাইয়ুম চৌধুরী, তখনকার অনেক সচিব এই আড্ডায় যোগ দিতেন। এখানে গান গেয়ে অনেক গুণীজনদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে। স্যারের তৎকালীন বন্ধু আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আবদুল মান্নান সৈয়দ, শাহানা ম্যাডামসহ অনেকে তখন তাঁর মধ্যে এক ব্যতিক্রম সৃজনশীলতার পরিচয় খুঁজে পান, তাঁকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেন জীবনকে বিশদভাবে তুলে ধরতে। এক্ষেত্রে শাহানা ম্যাডাম আমাকে স্যারের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার পরামর্শ দেন। পরবর্তী পর্যায়ে যখন শাহানা ম্যাডাম চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমেরিকাপ্রবাসী স্বামী নাসির তালুকদারের কর্মস্থলে চলে যান, তখনও শেষবারের মতো আমাকে স্যারের সঙ্গে দেখা করে আমার প্রতি খেয়াল রাখার জন্যে অনুরোধ করেন। এ জন্যে শাহানা ম্যাডামের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তবে সান্ত্বনা এই যে শাহানা আপা আমেরিকা যাওয়ার পূর্বে সেই সময়ে পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে শেষবারের মতো দেখতে সমর্থ হয়েছিলাম।

যাক সে প্রসঙ্গ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর বন্ধুদের পরামর্শে তাঁর জীবনকে বিভিন্নভাবে বিশদভাবে তুলে ধরছেন, লেখার মাধ্যমে, উপস্থাপনা এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ কিংবদন্তিতুল্য একজন সফল মানুষ। একদিকে দীর্ঘসময় অধ্যাপনা করেছেন, সাহিত্যচর্চা করেছেন, উপস্থাপনা করেছেন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন করেছেন, প্রচুর লেখালেখি করেছেন। তবে আমার কাছে একজন রুচিমান মানুষ হিসেবেই তাঁকে বেশি উজ্জ্বল মনে হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ টেলিভিশনের সূচনালগ্ন থেকে কিংবা আমাদের সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক অঙ্গনে প্রথম থেকেই তিনি মনস্বী, রুচিমান ও বিনোদন সক্ষম ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর বিভিন্ন ধরনের লেখা সমৃদ্ধ করেছে আমাদের সাহিত্য অঙ্গন। তাঁর মতো একজন বহুমাত্রিক প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের সান্নিধ্য পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি, অনুপ্রাণিত হয়েছি। একবার তাঁর আমন্ত্রণে ঢাকা কলেজে গান গেয়েছিলাম। আমাদের গানে আর স্যারের সাবলীল উপস্থাপনায় অনুষ্ঠান মেতে উঠেছিল। রসিকতা করে স্যার সেই অনুষ্ঠানে আমার বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার কথা একই সাথে রান্নার প্রশংসা করেছিলেন। তিনি সবসময়ই ভালো কাজের প্রশংসা করতেন। মেধা এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করতেন। যার প্রমাণ মেলে তাঁর *আমার উপস্থাপক জীবন* গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায়। তিনি *সপ্তবর্ণা* অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন, 'ফকির আলমগীর ছিল নজরুলি উদ্দামতায় এবং প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। নজরুলের মতোই বলিষ্ঠ চেহারায় বাবরি চুলে ঝাঁকি দিয়ে যখন দুর্বার গণসংগীত গাইত তখন ওকে কালবৈশাখী ঝড়ের মতোই লাগতো। দুর্ধর্ষ শারীরিক শক্তির সঙ্গে প্রচণ্ড প্রাণশক্তি ওকে গণসংগীতের আদর্শ গায়কে পরিণত করেছিল।'

গণসংগীতের আদর্শ গায়কে পরিণত হতে পেরেছি কিনা জানি না, তবে সেদিনের তাঁর ঝাঁকুনি, তাঁর ধাক্কা আজ আমাকে অনেক প্রত্যয়ী করেছে। তিনি সেদিন তাঁর *সপ্তবর্ণা, চতুরঙ্গ, আনন্দমেলা, চারুপাঠ* অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের ধারার গানগুলোকে সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পাশাপাশি আমাদের পরিণত করেছিলেন পপতারকায়। তরুণ প্রজন্মের ভেতরেও এই গানের হাওয়া লাগে। চারিদিকে কনসার্ট আর আনন্দ; আয়োজনে মুখর হয়ে ওঠে তরুণরা আমাদের অনুসরণ, অনুবরণ করতে শুরু করে।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের উপস্থাপনা জীবন প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলতে গেলে নিবন্ধটি কেবল দীর্ঘ হবে। তবে এ প্রসঙ্গে একটি মজার বিষয় উল্লেখ না করলে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আহমদ ছফার লেখা *ঘর করলাম নারে আমি সংসার করলাম না...* গানটি আমি গেয়েছিলাম গানের বর্ণাঢ্য সমারোহে ভরপুর বিনোদনমূলক ম্যাগাজিক অনুষ্ঠান *চতুরঙ্গে*। এর পূর্বে ১৯৭৮ সালের ২৫ জানুয়ারি আমি সিলেটের মৌলভীবাজারের বনলক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই। তার পরদিনই *চতুরঙ্গ* অনুষ্ঠানে আমি গানটি পরিবেশন করি। এ প্রসঙ্গে স্যারের রসিকতাপূর্ণ মন্তব্য আমি এখানে তুলে ধরছি— 'ফকির আলমগীরের *ঘর করলাম নারে...* গানটার কথা একটা কারণে মনে আছে। বিয়ের ঠিক পরের দিনই *চতুরঙ্গে*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গানটি গাইতে এসেছিল ফকির। গানটি শেষ হলে দর্শকদের কাছে তথ্যটি পরিবেশন করে বলেছিলাম, দেখুন কী হঠকারী চরিত্রের মানুষ এই শিল্পীরা। বিয়ের একটা দিনও পার হয়নি, এখানে এসে লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে বেদনার বেহালা বাজাতে শুরু করেছে : *ঘর করলাম নারে আমি সংসার করলাম না...*।' এমনি হাস্যরসাত্মক, প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় তিনি আমাদের তুলে ধরেছেন টেলিভিশনে, কখনও মঞ্চে।

১৯৯২ সালের কথা— মুহম্মদপুরের 'নবোদয়' শীর্ষক একটি সংগঠন আমাদের পাঁচ পপতারকা আজম খান, ফেরদৌস ওয়াহিদ, পিলু মমতাজ, ফিরোজ সাঁই ও আমার দুই দিনব্যাপী একটি কনসার্টের আয়োজন করেছিল, ঢাকার কারিগরি মিলনায়তনে। অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল ১৭ বছর পর। উপস্থাপনায় ছিলেন সবার প্রিয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তাঁর নান্দনিক উপস্থাপনায় জমে উঠেছিল দুই দিনব্যাপী এই সফল কনসার্ট। বর্তমান সময়ের সাড়াজাগানো ব্যান্ডতারকারা সেদিন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ভিড় করেছিল, সাউন্ড সিস্টেম, যন্ত্রানুষঙ্গে সেদিন তারা সহযোগিতা করেছিল। আমরা পাঁচ বন্ধু আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় সেদিন জীবনের সেরা পারফরমেন্স করেছিলাম। এটাই ছিল একত্রে আমাদের শেষ পরিবেশনা। তারপর ১৯৯৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের ছেড়ে প্রথম চলে যান ফিরোজ সাঁই। তারপর ২০১১ সালের ২৩ মে হারালাম পিলু মমতাজকে, অবশেষে পপগুরু আজম খানকে হারালাম ২০১১ সালের ৫ জুন। উপস্থাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সঙ্গে টেলিভিশন ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, সামাজিক আন্দোলনে একই মঞ্চে উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটেছে, একবার ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে 'আমরা ধূমপান নিবারণ করি (আধূনিক)' সংগঠনের উদ্যোগে ধূমপানবিরোধী এক সমাবেশে আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটে। সংগঠনের প্রধান জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, জাদুকর জুয়েল আইচ ছাড়াও আমি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেই। সায়ীদ স্যার সেই অনুষ্ঠানে রসিকতা করে বলেছিলেন, জুয়েল আইচ জীবনে মজাও পাননি, সাজাও পাননি। কারণ তিনি কোনোদিনই ধূমপান করেননি। আর স্যার সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে কেমন করে সিগারেট ধরলেন আর ধূমপান ছাড়লেন বিষয়টি তুলে ধরলেন।

এছাড়া গেল বছরের শেষের দিকে স্যার আমাদের এলাকার পল্লীমা সংসদে এসেছিলেন পাঠাগার উদ্বোধনে। মঞ্চে স্যার ছাড়াও অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, হাফিজুর রহমান ময়না, অসীম সাহা উপস্থিত ছিলেন। স্যারের আগমনে পল্লীমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসদের মাঠ ছিল দর্শকে পরিপূর্ণ। সায়ীদ স্যার তাঁর ভালো বক্তব্যে দর্শক শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলেন। তিনি আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়, টেলিভিশনের উপস্থাপনা জীবনের অনেক ঘটনা সে দিন তুলে ধরেন।

এর মধ্যে স্যারের সঙ্গে শেষবার দেখা হয় এবছর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ৩৫ বছরপূর্তি উৎসবের অনুষ্ঠানে। স্যার কেন্দ্রের ৩৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে গেল ১৪ মার্চ ২০১৪ শুক্রবার বাংলামটরস্থ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রাঙ্গণে সারাদিনব্যাপী একটি প্রীতি সমাবেশের আয়োজন করেন। মন্ত্রী, সচিব থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের গুণীজনের পদভারে মুখরিত হয় কেন্দ্র। যাঁরা এই কেন্দ্রের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে জড়িত ছিলেন। কেন্দ্রকে ভালোবাসেন এবং কেন্দ্রকে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন, স্যার নিজে তাঁদের ফোন করে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, স্যারের আন্তরিকতাপূর্ণ আমন্ত্রণে আমিও সেদিন যথাসময়ে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু স্যারের ব্যস্ততা, একটু এলোমেলো আয়োজন, অভ্যর্থনার ঘাটতি আমাকে অনেকটা হতাশ করে। কেন্দ্রের একজন অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলাম। তবে সান্ত্বনা এই যে, স্যারের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা আমার এবং আমার অভিমান-ক্ষোভ সম্পর্কে স্যারের ধারণা ছিল। তাই তো তিনি আমাকে কয়েকদিন ফোন করেছিলেন। অভিমানে ফোনটা ধরা হয়নি। আজ লেখার শেষ লাইনটিতে বলব, স্যার আমাকে ক্ষমা করবেন। একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে আমাদের পথ দেখাবেন।

২০১৪

ফকির আলমগীর : গণসংগীত শিল্পী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ নূরুল হুদা

স্বপ্নের সমান বড়

বাংলাদেশে আলোকিত মানুষের প্রেরণাপুরুষ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। এক চিরতরুণ স্বপ্নমানব। আমাদের সকলের প্রিয় সায়ীদভাই। নিজে এখনো স্বপ্নের সমান বড় হয়ে ওঠেননি। কেউ অটোগ্রাফের খাতা খুলে ধরলে তিনি প্রায়শ লিখে দেন এই স্বপ্নোক্তি। তিনি মানুষকে শতভাগ বিশ্বাস করাতে চান এই বাণীর মর্মার্থ। মনে হতে পারে, এ যেন এক অসম্ভবের সাধনা। অথচ কেবল উক্তি ও উপলব্ধি নয়, তত্ত্বকে সত্যে পরিণত করার জন্য গত তিন দশক ধরে তিনি নিয়োজিত এক স্বেচ্ছাশৃঙ্খলাপরায়ণ কর্মযজ্ঞে। না, এখনো অনেকদূর তাঁর গন্তব্য, তাঁর অচিনপুর। যেদিন তিনি পা রাখবেন মনজিলে, সেদিন অসংখ্য উচ্চায়ত মানুষের পদপাতে উচ্চকিত হবে আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা। সেদিন তিনিও তাঁর স্বপ্নের সমান বড় হয়ে উঠবেন। তিনি মনে করেন, শ্রেষ্ঠ মানুষ ছাড়া শ্রেষ্ঠ জাতি হয় না। নীতিবিবর্জিত নিকৃষ্ট মানুষ দিয়ে কল্যাণকর জাতি-রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। একুশের বইমেলা ২০০৭-এ প্রকাশিত তাঁর *বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও আমি* শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি আরো লিখেছেন, আমাদের যুগে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জেগে উঠেছে। বহু বেদনাবিদ্ধ মানুষ নানাপথে এই জাতির সমৃদ্ধি কামনা করছেন। আমরা এর মুক্তির কথা ভেবেছি আলোকিত মানুষের জন্মের ভেতর দিয়ে। আমাদের কাজের সাফল্য ব্যর্থতাকে আমরা গুরুত্ব দিই না। আমি শুধু এর স্বপ্নের অভ্রান্ততায় নিশ্চিত হতে চাই।

'স্বপ্নটা যে অভ্রান্ত, এ-কথা বিশ্বাস করতে চাই আমরা সবাই।' দেশের বিদ্যমান সঙ্কটের মুহূর্তে এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই। নীতিবান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতিবান, সৎ উদ্যমশীল ও স্বপ্নপাগল মানুষ যতদিন এই জাতি-রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ না করবে, ততদিন এই দেশজাতি সমাধানহীন সঙ্কটের আবর্তেই ঘুরপাক খেতে থাকবে। পেশায় ও নেশায় সুশিক্ষক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ জাতিকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন ১৯৭৮ সাল থেকেই। তিনি আমাদের সমকালীন সমাজে আলোকায়নের অন্যতম প্রাণপুরুষ। কথাগুলো নানাভাবে উচ্চারিত হল তাঁর জন্মদিবসের স্বতঃস্ফূর্ত অনুষ্ঠানে। বললেন তাঁরই ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী ও সহদীক্ষিতরা। গত প্রায় তিরিশ বছরের পথপরিক্রমায় তিনি তৈরি করেছেন অজস্র অনুপ্রাণিত সহযাত্রী, যারা তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের সক্রিয় অংশীদার। তারা প্রত্যেকে নিজেকে ভালোবাসে, আর ভালোবাসে পাশের মানুষটিকেও। 'কে আলোকিত মানুষ?' আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের উত্তর : 'নিজের বেদনায় যে জাগে সে ভালো মানুষ; যে পরিপার্শ্বের বেদনায় জাগে, সে আলোকিত মানুষ।' এই উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর দর্শনের সারবত্তা। নিছক ভালো মানুষ অনেকেই, কিন্তু আলোকিত মানুষকে ভাবতে হয় তার সময়ের ও চারপাশের সকলের কথা। পরিশুদ্ধ সেই ব্যক্তিকে সংগঠিত করে সামষ্টিক সমাজ-সত্তায় বিকশিত করতে পারাটাই শ্রেয়ঃবোধে উজ্জীবিত ব্যক্তি-সংগঠকের কাজ। ফলে যিনি স্বপ্ন দেখেন, সংগঠকে পরিণত হতে হয় তাঁকেও, যেমন হয়েছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নিজে। বিশ শতকের ষাটের দশকে শুরু করেছিলেন নান্দনিক সাহিত্যান্দোলন, সম্পাদনা করেছেন *কণ্ঠস্বর*-এর মতো সুখ্যাত লিটল ম্যাগাজিন ও অনিয়মিত সাহিত্যপত্রিকা। নিজে যেমন লিখেছেন, তেমনি লিখিয়েছেন অন্যদের দিয়েও। লেখক-সম্পাদক-শিক্ষক—তারপর বিকশিত হল তাঁর সংগঠক সত্তা। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে রাজনীতি-সমাজনীতি যখন চরম বিপর্যস্ত, তখনই ব্যক্তির আত্মিক মুক্তির লক্ষ্যে সংগঠিত করলেন 'বইপড়া' আন্দোলন, যা সময়ের বিবর্তনে 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আশ্চর্য এই যে, কোনো বিদেশি সাহায্য ছাড়া কেবল দেশজ অর্থায়নে তিনি সংগঠিত করেছেন আত্মশক্তিতে আস্থাবান অসংখ্য তরুণ-প্রবীণ স্বেচ্ছাকর্মীকে। টেলিভিশনের বিনোদন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেও স্বেচ্ছায় সেই লোকরঞ্জক ভূমিকা ত্যাগ করে হয়ে উঠেছেন মানুষ গড়ার কারিগর। তার এই আলোকায়ন কর্মসূচি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত জেলা-সীমা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপ-আমেরিকার বাঙালি-অধ্যুষিত অঞ্চলেও। ব্যক্তি-মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনার অবকাশের জন্য আবশ্যক যথার্থ পরিবেশ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া আন্দোলন সেই পরিবেশ সৃষ্টিরই সমন্বিত কর্মসূচি। কালক্রমে আক্ষরিক অর্থেও দেশের বৃহত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন তিনি। ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গু প্রতিরোধ আন্দোলন, পরিবেশ দূষণ-বিরোধী আন্দোলনসহ নানা সামাজিক আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমাদের সময়ের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী তিনি, উপরন্তু এক বহুমাত্রিক সৃষ্টিসত্তা। কবিতা, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, অনুবাদ, জার্নাল, জীবনাংশ, প্রাবচনিক বাণী ইত্যাকার নানা আঙ্গিকের রচনায় তিনি সোনা ফলিয়েছেন দেদার। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক ও বাগ্মিতা-কুশলী গদ্যশৈলী আপন মুদ্রাশ্রয়ী। একুশে পদক ও র‍্যামন ম্যাগসাইসাই-এর মতো দেশবিদেশের শীর্ষস্বীকৃতিতে তিনি ভূষিত। অথচ এগুলো কিছুই তাঁর ঈপ্সিত নয়। থামার আগে তাঁকে যেতে হবে অনেকদূর। তাঁকে রেখে যেতে হবে সঠিক পথ, পদ্ধতি ও উত্তরসূরি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আকাশছোঁয়া ভবনে যে সুবৃহৎ কালচারাল কমপ্লেক্সের স্বপ্ন তিনি দেখেন, তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। সুসংস্কৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে আলোকিত মানুষের প্রতিনিধিরা এখনো জাতি-রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক নয়। আগেই বলেছি, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বিশ্বাস করেন একটি জাতির আত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ইতিবাচক প্রতিষ্ঠা ছাড়া তার রাজনীতি সুস্থ হতে পারে না। তাই রাজনীতিবিদসহ সব পেশার মানুষকেই আলোচিত ও উচ্চায়ত হতে হবে। তাঁর ভাষায়, 'বিরাট, সমৃদ্ধ ও আলোচিত জাতি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন সম্পন্ন ও আলোকিত মানুষ, আর এই মানুষ গড়ে তোলার জন্য দরকার একটি দেশভিত্তিক আন্দোলন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র এই আন্দোলনেরই উৎসস্থল।' এই আন্দোলনের উৎসপুরুষের জন্মদিনে আমাদের মিলিত কামনা, তাঁর জীবন ও কর্মসাধনা জয়যুক্ত হোক। চিরায়ু হোক তাঁর স্বপ্নাদর্শ।

২০০৭

মুহম্মদ নূরুল হুদা : কবি, লেখক

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

অসীম সাহা

কীর্তির চেয়ে মহান

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, মানে আমাদের সায়ীদ ভাইয়ের সঙ্গে কবে পরিচয় হয়েছিল, আজ তা আর নির্দিষ্টভাবে মনে করতে পারি না। তবে যতদূর মনে আছে, সেটা ১৯৭২ সাল। একটি ছোট কাগজে আমার দুটো কবিতা ছাপা হবার পর তিনি আমার কোনো এক বন্ধুর কাছে তার প্রশংসা করেছিলেন। সম্ভবত তখন তিনি গ্রিন রোডের সরকারি কোয়ার্টারে থাকতেন। শিক্ষক হিসেবে চাকরি করতেন ঢাকা কলেজে। তখন তাঁর মাসিক পত্রিকা *কণ্ঠস্বর*ও সম্পাদনা করছেন। আগে থেকেই পত্রিকাটির সঙ্গে পরিচয় ছিল। কিন্তু সম্পাদকের চেহারা কিংবা তাঁর সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোনও ধারণা ছিল না।

আমি সবে মফস্বল শহর থেকে ঢাকায় এসেছি। নতুন শহরে নতুন জীবনের আস্বাদে ভরপুর হয়ে উঠছে জীবন। লিখছি সেই ১৯৬৪ সাল থেকে। কিন্তু অতিরিক্ত লাজুক স্বভাবের জন্য কারও সঙ্গেই আমার তেমন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তবে ঢাকায় আসার পর প্রথম পরিচয় হয়েছিল কথাসাহিত্যিক আহমদ ছফার সঙ্গে। অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে আমি তাঁর 'ঘেটু'তে পরিণত হয়েছিলাম। দিনরাত্রির অনেকটা সময় তাঁর সঙ্গেই থাকতাম, তাঁর পেছনেই ঘুরঘুর করতাম। এর ফল আমার জন্য ভালোই হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র ধরে আমি নিয়মিতই বাংলাবাজারের 'বিউটি বোর্ডিং'-এ যাবার সুযোগ পাই। বহু আগে থেকেই সেটা ছিল কবি-লেখকদের মিলন-মোহনা।

প্রায় সারাদিনই সেখানে কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিজীবী এবং বুদ্ধিজীবীসহ অনেকেরই সমাগম হত। বিশেষত সন্ধ্যায় বিউটি বের্ডিংয়ের ছোট রেস্তোরাঁটি এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরপুর থাকত যে, অনেককেই সংলগ্ন উঠোনে ঘাসের উপরে চেয়ার নিয়ে অথবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে হত। এখানেই আমার সঙ্গে আল মাহমুদ, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, হুমায়ুন কবির, কায়েস আহমেদ, বুলবুল চৌধুরীসহ আরও অনেকেরই পরিচয় হয়। কিন্তু সায়ীদ ভাইকে আমি সেখানে কখনও দেখিনি। শামসুর রাহমান এবং সৈয়দ শামসুল হককেও না। শামসুর রাহমান কোথায় আড্ডা দিতেন, তা-ও আমার জানা ছিল না। সৈয়দ শামসুল হক আড্ডা দিতেন সদরঘাট সংলগ্ন 'শংকর বোর্ডিং'-এ।

আমার সঙ্গে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মুখোমুখি প্রথম দেখা হয় তাঁর গ্রিন রোডের সরকারি বাড়িতেই। তখন আমি সম্পূর্ণরূপে বেকার। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের মুখপত্র *দৈনিক গণকণ্ঠ* পত্রিকায় চাকরি করতাম। ১৯৭৫ সালের দিকে পত্রিকাটিতে বঙ্গবন্ধু এবং তৎকালীন সরকার সম্পর্কে এমন সব লেখা ছাপা হতে থাকে যে, একসময় সরকার পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ফলে আমরা অনেকেই বেকার হয়ে পড়ি। বেঁচে থাকার জন্য এদিক-ওদিক ঘুরি। কোনও কাজ পাই না। ফলে এক অসহনীয় জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্রমাগত অন্ধকারের দিকে ধাবিত হতে থাকি। এই সময় সায়ীদ ভাই অনেকটা দেবদূতের মতো আমার সম্মুখে এসে ধরা দেন। তখন লেখালেখির জগতে আমার বেশ খানিকটা নামডাক হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই সায়ীদ ভাইয়ের বাড়িতে যাওয়া। তখন আমাকে তাঁর বাসায় কে নিয়ে গিয়েছিল, তা-ও মনে নেই। কিন্তু গিয়েছিলাম ঠিক ভরদুপুরে। সায়ীদ ভাইয়ের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয় হয়েছে, তা মনেই হয়নি। এরকম হাসিখুশি ও কৌতুকপ্রিয় মানুষ এর আগে আমি কখনও দেখিনি। যতটা সময় ছিলাম, নানা ধরনের বিষয় নিয়ে আলাপ করে এবং হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে আমাকে মজিয়ে রেখেছিলেন। এটা যে সায়ীদ ভাইয়ের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বেরই ভিন্নতর অবয়ব, তা বুঝতে আমার বেশি দেরি হয়নি। তবে যে বিষয়েই আলাপ করুন না কেন, তিনি কখনও সেখানে স্থূলতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। নিজে যেমন প্রাণখোলা হাসি হাসতেন, তেমনি অন্যকেও হাসাতেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহিত্যের এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলতেন, যা ছিল আমার জন্য দুরধিগম্য। তাই আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে সায়ীদ ভাইয়ের কথাগুলো নীরবে শোনার চেষ্টা করতাম।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে ভাবী এসে চা এবং সঙ্গে টা-ও দিয়ে যেতেন। ভাবী, এক মাতৃমূর্তির প্রতীক। সব সময় মুখে হাসি লেগেই আছে। আমি কোনোদিন তাঁকে গোমড়ামুখো হতে দেখিনি। এই যে এত এত লোক আসছে-যাচ্ছে আর তাঁকে প্রতিনিয়ত হেঁসেলে ঢুকতে হচ্ছে, তাতেও মুখে বিরক্তির সামান্যতম ছোঁয়াও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ছে না। যেন সর্বংসহা ধরিত্রী। সায়ীদ ভাইয়ের একমাত্র মেয়ে লুনা তখন অনেক ছোট। থেকে থেকে সে-ও বাইরের ঘরে আসছে-যাচ্ছে। সায়ীদ ভাই এবং ভাবী পিতৃ ও মাতৃস্নেহে তাকে আদর করে ডাকছেন। একটি সুখী সংসারের সবটাই যেন তাঁদের ঘরে এসে বাসা বেঁধেছে।

তো, প্রথম দিনেই আমি দুজনের এই মধুর সম্পর্ক এবং একমাত্র সন্তান লুনার জন্য তাঁদের বাৎসল্য ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। আরও অভিভূত হলাম, ভর দুপুরবেলায় যখন বিদায় নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন মধ্যাহ্নভোজ করার জন্য দুজনেরই আন্তরিক আহ্বান আমাকে বিমোহিত করল। আমি দ্বিধান্বিতভাবে বারণ করতে গেলে তাঁরা আমাকে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে খাবারের টেবিলে আমন্ত্রণ জানালেন যে, তা গ্রহণ না করার মতো মানসিকতা আমার মন থেকে মুহূর্তেই উবে গেল। আমি টেবিলে গিয়ে বসলাম। ভাবী মায়ের মতো, বোনের মতো আদর করে আমাকে খাওয়াতে লাগলেন। আমি যেহেতু তখন বেকার, তাই এই মমতামাখানো আপ্যায়নে আমার চোখে জল নেমে এল। পরিচয়ের প্রথম দিনেই যে কেউ এত আন্তরিকতার সঙ্গে কাউকে গ্রহণ করতে পারেন, এটা ভেবেই চোখ আরও ভিজে গেল। খাওয়া শেষ হলে আমি সায়ীদ ভাইয়ের বাসা থেকে বেরিয়ে এসে খোলা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

শুধু বারবার একটা কথাই মনে হতে লাগল, জীবনের কুয়াশাঘেরা আকাশ ফুঁড়ে কখনও কখনও এমন কোনও চাঁদ এসে দিগন্তের দেয়ালে দোল খেতে থাকে, যখন জীবনটাকে মনে হয় অনেক সুন্দর। বেকার-জীবনের কষ্ট, গ্লানি মুহূর্তেই ধুয়েমুছে যায়।

এরপর থেকে সায়ীদ ভাইয়ের বাসায় আমার যাতায়াত অনেকটাই নিয়মিত হয়ে যায়। তিনি আমার বেকার-জীবনের কথা জানেন এবং আমাকে নানাভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। যে দুঃসহ দিনগুলো আমার জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল, তা থেকে উদ্ধার করার জন্য যে হাতটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসম প্রসারিত হয়ে এল, সেটি সায়ীদ ভাইয়ের। এর আগে একটি চাকরির আশায় কত মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যে ঘুরেছি, তার হিসাব দেয়া অসম্ভব। কিন্তু আহমদ ছফার পর সায়ীদ ভাই ছাড়া আর কেউ তেমনভাবে আমাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেননি। একবার কবি শামসুর রাহমান চেষ্টা করেছিলেন। এরপর আহমদ ছফা অনেকটা এবং এরপর শুধুই সায়ীদ ভাই।

সে-সময় সায়ীদ ভাই বাংলাদেশ টেলিভিশনে *সপ্তবর্ণা* নামে একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করতেন। সেটি ছিল বিটিভির সবচেয়ে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি করতে তাঁকে অনেক সহযোগীর সাহায্য নিতে হত। তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠান থেকে প্রতি সপ্তাহে ৭৫ টাকা করে সম্মানী পেত। সায়ীদ ভাই সহযোগী হিসেবে আমার নামটি অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। তাই প্রতি সপ্তাহেই আমার নামে একটি চেক আসত। অনেক সময় আমি হয়তো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণও করতাম না। কিন্তু আমাকে বাঁচাবার জন্যে তিনি নিয়মিতভাবেই অনেকদিন পর্যন্ত এই টাকাটা আমাকে দিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তখন আমি উত্তর শাহজাহানপুরের একটি ভাড়াবাড়িতে স্ত্রী ও সন্তানসহ বাস করি। কিন্তু নিয়মিতভাবে সে ভাড়া পরিশোধ করতে না পারায় সেখানকার পাট চুকিয়ে আমাকে খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া আরও একটি কম ভাড়ার বাড়িতে চলে যেতে হয়। কিন্তু যে কদিন ওখানে ছিলাম, সেদিনগুলো ছিল আমার জীবনের সবচাইতে সংকটময় দিন।

শাহজাহানপুরের যে বাড়িটাতে আমরা ভাড়া থাকতাম, তার পাশেই থাকত সায়ীদ ভাইয়ের এক বোন ও তার বর। আর একটু দূরে রেললাইনের অনেকটাই কাছে সায়ীদ ভাইয়ের পিতৃগৃহ। সেখানে তাঁর মা এবং দু'ভাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মামুন এবং অভিনেতা আল মনসুর থাকতেন। সায়ীদ ভাইয়ের সূত্র ধরে তাঁর পরিবারের সঙ্গেও আমাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তাঁর যে বোনটি আমাদের দোরগোড়ার দোতলা বাড়িটিতে ভাড়া থাকত, তাদের সঙ্গেও আমাদের নিবিড় সখ্য গড়ে ওঠে। যতদিন শাহজাহানপুরে ছিলাম, এই সখ্যের সুতোটি কখনও ছিঁড়ে যায়নি।

সায়ীদ ভাইয়ের বাড়ির সকলেই ছিলেন আমাদের বিষয়ে সংবেদনশীল। তাঁরা জানতেন আমি বেকার। কিন্তু সে-জন্যে কারও মধ্যে আমি করুণার আভাসমাত্র পাইনি। তাই সেই দুঃসহ জীবনের মধ্যেও একটা তৃপ্তির হাওয়া আমাদের সকল দুঃখ থেকে ত্রাণ করবার জন্য শীতল-স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে যেত। আমরা কিছুক্ষণের জন্য হলেও বেদনাদীর্ণ জীবনের ভার থেকে মুক্তি পেতাম।

এরপর থেকে সায়ীদ ভাই, ভাবী, লুনা এবং পরিবারের অন্যদের সঙ্গে বলতে গেলে একটা পারিবারিক সম্পর্কই গড়ে ওঠে। আমি নিয়মিতই সায়ীদ ভাইয়ের গ্রিন রোডের বাসায় যাতায়াত করি। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত্রি নেই—হুট করে গিয়ে দরজায় টোকা দিতাম। অধিকাংশ সময় ভাবী এসে দরজা খুলে দিতেন। মুখে সেই স্মিত হাসি। কোথাও বিরক্তির কোনও চিহ্ন নেই। সায়ীদ ভাই থাকুন কিংবা না-ই থাকুন, আমার জন্য তাঁদের অবারিত দ্বার আমাকে জীবনীশক্তি ফিরিয়ে দিত। বেকার-জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার মাঝে এই অম্লান ভালোবাসার ঋণ কি শোধ করা সম্ভব?

সদা হাস্যোজ্জ্বল, কৌতুকপ্রিয় এবং নির্বিরোধী একজন মানুষের নাম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। কী অপার কর্মতৎপরতায় ঋদ্ধ একজন মানুষ। *কণ্ঠস্বর* করছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখালেখি করছেন, বাংলাদেশ টেলিভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান করছেন। আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি, তিনি তরুণদের প্রতি ভীষণ আস্থাশীল ছিলেন। সারাক্ষণ তাদের নিয়ে থাকতে, কাজ করতে এবং তাদের ভেতরকার আগুন জ্বালিয়ে দেবার প্রয়াসে নিমগ্ন একজন মানুষ, একজন সফলতম শিক্ষক এবং একজন শুদ্ধ বিনোদনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের নাম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তাঁর মতো নিরহংকারী এবং পরোপকারী মানুষ জীবনে আমি খুব বেশি দেখিনি। বেকারত্বের সময় সহায়তা করার জন্য তিনি কত মানুষের কাছে যে আমাকে নিয়ে গেছেন, তা হিসাব করে বলা মুশকিল। সকাল নেই, দুপুর নেই, যখন যেখানে আমার জন্য উপযুক্ত একটা চাকরি জোগাড় করে দেয়ার সুযোগ হবে বলে মনে করেছেন, সেখানেই নিয়ে গেছেন। অনুরোধ করেছেন, আবদার করেছেন কত মানুষের কাছে!

সায়ীদ ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি মনজুরে মওলা সবে বগুড়ার ডিসি হিসেবে কাজ করার পর ঢাকার পল্লী উন্নয়ন সংস্থায় (বিআরডিবি পরিচালক-প্রশাসন) যোগদান করেছেন। একদিন দুপুরের দিকে সায়ীদ ভাইয়ের বাসায় গেলে সেখানেই মওলা ভাইয়ের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন বিআরডিবিতে যেন আমাকে একটি চাকরি দেন। তিনি বললেন, 'সবে ঢাকায় এসেছি, আগে সবকিছু দেখে নিই। তারপর চেষ্টা করব।'

মওলা ভাই বন্ধুর অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই দেখা গেল কয়েক দিনের মধ্যেই পত্রিকায় বিআরডিবিতে কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হবে। তার মধ্যে সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)-এর একটি পদ ছিল। মওলা ভাই সেই পদের জন্য আমাকে আবেদন জানাতে বললেন। আমি যথারীতি আবেদন করলাম। তারপরও আমার নিজের দোষে সে-চাকরিটি হল না। সে অন্য কাহিনী। থাক সে কথা। সায়ীদ ভাইয়ের কথাতেই আসি।

সায়ীদ ভাই ক্রমাগত আমাকে নিয়ে বিভিন্নজনের কাছে দৌড়াচ্ছেন। একদিন রাতে আমাকে নিয়ে গেলেন তৎকালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের কাছে। তাঁকেও অনুরোধ করলেন, যদি আমাকে একটা চাকরি দেয়া যায়। এরপর গেলেন বিটিভির-ই সিনিয়র প্রযোজক আতিকুল হক চৌধুরীর কাছে। তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন আমার একটি নাটক তিনি প্রযোজনা করেন। সায়ীদ ভাইয়ের অনুরোধে তিনি আমাকে যে কারও একটি গল্পের নাট্যরূপ দিতে বললেন। আমি প্রায় দু'সপ্তাহ রাত জেগে রবীন্দ্রনাথের *শেষের রাত্রি* গল্পের নাট্যরূপ দিলাম এবং সেটি নিয়ে একদিন সকালে আতিক ভাইয়ের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং আমার কাছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে নাটকের স্ক্রিপ্টটি নিয়ে পাতা উল্টে যেতে লাগলেন। জিগ্যেস করলেন, আমি কখনও টিভিনাটক লিখেছি কিনা। আমি কখনও লিখিনি শুনে তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, 'আপনি যে স্ক্রিপ্ট তৈরি করেছেন, তা পড়ে বোঝাই যায় না যে আপনি এর আগে কোনও স্ক্রিপ্ট লেখেননি!' বলে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগে আমার চোখ ভিজে এল। আতিক ভাই খুব শিগগিরই সেটা প্রচার করবেন বলে জানালেন। আমি খুশিমনেই ঘরে ফিরে এলাম। তারপর অনেকদিন হয়ে গেলেও নাটকটি প্রচারিত না হওয়ায় আমি ফের একদিন আতিক ভাইয়ের বাসায় গেলাম। তিনি জানালেন সামনেই রবীন্দ্রজয়ন্তী। যেহেতু আমার লেখাটি রবীন্দ্রগল্পের নাট্যরূপ, সে-কারণে ওইদিনই তিনি নাটকটি প্রচার করতে চান। এরপর রবীন্দ্রজয়ন্তী এসে গেল। কিন্তু আমার নাটকটি প্রচারিত হল না। আমি বিস্মিত হলাম। পরে আরেকদিন আতিক ভাইয়ের বাসাতে যাবার পর তিনি জানালেন, সরকারি নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি সেটি প্রচার করতে পারেননি। আমি ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু এই নাট্যরূপটি আর কোনোদিনই টেলিভিশনে প্রচারিত হল না। কথাটা আমি সায়ীদ ভাইকে জানানোর পর তিনি হতাশা ব্যক্ত করলেন এবং আতিকুল হক চৌধুরীকে আর অনুরোধ করার মানসিকতা হারিয়ে ফেললেন। পরে শুনলাম *শেষের রাত্রি* নাটকটি আতিকুল হক চৌধুরীর নামে বেতারে প্রচারিত হয়েছে। জেনে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। সায়ীদ ভাই একটি বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়লেন। আর আমি বেকার-জীবনের যন্ত্রণার কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হতে লাগলাম।

কিন্তু ওই অবস্থার মধ্যে সায়ীদ ভাই সাহসী ডুবুরির মতো আমাকে উদ্ধার করবার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি *কণ্ঠস্বর*-এর কাজের সঙ্গেও আমাকে সম্পৃক্ত করে ফেললেন। ওই পত্রিকাটি নিয়ে সায়ীদ ভাইয়ের সার্বক্ষণিক চিন্তা আমাকে বিস্মিত করত। পত্রিকার লেখার মান, তার সৌকর্য এবং মেকআপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদিতে সায়ীদ ভাইয়ের বিশিষ্টতা অনেকের কাছেই স্বতন্ত্র মর্যাদা পেত। লেটার প্রেসের যুগে তিনি বিভিন্ন প্রেসে ঘুরে ঘুরে তাঁর মনের মতো প্রেসেই কাজ করাতেন, যারা তাঁর চাওয়াটাকে বুঝত। সায়ীদ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করে আমারও ছাপার ব্যাপারে নতুন অভিজ্ঞতা হল।

এই সময় সায়ীদ ভাই আমাকে *কণ্ঠস্বর*-এর জন্য বাংলাদেশের ছোটগল্পের ওপর একটি লেখা তৈরি করতে বলেন। আমি অনেক পরিশ্রম করে পশ্চিমবঙ্গের গল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের গল্পের তুলনামূলক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি। সেটি *কণ্ঠস্বর*-এ ছাপা হয়। তার জন্যে সায়ীদ ভাই সম্মানী হিসেবে আমাকে ৭৫ টাকা দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে সেটা সম্মানী নয়, আমাকে বাঁচিয়ে রাখার একটি প্রয়াস। এই চেষ্টা যতদিন পর্যন্ত না আমি একটি চাকরি পাই, ততদিন অব্যাহত ছিল।

এরপর আমি একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থায় চাকরি পেলে সায়ীদ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগটা কমে যায়। তবে সম্পর্কটা নয়। সায়ীদ ভাই যখন 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তা আমার জানা ছিল না। পরে আমি সেটা জানতে পাই। বাংলামটরের একটি ছোট্ট পরিসরের ঘরে এই যাত্রা শুরু। আমি সেখানে অনেকবার গিয়েছি। সায়ীদ ভাই আন্তরিকভাবে আমাকে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনার কথা বলেছেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ছিল দিগন্ত-বিস্তারী। সেই স্বপ্ন তিনি সফল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যর্থতার পাল্লা একবারেই ভারি নয়। তাই আলোকিত মানুষের সন্ধান করবার জন্যে তিনি সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। আজ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা বিস্তৃত করে এক নতুন স্বপ্নভুবন নির্মাণে ব্রতী হয়েছে। সেই ভুবনের নির্মাতা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

শিক্ষক হিসেবে যেমন, তেমনি সংগঠক হিসেবেও তাঁর ভূমিকা প্রশ্নাতীত। তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পেয়েছেন 'ম্যাগসাইসাই' পুরস্কার।

সায়ীদ ভাইয়ের নানামুখী কর্মকাণ্ডের কারণে তাঁর লেখক-সত্তাটি প্রায় ঢাকা পড়ে যেতে বসেছিল। তিনি হাজারও কাজের মধ্যেও তাঁর সেই সত্তাটির পুনর্জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। অল্প সময়ের মধ্যে লিখেছেন অনেকগুলো বই। যদিও তাঁর একটি বিশেষ দুর্বলতার জায়গা, তাঁর কবিতা, তার প্রতি তিনি খুব একটা দৃষ্টি দেননি। তিনি মনে করেছেন, কবিতা লেখার চেয়েও সামাজিক দায়িত্ব পালন করা জরুরি। তাই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পাশাপাশি পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গেও নিজেকে সম্পৃক্ত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এবং কবিতাকে নির্বাসন দিয়ে এক ধরনের আত্মত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। আলোকের সন্ধানে ব্রতী একজন মানুষ নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, তার অনন্য দৃষ্টান্ত আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দেশে একজন স্বপ্নদ্রষ্টার কারণে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে অনেক আলোকিত তরুণের জন্ম হয়েছে, যারা এখন শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। শিক্ষক হিসেবেও তাঁর হাত দিয়ে গড়ে উঠেছে এমন সব উদ্দীপ্ত ছাত্র, যারা তাদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে দেশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাগ্মী হিসেবে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর কথা শুনে বিমুগ্ধ আবেশে মোহমুগ্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কথার এক মোহনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাদুমন্ত্রে তিনি সম্মোহিত করে রাখেন শ্রোতাদের। সে টেলিভিশনেই হোক কিংবা মঞ্চেই হোক। সায়ীদ ভাইয়ের কথা বলার একটি নির্দিষ্ট স্টাইল আছে। সিরিয়াস বিষয়ের সঙ্গে হাস্যরস ও কৌতুকের মিশ্রণে তিনি এমন এক ধরনের প্রসাদ সৃষ্টি করেন, যা প্রতিটি মানুষের চিত্তে এক ধরনের ঘন উতরোল সৃষ্টি করে।

আজ থেকে ৪২ বছর আগে সায়ীদ ভাইকে যেরকম প্রাণবন্ত দেখেছি, আজও তেমনি দেখছি। বয়স যেমন তাঁর শরীরে খুব একটা জীর্ণতার জাল ছড়াতে পারেনি, তেমনি তাঁর মনকেও টলাতে পারেনি। তরুণ বয়স থেকে আজ এই প্রবীণ বয়সে এসেও তিনি রয়ে গেছেন চিরতরুণই।

সায়ীদ ভাই এমন একজন মানুষ, যাঁকে অজাতশত্রুই বলতে হয়। তাঁকে নিয়ে কেউ কেউ যে সমালোচনা করেন না, তা নয়। কিন্তু সে যতটা তাঁর প্রতিষ্ঠান নিয়ে, ততটা ব্যক্তিকে নিয়ে নয়। তাঁর মতো একজন লোকের কোনও শত্রু থাকতে পারে, এটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ তাঁকে আমি কখনও ব্যক্তিগত সমালোচনা করতে দেখিনি কিংবা সমালোচনা করলেও তার মধ্যে যে পরিশীলিত শোভনতার পরিচয় দেখেছি, তা আজকাল তেমন একটা দেখা যায় না। আমাদের কবি-লেখকরাও যখন একে অপরের বিরুদ্ধে বিভীষণ-সম আক্রমণে ব্যস্ত, তখন সায়ীদ ভাই ব্যস্ত তাঁর নানামুখী কর্মকাণ্ড নিয়ে। এখানেই সায়ীদ ভাইয়ের সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য। সে-কারণেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত আহ্বানকে উপেক্ষা করার মতো মানুষ আমার নজরে পড়েনি।

আমি জানি, যে যাই বলুক, সায়ীদ ভাইয়ের মনের কোণে আমার অবস্থানটি কতটা আন্তরিক। এখনও যখনই দেখা হয়, তখনই তাঁর প্রলম্বিত নির্মল হাসির সঙ্গে 'কী অসীম সাহা, কী খবর?'—এই আন্তরিক জিজ্ঞাসাও আমার মনে এক ধরনের অন্তর্গত প্রবাহ সৃষ্টি করে, যার মধ্য দিয়ে আমি ভেসে যাই ৪২ বছর আগের পুরনো স্মৃতির বেলাভূমিতে, যেখানে উদীয়মান সূর্যের আলোকিত রশ্মির মতো একজন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আমাকে বিমোহিত করে রাখে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সায়ীদ ভাই যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন তিনি সক্রিয় থাকবেন তাঁর কর্মে, মর্মে ও মননে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং তাঁর কীর্তির চেয়েও তিনি হয়ে উঠবেন অনেক মহান।

২০১৪

অসীম সাহা : কবি
পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুয়েল আইচ

আমার দেখা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

আড়ে-দীঘে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এত বড় মানুষ যে তাঁর সম্পর্কে ছোট করে লেখার দুঃসাহস করাই বোকামি। তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা আমার ১৯৭৭ সালে। এর আগে আমি তাঁকে চিনতাম না। বরিশালের ফটো স্টুডিও আর্ট ভিলার ঠিকানায় আমার নামে পরপর দুটো টেলিগ্রাম পৌঁছেছে। তখন মোবাইল ফোনের যুগ ছিল না। টেলিগ্রামই দ্রুত যোগাযোগের মাধ্যম।

আর্ট ভিলায় আমার একটি বন্ধুমহল ছিল। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা। তারা সবাই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের প্রচণ্ড ভক্ত। তিনি (তখনকার একমাত্র টেলিভিশন) বিটিভি-তে *সপ্তবর্ণা* সিরিজ প্রোগ্রাম করে শ্রেষ্ঠ উপস্থাপকের পুরস্কার পেয়েছেন।

তাঁর অনুষ্ঠানে চান্স পাওয়া, সে তো এক বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। আর এ দেখি মেঘ না চাইতেই জল!

তাঁর টেলিগ্রাম দুটি পড়লাম, তিনি আমাকে সরাসরি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর অনুষ্ঠানে জাদু দেখানোর জন্য।

কিন্তু সমস্যা হল আমার জাদুর সমস্ত সাজসরঞ্জাম একদল ডাকাত কিছুদিন আগে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমি জাদু দেখাব কী নিয়ে? আমার বন্ধুরা যতটা উল্লসিত আমি ততটাই বিষণ্ন।

সবার অনুরোধে ঢাকায় এলাম। সায়ীদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি তখন নতুন প্রোগ্রাম *আনন্দমেলা* করার পরিকল্পনা করেছেন। সামনে ঈদ! ঈদের রাত্রে প্রচারিত হবে সেই বিশেষ অনুষ্ঠান, অনেক ঘটা করে দীর্ঘদিন প্রচার চলল, একসময় রেকর্ডিং-এর তারিখও নির্ধারিত হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পর্কে সর্বমহলে কিংবদন্তিতুল্য প্রশংসা দৃঢ় হয়ে গেছে। তিনি যে খুব অনায়াসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠান করে যাবেন তাতে আমার কোনো সন্দেহই রইল না। আর এই আমি? ঢাকা বেতারে ক্যামেরা ছাড়া বাঁশি বাজানোর কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। তাতেই রেকর্ডিং-এর সময় বুক ঢিপঢিপ করত।

টেলিভিশনেও গোটা দুই ছোটদের প্রোগ্রাম করেছি। ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে আসতে চাইত, আর এবারে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মতো উপস্থাপকের ঈদের বিশেষ *আনন্দমেলা*!

টেলিভিশনে পৌঁছে দেখি আমি একাই ভয়ে জড়োসড়ো নই। বাঘা বাঘা শিল্পীরাও ভয়ে যেন জড়ো হয়ে গেছেন। আমি বুঝলাম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মঞ্চে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সবাই বাঘের মতো চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

রেকর্ডিং শুরু হল। মঞ্চের দুই পাশে তাঁর বেশ কয়েকজন সহকারী তাঁকে সাহায্য করার জন্যে সদাপ্রস্তুত। তাঁর বিশিষ্ট সহকারী লোদীর হাতে কাচের বোতলভর্তি পানীয় জল। মোহনীয় কণ্ঠে চমৎকার ভঙ্গিতে উপস্থাপক দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কথা শুরু করলেন। কী সুন্দর তাঁর বাচন-ভঙ্গি।

কী তাঁর ব্যক্তিত্ব, এই না হলে কি এত বড় উপস্থাপক! কিন্তু একি! পুরো এক লাইন কথা শেষ করার আগেই তিনি বলে উঠলেন "কাট্"। হাস্যোজ্জ্বল মুখ যেন কালো হয়ে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল তিনিও আমার মতো প্রচণ্ডভাবে ভীত। উইংসের ডানে-বামে তাকিয়ে কাতর স্বরে বললেন, 'লোদী, পানি'। পানি খেলেন। বেশ কিছুটা সময় তিনি তাঁর বক্তব্য আবার আওড়ালেন। হেসে হেসে মেরুদণ্ড সোজা করে বীরের মতো তাঁর প্রথম পর্বটি একসময় শেষ করলেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার কাট্ করলেন, পানি খেলেন, এদিক-ওদিক তাকালেন, মুখ মলিন করলেন অর্থাৎ চূড়ান্ত টেনশনে একজন মানুষ যা কিছু করতে পারে, সবই করলেন।

আমার তাতে বেশ সাহস হল। তাঁর মাপের এত বড় একজন উপস্থাপক ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে যদি এতটা নার্ভাস হয়ে যান তাহলে আমার নার্ভাস হতে আপত্তি কোথায়। এ থেকেই আমি শিখলাম, যেকোনো কাজ করতেই হবে, এই সাহসটাই আসল সাহস। আমি তাঁকে দেখেছি এক-একটা প্রোগ্রামের জন্য তিনি কী কঠিন পরিশ্রম করতেন। এরকম অসংখ্য কাজ তাঁকে করতে দেখে, তাঁর উপদেশ নিয়ে আমি আমার পুরো স্টেজ শো সাজিয়েছি। এই প্রাপ্তি যে কত বড় তা শুধু আমিই জানি। তাঁর সঙ্গ আমার কাছে ক্রমে ক্রমে নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল। এর পরে তিনি আরো অনেকগুলো সিরিজ প্রোগ্রাম করেছেন । সেগুলোও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর 'আলোকিত মানুষ' গড়ার কথা শুধু বাংলাদেশে নয়, আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি পেয়েছে। তিনি অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন।

ভিন্ন ধাতুতে গড়া এই মানুষটি সম্পর্কে ছোট্ট একটি গল্প বলে আজকের প্রসঙ্গ শেষ করব। শিক্ষক হিসেবেও তাঁর ছিল জনপ্রিয়তা; টিভি উপস্থাপক, আবৃত্তিকার, বাগ্মিতা বা লেখকের চেয়েও কম ছিল না সেই জনপ্রিয়তা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম দিককার কাহিনী। তিনি তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী, কন্যাদ্বয়, স্ত্রী ও আমাদেরকে নিয়ে বড় একটা বাসে পিকনিকে যাচ্ছিলেন। তরুণ ছাত্রদের কথাবার্তা হাসিঠাট্টা হৈ চৈ শুনে বোঝার উপায় ছিল না সেখানে তাদের শিক্ষকও রয়েছেন। একপর্যায়ে সায়ীদ স্যার নিজেও ছাত্রদের দলে ভিড়ে গেলেন। শুরু হল কৌতুক আর ছড়া প্রতিযোগিতা। একধরনের বিশেষ ছড়ার উদাহরণ দেয়া যাক। একটি ছাত্র চিৎকার করে বলে উঠল, "স্যার"। সঙ্গে সঙ্গে অন্য পাশ থেকে আরেকটি ছাত্র বলে উঠল, 'ধরব তোমার ঘাড়'। আরেকজন চিৎকার করে উঠল, 'করব বাসের বার'। সবাই হো হো করে হেসে উঠল। আকর্ণ হাসি দিয়ে স্যারও যুক্ত হলেন তাদের সঙ্গে।

এই হলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ!

২০১৪

জুয়েল আইচ : জাদুশিল্পী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবিদ আনোয়ার

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর কবিতা

অন্য অনেক গুণপনা ও কর্মকাণ্ডের খ্যাতিতে প্রায় ঢাকা পড়েছে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কবি-পরিচয়। উপরন্তু, কবি হিসেবে প্রচলিত অর্থে 'খ্যাত' হওয়ার জন্য, বিশেষ করে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের পর, রচনার যে ব্যাপ্তি ও ধারাবাহিকতা প্রয়োজন ছিল, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মধ্যে সে প্রয়োজন মেটানোর তাগিদও লক্ষ করা যায়নি। অনেক বিলম্বে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর একমাত্র কবিতার বই *মৃত্যুময় ও চিরহরিৎ* এই কবিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করার জন্য যথেষ্ট।

আবেগ ও মননের যথাযথ সম্মিলন ঘটেছে তাঁর কবিতায়। *বৃদ্ধের শিথিল ত্বক পরে আছি তরুণ শরীরে*— এই আত্মঘোষণামূলক পঙ্‌ক্তির সাথে সংগতিপূর্ণ একটি উপসংহারে আমরা বলতে পারি : বর্ণিত অকালবার্ধক্যের মতো তাঁর মননের পরিপক্বতা দিয়ে জীবনের গভীর দার্শনিকতাকে এ কবি প্রকাশ করেছেন। জীবনকে গভীরভাবে অবলোকন করার অঙ্গীকারও তিনি ব্যক্ত করেছেন একটি কবিতায়। লিখেছেন : গাড়ির জানালা দিয়ে, বিমানের জানালা দিয়ে, পাহাড় ও পৈঠায় দাঁড়িয়ে যারা জীবনের "পলাতক অপসৃয়মাণ" দৃশ্যরাশি অবলোকন করে তাদের মতো করে নয়, বরং জীবনকে আমাদের দেখতে হবে "পাশে বসিয়ে, হাতে ছুঁয়ে, সব গোপন প্রাণকেন্দ্র ঝাঁকিয়ে, উত্তপ্ত করে; এর শরীরের সবক'টি নিবিড় শিরাস্নায়ুর সূক্ষ্ম গোপন সরণিপথে কামনার চিকন সুতোকে অবিরাম যাযাবর বানিয়ে" অর্থাৎ জীবনকে জানার জন্য আমাদের দৃষ্টিকে জীবনের গভীর ভেতরে চারিয়ে দিতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কবির মানসলোকে ক্রিয়াশীল প্রধান বিষয় দার্শনিকতা, দেশপ্রেম, নারীপ্রেম ও নস্টালজিয়া। নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে যে ঢাকা শহরকে কবির কাছে মনে হয় *ব্যস্ত বৈভবশালী নারী, আলোকিত রূপসী গণিকা* তার *নিষিদ্ধ আহবান* থেকে দূরে তেঁতুলিয়ায় বেড়াতে গিয়ে তিনি দেখেছেন তাঁর প্রকৃত স্বদেশকে। দেখেছেন, *চাকার কুটিল দাগ বাঙলার এই নম্র কুমারী মাটিকে/ কলঙ্কিত করে নাই আজো;* কামনা করেছেন *বুড়ো বট নুয়ে থাকবে প্রাচীন ঝুরিতে/ কাঁটার উদ্যত বর্শা উঁচিয়ে শিমুল তার সতীত্ব বাঁচাবে আরো কিছুকাল*। কিন্তু না, সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র দেখেছেন তিনি আবহমান বাংলাদেশের অন্য এক পল্লিতে : *কলের শব্দ ওঠে ধানক্ষেতে-নিবিড় পাড়ায়* এবং চাল-ছাঁটার যান্ত্রিক শব্দের দাপটে ডুবে যাচ্ছে *ধানভানানীর গান* আর *ঢেঁকির পুরনো গল্প*। গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে জীবন দেখতে দেখতেই *শরীরী শঙ্খিনী* নামের একটি কবিতায় কবি উপলব্ধি করেন এই সত্য যে, মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর মনসার সর্পসজ্জা বিবৃত করেছেন যার হিংস্রতা দেখে সে ছিল তাঁরই নিজস্ব রমণী। এ-কবিতায় *অপরূপ-দীর্ঘাঙ্গী-তন্বী-নর্তকীর কাল ভঙ্গিমায়/ এখনো সে শরীর নাচায়*— এমন একটি অসাধারণ চিত্রকল্পে তিনি ধারণ করেছেন একাধারে এক সুন্দরী রমণী ও সর্পিনীর হিংস্রতাময় সৌন্দর্যকে।

ষাটের অন্য প্রধান কবিদের মতোই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে তাঁর কবিতার বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছেন। স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও গদ্যরীতির কবিতা অত্যন্ত সীমিত। *ক্ষিপ্র বেড়ালের মত সাইকেল, নির্মোহ সাপের মত স্তব্ধতা, ঝুরো বটগাছের মত [বাউলের] একরাশ চুল, শীত উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়-ওড়া রঙিন উত্তাল শাড়িদের মত, 'যে জীবন রক্তে বাড়ে ফলবান গাছের মতন, রূপকথার মৃত নগরীর মত সার সার বাড়ির মিছিল, দর্শকহীন রূপসীর মত মধ্যরাতের উজ্জ্বল আলোক* ইত্যাদি ভাবনা-উদ্দীপক উপমান-উপমেয়'র সম্মিলনে সমৃদ্ধ বহু উপমা থাকলেও উৎপ্রেক্ষা, রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের প্রবণতা কম লক্ষ করা যায়। প্রধানত উপমা, সমাসক্তি ও অন্যাসক্ত এবং এসবের রসায়নে সৃষ্ট চিত্রই তাঁর কবিতার প্রাণ।

২০০৮

আবিদ আনোয়ার : কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিনুল ইসলাম ভুইয়া

আমাদের সকলের আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে সর্বস্তরের বয়েসী মানুষের কথা বাদ দিলেও, বিশেষভাবে এত কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী যে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের গুণমুগ্ধ, তার কারণ কী? কী সেই অনন্যতা, কী সেই গুণ, যা তাদের সবাইকে আকৃষ্ট করে? সেটি কি তাঁর সুন্দর মুখাবয়ব, বাচনভঙ্গি? শিক্ষক হিসেবে তাঁর বিশেষ আকর্ষণীয়তা, তাঁর পরিবেশনার মধু? তাঁর রুচিবোধ? তাঁর সহৃদয়তা? বিনয়? তাঁর প্রজ্ঞা, যুক্তিবুদ্ধি আর সাহস? দেশকে, মানুষকে, মানবতাকে, প্রকৃতিকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে তাঁর তীব্র দুর্মর আবেগ? সাহিত্য দর্শন সংগীত নৃত্য ভাস্কর্য স্থাপত্য পুরাকীর্তি সিনেমা নাটক পেইন্টিং— সৃজনধর্মী সকল শিল্প দেখে, শুনে বিস্মিত হওয়ার, আলোড়িত হওয়ার ক্ষমতা; এসব মানবীয় সৃষ্টিকে বোঝা, আস্বাদন করা, উৎসাহিত করার দক্ষতা? বইয়ের মধ্যে এসবের সন্ধান পাওয়া যায় বলে সবাইকে বই পড়তে এবং আনন্দ নিয়ে বই পড়তে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ সম্মোহনী শক্তি? এসব মানবীয় কলাকে, সংস্কৃতিকে লালন করার জন্য সংগঠন গড়তে পারার দক্ষতা? নতুন নতুন সৃজনী প্রতিভাকে উৎসাহিত করা, বিস্মিত হতে সাহায্য করা, দূর দিগন্তে তাদের দৃষ্টি উন্মীলনে সহায়তা করার ক্ষমতা? সাহিত্যকর্মকে উৎসাহিত, প্রণোদিত করা (উদাহরণত, *কণ্ঠস্বর* সম্পাদনা, প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠা) না কি, তাঁর নিজস্ব সাহিত্যপ্রতিভা? তিনি কবি, গল্পকার, অনুবাদক বটেন, সমালোচনা সাহিত্যেও তাঁর হাত পাকা বলে অনেকের ধারণা। নাকি সবই কেবল তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদু? পরিবেশনা-শিল্পে তাঁর বিশেষ দক্ষতা, স্টাইল— যা দেশের সর্বত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাদৃত হয়েছে, হচ্ছে, আর তাতে বিমুগ্ধ বাংলার মানুষ? আমার ভেতরে অন্য কেউ একজন বলছে, এর উত্তর পাওয়া কঠিন, তা পাওয়ার চেষ্টা করাও বাতুলতা। প্লেটোর শ্রেণিকরণে যাকে সদ্‌গুণ বলা হয়, যাকে নৈতিকতা, সাহস, সংযম, প্রজ্ঞার যুক্তফল বলা হয়, তা দিয়ে তাঁকে হয়তো নামায়িত করা যেত, কিন্তু তাঁর ভিত্তিতে যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে, হচ্ছে— 'আলোকিত মানুষ' সৃষ্টির মাধ্যমে ন্যায়পরায়ণ, মহান দেশ গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর সংগ্রাম, পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে, পৃথিবীকে অধিকতর বসবাসযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টা— এসব কিছুকে সেই বিমূর্ত মাত্রার শব্দাবলিতে কী করে ধরা যাবে? উল্লিখিত সবকিছুকে যদি এক ধরা যায়, যদি তাদের এক নামে— 'আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ' নামে ডাকা হয়, তবে কি কোনও ক্ষতি হয়?

আবার ভাবি, আমার তো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রতিনিয়ত পরিবারের, বৃহত্তর সংসারের মানুষজনের সাথে যে মেলামেশা করছি, তাতে আমাদের পছন্দ-অপছন্দ তুলে ধরছি, তা দিয়েই তো উত্তর দিচ্ছি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যে আমার একটি পছন্দের প্রতিষ্ঠান, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আমার পছন্দের মানুষ, তা বলা তো আর বাকি নেই। তবু দুটো কারণে, আনুষ্ঠানিকভাবে এই বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখব বলে ভেবেছিলাম। প্রথমত, আমার লেখাপড়া ও আমার বেড়ে-ওঠার জন্য আমি তাঁর কাছে প্রভূতভাবে ঋণী; সেই ঋণের মধুর ভার বয়ে চলা আমার জন্য প্রগাঢ় আনন্দের। সে কথা প্রকাশ করা আমার ঋণভার লাঘব করার প্রচেষ্টার মতো দেখায় ভেবে নিজের কাছে লজ্জিত হয়ে পড়ি (সে কাহিনী পরে)। গোপনে তা বয়ে চলাই শ্রী। দ্বিতীয়ত, এই লেখাটি যেহেতু প্রকাশিত হচ্ছে, তাই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পর্কে আমার বোধকথাকে অতিশয়োক্তি হিসেবে ভেবে নেওয়ার অবকাশ ঘটতে পারে পাঠকের। তাঁর সম্পর্কে আমার ভাবনাকে পাঠক কেবল আমার কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ধরে নিতে পারেন; যদি তা ঘটে তবে তা হবে আমার জন্য অতিশয় লজ্জার। এ এক উভয়-সংকট।

যাই হোক, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে নিয়ে কেবল আমার ভাবনাই যেহেতু এই সংকলনে স্থান পাচ্ছে না, অন্যদের ভাবনা, অভিজ্ঞতা, মতামতও তাতে স্থান করে নিচ্ছে, তাই পাঠকের পক্ষে হয়তো মনে করা সম্ভব হবে যে, শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, সত্যিকার সদ্‌গুণের জন্য, মানুষ ও দেশের প্রতি সদিচ্ছা, অঙ্গীকারের জন্যও তিনি নন্দিত, প্রশংসিত। এমন একজন সদ্‌গুণধারী ব্যক্তিত্বের প্রশংসাও আমাদের মধ্যে সদ্‌গুণের সঞ্চার করে, আর তা-ই আমরা যা করছি— তা সদ্‌গুণ চর্চা বই কিছু নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একথা বলা আমার জন্য আনন্দের যে, ওপরে যেসব গুণের কথা, দক্ষতার কথা বলা হল, তার সবই আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আমার প্রিয়। কিন্তু এগুলোকে মূলত বিমূর্ত মাত্রায় বলা হয়েছে; কিছুটা নিরেট মাত্রায় তাঁর কর্মকাণ্ডের বিশেষত্ব তুলে ধরা দরকার।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন শিক্ষক। শিক্ষকের কাজ হল কচি আত্মায় (মনে) বিস্ময়কে জাগ্রত করা; জ্ঞানের দিগন্তকে ছাত্রছাত্রীদের সামনে মেলে ধরা; মানুষের ভেতরে যে অমিত সম্ভাবনা আছে তা উন্মোচিত করা, প্রতিষ্ঠা করা; নৈতিক জীবনের যে স্বাদ তার সুখে মনকে উদ্বেলিত করা; অধিকন্তু, সক্রেটিস যাকে বলেন, 'ধাত্রীর মতো' ভাবসন্তানের জন্মদান, তা সম্পাদন করা। এসব কাজে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রথাগতভাবে বহুদিন যুক্ত থেকেছেন। কিন্তু তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল, তাতে খুব একটা এগুতে পারছেন না, তাই হয়তো আত্মকরুণা করে নিজেকে 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক' ভেবেছিলেন। আর এজন্যই হয়তো তাঁর প্রচেষ্টাকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য এক ভুবনে, বা বলা চলে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন অন্য এক ভুবন। ক্ষুদ্র পরিসরে পাঠচক্র দিয়ে শুরু হয়েছিল সেই প্রচেষ্টা। তারপর তিনি যেমন নতুন নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছেন, তেমনই, অন্যান্য মনও তাতে যোগ দিয়ে সেই প্রচেষ্টাকে ঋদ্ধ করেছে। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আজ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র 'মানবীয় শিক্ষা'র (যদি প্লেটোর ভাষায় বলা যায়, 'মিউজিক' শিক্ষার) এক বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে পাঠচক্র, ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি (সদস্য প্রায় এক লক্ষ), স্কুল-কলেজে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি (অংশগ্রহণকারী আনুমানিক আট লাখ দশ হাজার), বই পড়া প্রতিযোগিতা, আলোর ইশকুল, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড, প্রকাশনা ইত্যাদি মিলে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে প্রতিষ্ঠানটিতে। এ এক অভিনব, অনন্য, কষ্টসাধ্য কর্মযজ্ঞ বই কি! আর বলা বাহুল্য এর প্রাণপুরুষ, এর উদ্দীপক, এর ব্যবস্থাপক হচ্ছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। এমন একজন চিন্তক, একজন কর্মবীর তো আমাদের সমাজে বিরল। তাঁর কীর্তন করা নিজের জন্য কতই না সম্মানের, কতই না আনন্দের!

আমরা যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে অভিনব, অনন্য, প্রতিষ্ঠান বলি তা কোন্ দিক থেকে সত্য? এমন বলা যায় যে, বাংলাদেশকে একটি আধুনিক, উন্নত সমাজ হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে সর্বাগ্রে যে আলোকিত, বিজ্ঞানমনস্ক, কুসংস্কারমুক্ত, রুচিশীল, জিজ্ঞাসু, নীতিবান, সংস্কৃত মানুষ গড়া প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। আর তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন, তা গড়ে তিনি একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব

পালন করেছেন, পালন করে চলেছেন। বাংলাদেশের নাগরিক সমাজে (অন্য ভাষায় 'সুশীল সমাজ') স্বাধীনতার পর যেসব প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়েছে, তাদের মূল কাজ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে আর্থসামাজিক উন্নয়ন। এমনও হয়তো বলা যায়, স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্র ও সমাজকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং বিশ্বায়নের সুযোগেই মূলত তাদের সৃষ্টি। তখন ভাবা হয়েছিল যে, রাষ্ট্র ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বাইরে এবং পাশাপাশি থেকে নাগরিক সমাজের শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সমাজের, মানুষের সার্বিক উন্নয়নই হবে তার লক্ষ্য। কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি সে পথে তারা এগুতে পারেনি বেশিদূর। আর হালে অবস্থাটি এমন দাঁড়িয়েছে যে, কোন্‌টিকে সুশীল সমাজের সংগঠন, আর কোন্‌টি 'বণিকের' সংগঠন, তার পার্থক্য করা যাচ্ছে না। এই ধোঁয়াশাময় অবস্থার মধ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তার দূরলক্ষ্যে স্থির রয়েছে বলে মনে হয়। বণিকবৃত্তিতে নিমগ্ন হয়নি প্রতিষ্ঠানটি, আর 'রাজপুত্রের' কাজেও হাত বাড়ায়নি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যে-ধরনের প্রতিষ্ঠান, তাকে আবার 'স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান'ও বলা হয়ে থাকে। সেই স্বেচ্ছাসেবার পতাকাটি ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। আমার ধারণা, স্বেচ্ছাসেবা হচ্ছে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'। তাতে ঐহিক, তথা ভোগান্বেষী কোনও কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আমার ধারণা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ 'মোষ তাড়ানোর' কর্মটি আনন্দের সাথে করেন, আনন্দের জন্য করেন। আমি জানি না, তিনি ছাড়া বাংলাদেশে 'সুশীল সমাজের' অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান-প্রধান আছেন কি না, যিনি কোনও মাইনে ছাড়া, সম্মানী ছাড়া এমন কাজ করেন।

আমার ইচ্ছে হয়, ধ্রুপদী গ্রিসে সক্রেটিস-প্লেটোর শিক্ষা কর্মকাণ্ডের সাথে সফিস্টদের শিক্ষা কর্মকাণ্ডের তুলনা করে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডকে স্পষ্ট করে তুলি। সক্রেটিস মনে করতেন, শিক্ষা ক্রয়যোগ্য কোনও জিনিস নয়, তা কোনও দক্ষতার (গ্রিকরা যাকে তেকনে বলে) আদান-প্রদানও নয়; কেবল মুখে মুখে চাইলেই কাউকে শিক্ষা দেওয়া যায় না; যে শিক্ষা পেতে আগ্রহী, যার মধ্যে সেই আকুতি জন্ম নিয়েছে, তাকেই শুধু পথ দেখানো যায়, তাকে 'অনুস্মরণে' (recollection) সহযোগিতা করা যায়। কিন্তু সফিস্টগণ প্রভূত অর্থের বিনিময়ে, এবং যে চাইত, যে অর্থ দিতে পারত, তাকেই শিক্ষা দিত। এখানে যদি কেউ আমাদের হালের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সফিস্টদের শিক্ষাপদ্ধতির সমান্তরলতা টানতে চান, তাহলে কি খুব একটা ভুল হবে? এই সাদৃশ্যের কথা ভেবে আমার মনে আরও প্রশ্ন জেগেছে: সক্রেটিস যে অন্য মানুষের 'আত্মার পরিচর্যা'র জন্য সারাদিন আগোরায় ব্যস্ত থাকতেন, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতেন, নিজেকে যে তাঁর ভাষায,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যাথেন্সের আশীর্বাদ 'ডাঁশ মশা' করে তুলেছিলেন, আর কোনও আয়-রোজগারের চেষ্টা করতেন না, তাতে তাঁর দিন চলত কীভাবে? আমরা *ফিদো*-তে শুনতে পাই, তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি তাঁর বন্ধু ক্রিতোকে বলছেন, "ক্রিতো, এসক্লেপিয়াসের কাছে একটি মুরগি ধার করা ছিল, শোধ করে দিয়ো।" জবানবন্দিতে তিনি দারিদ্র্যকে তার সাক্ষ্য মেনেছিলেন। আমার ভাবনামতে, পৃথিবীর 'প্রথম সুশীল সমাজের দার্শনিক ও সমাজকর্মী' ছিলেন সক্রেটিস এবং তাই তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়েছিল দারিদ্র্য। আমার আরও মনে হয়, সক্রেটিস তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সুশীল সমাজের দর্শন, তার কর্মপদ্ধতির মানদণ্ড স্থির করেছিলেন। তা স্বেচ্ছাপ্রণোদনার, স্বেচ্ছাসেবার, তা মানুষের প্রতি শুভেচ্ছার, তা নৈতিক জীবনযাপন এবং তাতে মানুষজনকে প্রবুদ্ধকরণের, সক্রেটিসের ভাষায় 'আত্মার পরিচর্যা'-র। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে সত্যিকার অর্থেই নাগরিক সমাজের, হালের ভাষায় 'সুশীল সমাজের' প্রতিষ্ঠান বলতে হয়, এবং আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে নাগরিক সমাজের দার্শনিক ও কর্মী। দারিদ্র্যের প্রসঙ্গটি আলোচনায় এনে আমরা বলতে পারি, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের পক্ষে হয়তো সক্রেটিসের মতো ততটা দরিদ্র হওয়া সম্ভব হয়নি। সেটি তার অতীতের আয়, বংশানুক্রমিক কিছু সম্পত্তি প্রাপ্তি, পরিবারের সদস্যগণের (বিশেষত তাঁর স্ত্রীর), আর বিভিন্ন পুরস্কারের অর্থ (সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ম্যাগসাইসাই পুরস্কার) ইত্যাদির কারণে। কিন্তু আমরা সহজেই এ দু'য়ের কর্মধারার মধ্যে সাযুজ্য খুঁজে পাই। কালপর্যায় ও বাস্তবতার ভিন্নতা হওয়ার কারণে যদিও আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করতে হয়নি, তবু ভাবা যায় যে, উল্লিখিত কর্মদর্শন অনুসরণে তাঁর তেমন পরিণতি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ যে দারিদ্র্যের দৈত্যকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবাকে সত্যিই স্বেচ্ছাসেবা করতে পেরেছেন, তাতে তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়ে উপায় থাকে না।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পর্কে বহু মানুষের বহু কিছু বলার আছে, তাঁরা বলবেনও। আমি তরুণ-তরুণীদের মুগ্ধতার কথা বলতে পারি। যখনই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কোনও অনুষ্ঠানে যাই, তার কোনও কর্মকাণ্ড— পাঠচক্র, বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি, তখন তাদের মুগ্ধতা আমার চোখে পড়ে। আমার ধারণা এই মুগ্ধতা তাদেরকে সাহায্য করে নিজেদের চিনতে, নিজেদের সম্ভাবনার কথা জানতে। এমন একজন যাদুকর পাওয়া এই সমাজের জন্য, এই দেশের জন্য সৌভাগ্য বটে! আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের প্রতি অন্য অনেক কিছু নিয়ে মুগ্ধতার মধ্যে আমি তাঁর সহৃদয়তার প্রতি মুগ্ধতার কথা জানাতে চাই। গোড়ায় যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতজ্ঞতার কথা বলেছিলাম, এটি তাঁর সেই সহৃদয়তার কথা। বহু আগে ১৯৬৩ সালের দিকে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ছিলেন ইন্টারমেডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। পিতৃহীন আমি গ্রাম থেকে চাচার হাত ধরে এসেছিলাম সেই কলেজে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হতে। দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিছুতেই ভর্তি হওয়া যাচ্ছিল না, যদিও ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলাম। শেষ প্রচেষ্টা ছিল প্রিন্সিপালের কক্ষে ঢুকে আর্জি জানানো; সেটি জানানোর একমাত্র যে উপায় তখন বের করতে পেরেছিলাম তা ছিল তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে কেঁদে ফেলা। সেদিন এই তরুণ অধ্যাপকটি গভীর মমতায় আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে আমাকে ভর্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন। (চল্লিশজন ছাত্রের সেকশনে আমার রোল নাম্বার হয়েছিল তেতাল্লিশ)। তারপর চলেছিল ঢাকায় থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার এক কঠিন সংগ্রাম। জায়গির না পাওয়া, হোস্টেলের খরচ চালাতে না পারা, ইত্যাদি মিলে আবার ফিরে গিয়েছিলাম গ্রামে। কিন্তু তরুণ, আপাতদৃষ্টিতে আপনভোলা, স্বাপ্নিক এই সহৃদয় অধ্যাপকটির দৃষ্টি এড়ায়নি এই অঘটন। তিনি ছাত্র পাঠিয়ে আবার গ্রাম থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন আমাকে, হোস্টেলে বিনে পয়সায় খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছিলেন; তবেই কিছুকাল পড়াশুনা করে আমি এসএসসি পাস করতে পেরেছিলাম। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। এমন কত মানুষের জীবন যে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর সহৃদয়তা দিয়ে, প্রজ্ঞা দিয়ে, তাঁর স্পর্শ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, সাহায্য দিয়ে বদলে দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর এমন সহৃদয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো কি আনন্দের ব্যাপার নয়! তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

২০১৪

আমিনুল ইসলাম ভুইয়া : অনুবাদক
প্রাক্তন সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী ইমাম

আমার মুক্তি আলোয় আলোয়

আমার বয়স যখন আঠারো তখন তাঁর দেখা পেলাম। মুগ্ধ হয়ে গেলাম তাঁর কথা বলার শৈলীতে। যা ছিল বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি কথা বলতেন এমনই আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে যাতে শ্রোতারা সহজেই প্রভাবিত হয়ে যেত। তাতে মিশে ছিল অন্তরঙ্গতা। তিনি গভীর বিশ্বাসবোধ থেকে বাক্য উচ্চারণ করতেন। স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের অধিকারী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ কথা বলার অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য আমার কাছে নায়ক হয়ে উঠলেন। মনের মাঝে এমন বিশ্বাস জন্মাল যে, তাঁর সান্নিধ্যে গেলে আমি জীবনে বেঁচে থাকার সঠিক অর্থকে আবিষ্কার করতে পারব। আমার বিভ্রান্তিকে কাটাতে পারব তাঁর উপদেশ শুনে। আমি তখন অস্থির চিত্তের এক যুবক। অবিরাম মনের মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আঁচড় ফুটছে। সে যেন সঙ্কটকালীন এক অবস্থা। বিশ্বাসের ভিতে চির ধরছে। আঠারো বছর বয়স হল দুঃসহ এক কাল অতিক্রমণের সোপান। যখন স্পর্ধায় মাথা তুলবার ঝুঁকি নিতে ইচ্ছে করে। যে বয়স বেদনায় থরোথরো হয়ে কাঁপে। বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় উঁকি। আমার অস্থিরতায় কম্পমান সময়ে সায়ীদ স্যারের সাথে পরিচিত হলাম।

আমাদের জীবনের সেই সময়টা ছিল উত্তাল। ঊনসত্তরের দুর্বার গণআন্দোলনের প্রাকপ্রস্তুতি লগ্ন। প্রবল অনিশ্চয়তায় সময়কাল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক চেতনার জাগরণের সময়ে বিভ্রান্তির চোরাবালিতে ফস্‌কে পড়ার আশঙ্কায় ভীত ছিলাম। অথচ সেই স্পর্ধিত উক্তি প্রত্যয়ী করে তুলছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়। আপ্তবাক্যের মতো আমাদের অন্তর্গত দহন, ক্ষোভ ও দ্রোহকে ধারণ করেছে এ পঙ্‌ক্তিনিচয়। সংস্কৃতি বিষয়ক পাকিস্তানের উদ্ভট এক তত্ত্ব 'তাহজিব ও তমদ্দুনে'র সর্বনাশা কুপ্রভাবে আমাদের মনোজগৎকে বিনষ্ট করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল। সে রকম দুঃসময়ে সায়ীদ স্যারকে কাণ্ডারীর মতো পেলাম। হাল ভেঙে যে নাবিক দিশা হারিয়েছে, সে কূলের সন্ধান পেল।

তখন পূর্ণেন্দু পত্রী-র দৃষ্টিতে সময় এভাবে চিহ্নিত— *স্কুল কলেজে খিল, রাস্তায় মিছিল/ ক্র্যাকারের শব্দে কাঁপে রাজপথ, কিনুগোয়ালার গলি;/ হীরের টুকরো ছেলেরা সব অশ্বমেধের বলি*। এ পঙ্‌ক্তিসমূহ মনোলোকে আহত পাখির ডানার মতো তুমুলভাবে ঝাপটা দিতে থাকে। মুখে আঁচড় কাটছে অবিশ্বাসের দাগ। সায়ীদ স্যার যেন শিক্ষাগুরুর আদলে বন্ধুর মতো এসে সুবচন উচ্চারণ করলেন— আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ। সায়ীদ স্যারের বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি আমাকে তখন প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। তিনি বক্তব্য প্রকাশ করেন প্রসন্নতার সাথে। তাঁর বাক্যাবলি শ্রবণে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। তাপিত হৃদয়ে সুষমার বিস্তার ঘটান। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি অনায়াসেই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। তিনি এতটাই আমার মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেন যে, বিশ্বাস হল তাঁর কাছে রয়েছে জীবনের লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সত্যিকারের দিক-নির্দেশনা।

তখন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এক তুমুল জনপ্রিয় শিক্ষকের নাম। ঢাকা কলেজের শ্রেণিকক্ষকে তিনি সরোবরে রূপান্তরিত করতে পারেন। কত নদী গিয়ে সেই সরোবরে মেশে। তাঁর উচ্চারিত শব্দাবলি বুকে রোপণ করে বীজ। তার পূর্বে আমি কারো সাক্ষাৎ পাইনি যে এমন করে সত্তাকে জাগিয়ে তুলতে পারে। এমন প্রবলভাবে উজ্জীবিত করতে পারে। অনুপ্রাণিত করতে পারে। 'যে আমি আমার আমি' চেতনাকে জাগিয়ে তুললেন তিনি। এক স্বপ্ন-জাগানিয়া মানুষ তিনি। সৃষ্টি করলেন 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র'। তাঁর অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতায় কেন্দ্র হয়ে ওঠে আত্মউপলব্ধির শ্রেষ্ঠতম স্থান। পঁয়ত্রিশ বছর আগে গভীর বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেন্দ্রকে। যেখানে পরতে পরতে রয়েছে নিজেকে জানার পালা। নিজেকে আবিষ্কারের সুশৃঙ্খল এক প্রয়াস। হেলেনিক সভ্যতার প্রতি প্রবলভাবে আস্থাশীল সায়ীদ স্যার যেন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন সেই কালোত্তীর্ণ প্রবাদপ্রতিম প্রবচনটিকে। গ্রিসের পারনাসাম পর্বতের ফসিম উপত্যকায় ডেলফির মন্দির চত্বরে অ্যাপোলোর মন্দিরের প্রবেশদ্বারের খিলানে খোদাই করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে 'নিজেকে জানো' প্রবচনটি। প্রাচীন গ্রিসে ডেলফির মন্দিরের উপত্যকাটি অতি পবিত্র স্থান হিসেবে পরিগণিত হত।

সায়ীদ স্যার বাংলামটরের কাছে ছায়াঢাকা নিরিবিলি এক স্থানে 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করে যেন ডেলফির মন্দিরের খিলানে উৎকীর্ণ প্রবচন 'নিজেকে জানো'র কার্যক্রম শুরু করলেন। তিনি গভীর মমতায় অন্বেষণ করছেন আলোর পথের অভিযাত্রীদের। কেন্দ্রের প্রসন্ন পরিবেশে গিয়ে এই বোধ জাগ্রত হয়— আমার মুক্তি আলোয় আলোয় ...।

সায়ীদ স্যার প্রাচীন গ্রিক প্রবচন 'নিজেকে জানো'র ব্যাখ্যা আমাদের কাছে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করলেন। কঠিন বিষয়বস্তুকে রসগ্রাহী করে প্রকাশ করার এক দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তাধীন। তিনি স্বচ্ছভাবে বুঝিয়ে দিলেন মানুষের আদর্শিক স্বভাব, আচরণ, নৈতিক মান এবং চিন্তার বিস্তৃতিকে গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করার ভাবাদর্শ হচ্ছে প্রবচনটির সূত্রের পরিপ্রেক্ষিত। কারণ নিজেকে বুঝতে পারা কিংবা নিজেকে জানার ঐকান্তিক প্রয়াসের অর্থ হল অন্য মানুষকে জানা ও বোঝা। অন্য মানুষের নীতিবোধ, অভ্যেস, প্রকৃতি, ক্ষোভ দমনের ক্ষমতাসহ একটি মানুষের অন্যান্য মানবিক গুণাবলি ও দোষাবলি দেখে, শুনে, জেনে নিয়ে বুঝে ওঠা। হৃদয়ঙ্গম করা। অন্যকে পর্যবেক্ষণ করার পূর্বে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। নিজের পর্যবেক্ষণের সাথে অন্যকে পর্যবেক্ষণ করার তুলনামূলক ফলাফলই নিজের মূল্যায়ন করবে।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সুসম্পাদনায় প্রকাশিত সাহিত্যপত্র *কণ্ঠস্বর* মননের ক্ষেত্রকে অবিরাম সমৃদ্ধ করতে লাগল। মেধার চর্চাকে গুরুত্ব দেন তিনি। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আল মনসুরের (বেলাল) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিনি। সেই সুবাদে তাঁদের উত্তর শাহজাহানপুরের বাসায় যাই। সেখানে আবিষ্কার করি আরেক গভীর প্রজ্ঞাবান মানুষ আবদুল মান্নান সৈয়দকে। যিনি অশোক সৈয়দ নামে *কণ্ঠস্বর*-এ 'কালো সূর্যের নিচে বহ্ন্যুৎসব' প্রবন্ধ রচনা করে সাহিত্যের এক নতুন আঙ্গিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আবদুল মান্নান সৈয়দকে তাঁর সূচনালগ্নেই যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছিলেন *কণ্ঠস্বর* সম্পাদক। শহীদুর রহমানের *বিড়াল* গল্পটি নিজের পত্রিকায় প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছিলেন পাকা জহুরি তিনি। ঢাকা কলেজের মেধাবী ছাত্র খান মোহাম্মদ ফারাবীর মাঝে অফুরন্ত সম্ভাবনাকে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। আমাদের বলতেন, ফারাবী অত্যন্ত প্রতিভাবান। তার হাতে বাংলা মননশীল প্রবন্ধ শাখা সমৃদ্ধ হবে। ফারাবীর অকাল প্রয়াণ তাঁকে যথেষ্ট ব্যথিত করেছিল। তিনি যেন রবিঠাকুরের কবিতার সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ন্যাসী ঠাকুরের মতো যে ক্ষ্যাপা হয়ে পরশ পাথরের অনুসন্ধান করছেন ব্যাকুল চিত্তে।

আমার কাছে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এক প্রথাবিরোধী দুঃসাহসী মানুষ। তিনি সে সময় চমকে যাবার মতো প্রবন্ধপুস্তক *দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ* লিখে আমাদের চিন্তা-চেতনার জগতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন। আমি সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকতাম তাঁর বক্তব্য শ্রবণের জন্য। যা উচ্চারিত হত স্বাদু ভাষায়। তিনি বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারতেন। জীবনের গভীর অনুচিন্তনের দিকগুলোকে অতি প্রসন্নভাবে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের তিল তিল স্বপ্ন আর একনিষ্ঠ শ্রমে গড়ে তোলা 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে'র মহতী কার্যধারায় সম্পৃক্ত হয়ে 'আমার আমি'কে খুঁজে পেলাম। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আমার ধূসর, ফ্যাকাসে, মলিন, বিবর্ণ জীবনটাকে অপরূপভাবে বদলে দিল কেন্দ্র।

তাঁর নির্বাচিত গ্রন্থাবলি পাঠ করে সুসমাচারের সন্ধান পেলাম। কেন্দ্রের রূপরেখাটি তিনি সবিস্তারে তুলে ধরেছিলেন আমাদের সামনে। অনুভবশক্তি তীব্রতর হল। শুভ-অশুভের বিভাজনটাকে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারলাম। কেন্দ্র অনিবার্যভাবে আমার কাছে হয়ে উঠল স্বপ্নযাত্রার আহ্বান।

তিনি সেই আহ্বানকে সঞ্চারিত করলেন।

'এসো, নিজেকে সাহিত্যের স্পর্শে আলোকিত করে তোল। গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ কর চিরায়ত সাহিত্যকে'।

আমাদের মগ্ন চৈতন্যে শিসের মতো বেজে উঠলেন তিনি। ধ্রুপদী সাহিত্যের দুরূহ জটিলতার ভাঁজগুলো খুলে দিলেন তাঁর স্বাদু উপস্থাপনায়। তাঁর সান্নিধ্যে, কথোপকথনে, চিন্তায় এক আশ্চর্য, সুন্দর ভুবনের সাথে পরিচিত হলাম।

তোমার জীবন্ত জ্বলন্ত অঙ্গারে আমি সময় ছাড়িয়ে মুগ্ধ/ ছাইমাখা চোখের পাতা ছাড়িয়ে তোমার সংগীতের প্রতি/ আমাদের অতীত বছরের হাত ও শ্রদ্ধা বাড়িয়েছি/

.... অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে তুমি ফিরে আসবে/ সূর্য ডুবে গেলে ম্লান রাত্রি যখন ভর করে বাড়ির ছাদে/ খেলোয়াড়েরা যখন বরের বেশে যৌবন দেখায়/ সেই কি তোমার ফিরে আসার চিহ্ন?

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একটি আন্দোলনের জন্ম দিলেন। তাঁর চিন্তাপ্রসূত আন্দোলনটি হল 'আলোকিত মানুষ চাই'। গ্রন্থপাঠ কর্মসূচির মাধ্যমে এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। তিনি যেন শামান পুরোহিতের মতো ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিশক্তিকে নিবদ্ধ করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টি. এস. এলিয়ট তাঁর *ওয়েস্টল্যান্ড* কাব্যগ্রন্থের শেষে বন্ধ্যা জমিতে বৃষ্টিপাতের আশা ব্যক্ত করেছিলেন।

দূরদর্শী সায়ীদ স্যার অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বই পড়ার আন্দোলনকে দেশের প্রতি প্রান্তরে ছড়িয়ে না দিলে জাতি মেধাশূন্যতার ভয়াবহ এক খাদে পতিত হবে। নির্বাপিত হবে আলোকশিখা। ঘোর তমিস্রায় ঢাকা পড়বে জনপদসমূহ। সেটা হবে বিধ্বস্ত জনপদ। মূর্খতার চরম খেসারত দিতে গিয়ে জাতি মানসিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাবে। সেটাই কি হবে পৃথিবীর গভীরতর অসুখের কাল?

সেই ভয়াবহ অবস্থার কথা ভেবে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁর হৃদয় হল ক্ষতবিক্ষত। এর নিরসনকল্পে তিনি কঠোর অনুশাসনে কল্যাণব্রত গ্রহণ করলেন। বই পড়ার আন্দোলন।

একক প্রয়াসে বৈরী পরিবেশে গড়ে তুললেন 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র'।

তাঁর এই আন্দোলন এখন বিশ্বে স্বীকৃত। এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। কেন্দ্র হয়ে উঠল বাতিঘরের মতো। তারুণ্যের স্পৃহায় তিনি কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মসূচিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুললেন। সাংগঠনিক দক্ষতায় অতুলনীয় মাত্রা যোগ করলেন। তাঁর এক শুভকর কর্মপ্রয়াস জাতিকে আশান্বিত করে তুলল।

আমিও গভীর মমতার সাথে মিশে গেলাম সেই আন্দোলনের সাথে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটে গেছি গ্রন্থপাঠের উপযোগিতা বোঝাতে।

এই মহতী কর্মসূচিতে জড়িয়ে গেল একঝাঁক নিষ্ঠাবান তরুণ।

সায়ীদ স্যারকে দীর্ঘদিন ধরে কাছ থেকে দেখে আমার এমত বিশ্বাস হয়েছে যে, তাঁর পরিকল্পিত সৃষ্টি 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' দেশের প্রধান আলোকবর্তিকা। অন্ধকার এতে দূরীভূত হবেই। তিনি প্রবলভাবে আত্মপ্রত্যয়ী। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁকে কখনও বিপর্যস্ত করতে পারে না। তিনি ভালো করেই জানেন কতটা দুর্গম পথ তাঁকে অতিক্রম করতে হবে। পেরুতে হবে দুস্তর উপত্যকা। বিরোধিতা তাঁকে অসহায় করতে পারে না। তিনি জানেন, সামনের পথ কখনও মসৃণ থাকবে না।

কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হননি তিনি। তাঁকে দেখে বিশ্বাস জাগে— যিনি যত বেশি জীবনসন্ধানী, তিনি ততো বেশি অভিজ্ঞ। যিনি যত বেশি অভিজ্ঞ, তিনি ততো বেশি সংবেদনশীল। যিনি যত বেশি সংবেদনশীল, তিনি ততো বেশি আলোকিত। এই আলোকিত করার গূঢ় তত্ত্ব হচ্ছে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করার নিজস্ব ভঙ্গি।

আমাদের উদ্যম-উদ্যোগকে সুসংগঠিত করলেন তিনি। ইচ্ছেকে পরিণত করলেন কাজে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের একজন কর্মী হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আলোকিত মানুষ' গড়ার আন্দোলনে সম্পৃক্ত থেকেছি। জীবনে সুন্দর ও অর্থপূর্ণভাবে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। গ্লানি জড়তা অবসাদ বিমর্ষতা হতাশা কাটিয়ে মুক্তি পেয়েছি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আমার কাছে অলোকিত প্রান্তর। আমি এখানে এসে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সামনে নমিত হয়ে গাঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করতে চাই— আমার মুক্তি আলোয় আলোয় ...। কেন্দ্র আমার নিকট অনিবার্যভাবে হয়ে উঠেছে তীর্থস্থান। পুণ্যভূমি।

২০১৪

আলী ইমাম : শিশুসাহিত্যিক ও টিভিব্যক্তিত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

আলোর যাত্রী

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে দেশের মানুষ জানে একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে। অনেক বছর থেকে তিনি বইপড়ার সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছেন, সারা দেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী তৈরি করেছেন যারা বই পড়ে নিজেরা আলো পেয়েছেন, অন্যদেরকেও আলো জ্বেলে পথ দেখাচ্ছেন। এই শিক্ষার্থীরা সবাই যে ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এসে বই পড়েছেন, তা নয়, এদের অনেকেই অবস্থান করেছেন ঢাকার বাইরে। কিন্তু কোনো না কোনো কর্মসূচির মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছেন বই পড়ার কর্মযজ্ঞের সঙ্গে। বই যে মনোজগতে বিশাল এক গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে, বদলে দিতে পারে একজন পাঠকের চিন্তাভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার কল্পনাকে সৃষ্টিশীলতার স্পর্শে সঞ্জীবিত করতে পারে, এ বিষয়টি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ক্রমাগত বলে আসছেন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, তাঁর কথাগুলো তরুণরা শুনছে, এবং অনুসরণ করছে। ফলে একদিকে এই শিক্ষার্থীরা যেমন উপকৃত হচ্ছে, অন্যদিকে সমাজকেও নানাভাবে বদলে দিচ্ছে। এই বদলে দেয়াটা বৈপ্লবিক কিছু নয়; খুব জোরেশোরে তা হচ্ছে তা নয়, বরং খুব নীরবে তা ঘটছে। অনেক আওয়াজ দিয়ে, হৈ চৈ করে যেসব বদলের ঘটনা শুরু হয়, আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, সেগুলো খুব বেশিদূর এগোয় না। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভিত্তিক বই পড়ার আন্দোলনটি তার অভিঘাত রাখছে নীরবেই, কিন্তু প্রবলভাবে। এটি এক অর্থে বৈপ্লবিকই, যদিও এক দীর্ঘমেয়াদি অর্থে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে আমি সায়ীদ ভাই হিসেবেই জানি, সেভাবেই তাঁকে আমি সম্বোধন করি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁকে যেভাবে দেখছে দেশের মানুষ, তাতে তাঁর 'আলোকিত' অভিধাটি, সারা দেশে জ্ঞানের আলো জ্বালানোর তাঁর প্রত্যয়ী উদ্যোগটি সর্বাগ্রে চলে আসে। শুধু চলে আসে, তা নয়, তাঁর অন্যান্য পরিচয়কে তা কিছুটা যেন আড়ালে ফেলে দেয়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে তিনি যে কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করেন, তার সঙ্গে তাঁর শিক্ষক সত্তার একটি গভীর সংযোগ আছে। তাঁর এই শিক্ষক পরিচয়টি আসলেই তাঁর একটি বড় পরিচয়। একটি প্রচলিত সংজ্ঞায় একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে : তিনি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা দেন, পথ দেখান। তাঁর ক্লাশ করার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু শুনেছি, তিনি ক্লাশে পাঠ্যবইয়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেতেন সব সময়। তাঁর ক্লাশ, তাঁর এক ছাত্রের ভাষায়, ছিল 'জাদুর ক্লাশ', অর্থাৎ কথা দিয়ে, হাস্যকৌতুক দিয়ে তিনি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতেন শ্রেণিকক্ষে, যে শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের জগতে এক আনন্দভ্রমণে বেরোতেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে তিনি তাঁর এই আনন্দভ্রমণে নাটক চলচ্চিত্র চিত্রকলা— এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে পঠনপাঠন এবং আলোচনা হয় না আর ছেলেমেয়েরা উৎসাহ নিয়ে এসব বিষয়ে প্রবেশ করে না। তিনি যে শিক্ষক, তা কেন্দ্রে পা রাখলেই বোঝা যায়, এবং সে আদর্শ মেনে এবং নিজের মতো করে তৈরি করে তিনি শিক্ষকতা করেছেন, তারই প্রয়োগ তিনি কেন্দ্রে করেছেন। তিনি চান, শিক্ষার্থীরা, তাঁর মতোই আলোর পথের যাত্রী হোক, আনন্দিত আলোর যাত্রী হোক।

কিন্তু এ দুই পরিচয়ের বাইরেও সায়ীদ ভাইয়ের আরো পরিচয় আছে। তিনি যে টেলিভিশনের একজন সফল উপস্থাপক ছিলেন, তা অবশ্য অনেকেই জানেন। তাঁর অনুষ্ঠান মানেই মনের দিগন্তটা আরেকটু প্রসারিত হওয়া, আনন্দভ্রমণটা টেলিভিশনের পর্দায় উঠে আসা, এবং পরিশুদ্ধ এবং রুচিশীল এক বিনোদনের স্বাদ নেয়া। আমাকে অবাক করে তিনি একদিন বলেছিলেন, তিনি টেলিভিশনে যা যা বলবেন অর্থাৎ তাঁর উপস্থাপনার আদ্যোপান্ত তিনি আগেভাগেই মুখস্থ করে নেন। কথাটা তিনি যে কৌতুক করে বলেছিলেন, তা নয়, কিন্তু এর সবটা যে সঠিক ছিল, তা-ও আমার মনে হয়নি। কিন্তু একটি বিষয় তাঁর এই স্বীকারোক্তি তুলে ধরে : প্রতিটি অনুষ্ঠানকে তিনি কতখানি গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন। একটি অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ আগেই ভেবে নেয়া প্রতিটি কথাকে গুরুত্বের সঙ্গে সাজিয়ে নেয়া? এই প্রস্তুতি প্রমাণ করে তাঁর নিষ্ঠা ও দক্ষতার বিষয়টি। তবে একথাটাও এখানে বলা আবশ্যক— একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায়ও তাঁকে যে কোনো বিষয়ের ওপর চমৎকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং মনোগ্রাহী কথা বলতে আরেকবার শুনেছি। তাঁকে আমি দেখি একজন ভাষার কারিগর হিসেবে। সবচেয়ে বাঙ্ময়, অর্থপূর্ণ এবং যথাযথ ভাষা প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত। এর সঙ্গে যোগ হয় তাঁর অননুকরণীয় রসবোধ। ইংরেজিতে যাকে wit বলে, যার বাংলা হতে পারে বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ, তা আছে তাঁর অনায়াস দখলে। এজন্য শিক্ষাবিষয়ক কোনো সেমিনার হোক, নদী দূষণবিষয়ক কোনো গোলটেবিল হোক, তিনি যখন কথা বলেন, সবচেয়ে নিরুৎসাহী শ্রোতাটিও মন দিয়ে শোনেন এবং উৎসাহ পান।

নদী দূষণের প্রসঙ্গে সায়ীদ ভাইয়ের আরেকটি পরিচয় সম্পর্কে বলা যাক। তিনি তাঁর কর্মজীবনের শুরু থেকেই 'প্রকৃতি বাঁচাও' আন্দোলনটি তাঁর নিজের মতো করে শুরু করেছেন। একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি তরুণদের শুধু বর্তমান নিয়ে ভাবিত নন, ভাবিত তাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও। এক আলোচনা সভায় তিনি বলেছিলেন— এবং কথাটি এখনও কানে লেগে আছে— যদি সন্তানেরা সুন্দর একটা প্রকৃতিই না পেল তাহলে তাদের বই পড়ে কী হবে? অর্থাৎ প্রকৃতি যদি দূষিত হতে হতে দেশটাকে অবাসযোগ্য করে তোলে তাহলে সেখানে মানুষ বাঁচবে কী করে? আর বাঁচাটাই যদি একটা প্রশ্নের সামনে পড়ে যায়, তাহলে সুকুমার বৃত্তির চর্চা কতদূর হতে পারে?

সায়ীদ ভাই প্রকৃতি নিয়ে ভাবেন আরেকটি কারণে। তিনি বলেন প্রকৃতিটা সবুজ না থাকলে মাটি থেকে রঙ চলে যাবে। কবিতা উধাও হবে। তিনি যে কবি, এ কথাটি এই উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায়। বস্তুত তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের অর্ধেক শিরোনাম 'চিরহরিৎ'। *মৃত্যুময় ও চিরহরিৎ* (১৯৮৮) তাঁর বাস্তববাদী ও রোমান্টিক মেজাজের এক চমৎকার প্রতিফলন। কবি হিসেবে তিনি আধুনিকতার প্রকাশগুলোকে আত্মস্থ করেছেন। এর শৈলীগত নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, কিন্তু তাঁর কবিতায় মানুষ ও প্রকৃতি, বাস্তবতা ও কল্পনার একটি চমৎকার ভারসাম্য তৈরি করেছেন। তাঁর কবি-পরিচিতিটা প্রায় অনেকটাই আড়ালে চলে গেছে। অথচ তিনি ষাটের দশকের তীব্র জীবনবোধ, আধুনিক মনস্কতা, সময়কে ছাড়িয়ে যাওয়া এবং ইতিহাসকে নতুন বাস্তবতার আলোকে দেখার বিষয়গুলো নিজের মধ্যে ধারণ করতেন। তাঁর কবিতায় জীবনবোধ তীব্র এবং গভীর; তিনি আধুনিকমনস্ক, কিন্তু ঐতিহ্যের অনুবর্তী। তাঁর চিন্তার কেন্দ্রে মানুষ ও প্রকৃতি। মানুষকে তিনি দেখেছেন কোনো নির্মোহ জীবনদৃষ্টি দিয়ে নয়, মমত্ব দিয়ে। সেজন্য তাঁর কবিতায় বোধের প্রকাশ কোনো খণ্ডিত চিন্তাকে প্রতিফলিত করে না, করে সামগ্রিক জীবনকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সায়ীদ ভাই গল্প লিখেছেন। *রোদনরূপসী* নামে তাঁর যে গল্পগ্রন্থটি বেরোয় ১৯৯৬ সালে, তা তাঁকে কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে পারত, কিন্তু সায়ীদ ভাই কেন জানি গল্প থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। যেন গল্প লিখেছেন নিজের আনন্দের জন্য, এখন অন্য কাজে আনন্দ পাবার সময় এসেছে। *রোদনরূপসী* ছিল শহরের মানুষ মধ্যবিত্ত, আকাশচারী, নানান মানুষের জীবনের কড়চা। সায়ীদ ভাই কুশলী গল্পকার, কিন্তু গল্পে তিনি সময় দিলেন না।

তিনি বরং সময় দিলেন সম্পাদনায়। তাঁর সম্পাদিত *কণ্ঠস্বর* ছোট কাগজের ভুবনে ছিল এক আলোকবর্তিকা। এত সমৃদ্ধ সাহিত্যপত্র, *সমকাল*-এর পর, আর দেখিনি আমরা। *কণ্ঠস্বর* শুধু প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কাগজ ছিল না। ছিল নবীন লেখকদের এক বড় আশ্রয়। আমি একে বলতাম লেখক তৈরির স্কুল। সায়ীদ ভাই সম্পাদনার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতেন, অথচ নবীনদেরও সহ্য করতেন। ফলে তাদের কাজেও মানের দাবিটা প্রতিফলিত হত। কে না লিখতেন *কণ্ঠস্বর*-এ? এই কাগজে একটি লেখা বের হওয়ার অর্থ ছিল সাহিত্যসমাজে একটা কূল পেয়ে যাওয়া।

সায়ীদ ভাই স্মৃতিকথা লিখেছেন, যেগুলো এক ধরনের কথোপকথনও বটে—প্রধানত তাঁর নিজের সঙ্গে, পরিপার্শ্বের সঙ্গে। ইতিহাসের সঙ্গে। *বিদায়, অবন্তী*! থেকে নিয়ে *ভালোবাসার সাম্পান* তাঁর অসংখ্য কথোপকথনের এক মালা।

সায়ীদ ভাই পঁচাত্তরে পা রাখছেন, কিন্তু তাঁর চালচলনে, কাজেকর্মে এবং চিন্তাভাবনায় তারুণ্য চিরজাগ্রত। এই চিরতরুণ মানুষটি দীর্ঘায়ু হোন, তাঁর তারুণ্যে সঞ্জীবিত করুন আমাদের সমাজকে, এই আশাবাদ দেশের লক্ষ মানুষের।

২০১৪

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম : সাহিত্যিক
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেন জিল্লুর রহমান

আমাদের নৈতিক লড়াইয়ের অগ্রপথিক

প্রফেসর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আমার শিক্ষক ছিলেন না। শিক্ষাজীবন বা শিক্ষা-উত্তর কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়েও তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত আলাপচারিতার কোনো সুযোগ বা ঘটনা ঘটেনি। তবে একজন আকর্ষণীয় ও ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমার ছিল। আশির দশকের শেষদিকে একদিন তিনি আগারগাঁওস্থ বিআইডিএস-এ আমার অফিসে উপস্থিত হন, তাঁর নতুন একটি ধারণা বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ একটি সহায়তা চাইতে। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির ধারণা বাস্তবায়নের জন্য দাতা-সংস্থাদের কাছে একটি প্রোপোজাল বা প্রস্তাব পেশ করার প্রয়োজন ছিল। আমার সৌভাগ্য যে, আমার সাথে কোনো পূর্ব-পরিচিতি না থাকা সত্ত্বেও এই কাজটির জন্য তিনি আমার সাথে আলাপ করতে আসেন। অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর শেষ পর্যন্ত নরওয়ে দূতাবাস প্রথম ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির ধারণা বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা দিতে এগিয়ে আসে। সময়ের পরম্পরায় ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি আজ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অন্যতম সফল কর্মকাণ্ড।

সেই যে আলাপের সূত্রপাত, তখন থেকে প্রফেসর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সাথে এক ধরনের সংযোগ আমার হয়েছে, যেখানে নিয়মিত ঘনিষ্ঠতার বাস্তবতা নেই বটে, তবে সংকটময় সময়ে ও জাতির বৃহত্তর বিষয়াদিতে তাঁকে অত্যন্ত নিকটের মানুষ হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি।

নব্বই দশকের প্রথমার্ধে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সাথে যোগাযোগ প্রায় নিয়মিতই ছিল। আমার কর্মকাণ্ড প্রধানত অর্থনৈতিক গবেষণাকে ঘিরে হলেও এসব গবেষণার বৃহত্তর সামাজিক উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়টিতে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতাম। ১৯৯৬ সালে যখন পিপিআরসি নামে একটি নতুন গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরির উদ্যোগ নিই, যৌক্তিকভাবেই তখন প্রফেসর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এবং কবি ও লেখক আহমেদ ছফা পিপিআরসির প্রথম ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আমার শ্রদ্ধার মানুষদের অন্যতম একজন। এর অনেক কারণ আছে। অর্থনীতিবিদ হলেও আমার পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিল ঔপনিবেশিক শাসন কীভাবে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজবিষয়ক চিন্তা ও ধারণাকে প্রভাবিত করেছে, তার স্বরূপ আবিষ্কার করা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শুধু কেরানি তৈরিতে তৎপর ছিল না, এই ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম প্রভাব ছিল এমন ধারণা প্রতিষ্ঠা করা— যেখানে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের অবস্থানই মুখ্য ও সামাজিক শক্তির অবস্থান চিরায়তভাবে গৌণ। বহু দশক আগে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটলেও রাষ্ট্র ও সমাজের আন্তঃসম্পর্কীয় এই ধারণাই আঁকড়ে ধরে আছেন ঔপনিবেশিকোত্তর দেশীয় শাসকগোষ্ঠীরা। সামাজিক শক্তির গৌণ অবস্থানের এই ঔপনিবেশিক ধারণার বিপরীতেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের অবস্থান এবং এজন্যই তিনি আমার শ্রদ্ধার পাত্র।

সমাজ শুধু কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও পরিকল্পনামাফিক এগোবে— এ বাস্তবতার বাইরে সামাজিক শক্তির কর্মকাণ্ডকে একটি মর্যাদাপূর্ণ ও চালিকাশক্তির জায়গায় প্রতিষ্ঠা করার মতো দুরূহ চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নের জন্যই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের বহুমুখী কর্মকাণ্ড। তিনি যথার্থই ধরেছেন আজকের প্রধান আয়োজন আলোকিত মানুষের। কিন্তু এই আলোকিত মানুষ উন্নাসিক এলিট নয়। আলোকিত হওয়ার মূল কথাই হচ্ছে সমৃদ্ধ মূল্যবোধের কথা, কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের সম্মুখে নতজানু না হওয়ার সাহসিকতার কথা, মর্যাদার একটি অর্থবহ ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার কথা।

আমাদের অনেক কিছুই এগোয় না ভণ্ডামির কারণে। ভণ্ডামি শুধু কথা ও কাজের ফারাকের ব্যাপার নয়; সুবিধার গন্ধ পেয়েই নৈতিক অবস্থানের ত্বরিৎ বিসর্জন, করে দেখাবার ঝুঁকি নেওয়ার সাহসের পরিবর্তে অকর্মণ্য ভালো কথায় ডুবে থাকা— এগুলো ভণ্ডামির আরও মারাত্মক রূপ। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ শ্রদ্ধার পাত্র এজন্যই যে, বাঙালি মধ্যবিত্ত যেখানে প্রতিনিয়ত এই বহুমুখী ভণ্ডামির পিচ্ছিল পথে গন্তব্য থেকে ছিটকে পড়ছে, সেখানে তিনি কিছু মৌলিক কাজ নিয়ে এক নিরলস প্রচেষ্টা ও সফল কর্মযজ্ঞ জাগ্রত রেখেছেন। এক বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জন্যই তিনি শত শত অভিনন্দন পাওয়ার দাবিদার। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে তাঁর অবস্থান আরও ঊর্ধ্বে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণ তাঁর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মূল সুরটি হচ্ছে অন্যায় ও ভণ্ডামির বিপরীতে নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই। এই লড়াই আজকের বাংলাদেশের অন্যতম প্রয়োজনীয় লড়াই। এবং এই লড়াইয়েরই একজন অগ্রনায়ক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তাঁর দীর্ঘায়ু ও উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

২০১৪

হোসেন জিল্লুর রহমান : অর্থনীতিবিদ
সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

খায়রুল আলম সবুজ

যে জন্ম জন্মান্তরের

বর্তমান সময়ে বোধকরি ধরিত্রীমাতা আর সুসন্তান প্রসব করছেন না।

গোটা জগৎজুড়ে কেমন একটা গেল গেল রব উঠেছে। যে মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু— এই পথটা সরল রেখায় চ'লে নিরিবিলি পার করে দিতে চান অথবা যারা স্বাভাবিক নিরাপত্তার মধ্যে থেকে জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবতে চান, তারা একটু বেকায়দায় পড়েছেন; বুঝতে পারছেন না কী করবেন। বাইরের সঙ্গে অন্তরের ঐকান্তিক চাওয়াটা কোনোমতেই যেন মিলছে না; মেলাতে পারছেন না। কোথায় একটা গোল বেধেছে; একটা অনাকাঙ্ক্ষিত অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে মানুষ ঘাবড়ে যাচ্ছে। খাবি খাচ্ছে। কী করা যায় সত্যি বুঝতে পারছে না। একটা নির্বোধ প্রতিযোগিতায় পড়ে শিক্ষাদীক্ষা কোনোকিছু আর যথার্থ কাজ করছে না। আমাদের দেশের কথাই যদি ভাবি তাহলে এ কথা সহজেই বলা যায় যে, 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আজ আর আলোকিত, চিন্তাশীল, উদার এবং দার্শনিক দৃষ্টিসম্পন্ন উচ্চায়ত মানুষদের জন্ম দিতে পারছে না।'

একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় যে, অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ জিনিসই এখন এই কালে বড় হয়ে উঠেছে। আর সেই তুচ্ছকে পাওয়ার জন্যে মানুষ অতুল্য মহামূল্যবানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে। যে বোধে সমৃদ্ধ হয়ে মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃত মানুষে রূপান্তরিত হয়, তাকেই নিছক অপ্রয়োজনীয় বলে অবজ্ঞা করছে, অবহেলা করছে। ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। নগদ অর্থে তারা অমূল্যের মূল্য নির্ধারণ করছে।

আর নগদ অর্থ তো এখন এ জগতের প্রভু। এই প্রভুর সামান্য কৃপা পাবার জন্য মানব-জন্মের মতো বিরল প্রাপ্তি ছুড়ে ফেলে প্রায় প্রতিটি মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে ছুটছে। প্রতিটি জীবন যে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর দিকে গড়ায়, একদিন যে সব ছেড়েছুড়ে চিহ্নহীন হয়ে সরে যেতে হয় 'অন্য কোথা অন্য কোনো খানে' এই ধ্রুব সত্যকেও মানুষ এখন বুঝি আর মনে রাখে না। লোভ-লালসা হিংসা-দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা ছল-চাতুরী চুরি-জোচ্চুরি ঠগবাজি খুনোখুনি সন্ত্রাস রক্তারক্তি বিশ্বাসহীনতা সর্বোপরি মিথ্যার বেসাতি— এ সবই যেন এই যুগের চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরাণে বর্ণিত কলিকালের লক্ষণগুলো কি দিন দিন পরিষ্কার হচ্ছে নাকি? এমন প্রশ্নও মাঝে-মধ্যে মনে আসে। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ রকম সময় এ জগতে বারবারই এসেছে। মাৎস্যন্যায়— অরাজকতা, মানুষে মানুষে হানাহানি অবিশ্বাস— এসেছে এবং চলেও গেছে। এসেছে তার কারণ, অন্তর্লোকে যেখানে প্রকৃত মানুষের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা, সেখানে কিছু গোলযোগ— সেখানে কিছু একটার ঘাটতি পড়েছিল। শুভবোধ, মঙ্গলময় পবিত্রতা নিঃশেষে উধাও হয়েছে; অনুসরণযোগ্য আদর্শের আলো নিভে গিয়ে সেখানে নেমে এসেছিল তমোদ্দীপক ঘোরতর দুর্দিন। পরিত্রাণহীন ঘূর্ণাবর্তে পতিত হয়ে মানুষ দিশা হারিয়েছে, চিৎকার করেছে, রক্তাক্ত হয়েছে; অকূলার্ণবে ডুবতে ডুবতে কূলের জন্য ব্যাকুল হয়েছে: আর চলে গেছে তার কারণ, কেউ একজন সেই দুর্দিন দূর করতে এসেছিল— আলো হাতে।

প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম রাত আর দিন; আলো এবং অন্ধকার। এই আলো-অন্ধকারই জীবনের মূল সংঘাত। স্বত্বঃ আর তমঃ। এই টাগ অব ওয়ার একবার এদিকে টানে একবার ওদিকে এবং এই অনিবার্য টানেই জীবন বহমান। সুতরাং মানবজীবনে অন্ধকার আসাটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় যেমন, তেমনই অন্ধকার দূর করতে আলো হাতে কারো আবির্ভাবও কোনো অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। অন্ধকারে নিমজ্জমান মানুষ আলোই প্রার্থনা করে। তারা অপেক্ষা করে— কেউ একজন পথ দেখাবে বলে তারা আশায় আশায় থাকে। 'দিবস রজনী' সেই আশা অন্তর্লোকে ঘুরপাক খায়। দিশেহারা অসহায় মানুষের আশা একদিন অনিবার্যভাবে পূর্ণও হয়; ঈপ্সিত সেই মানুষ আসে, পথ খুলে যায়। তারপর কিছুদিন সুবাতাস বয়ে যায় সমাজে, রাষ্ট্রে, ব্যক্তি-মানুষের জীবনে। ক্রমশ আবার হয়তো নেমে আসে অন্ধকার, আবার প্রয়োজন পড়ে আলোকবর্তিকা হাতে কারো এগিয়ে আসার; এইতো চলে, এইতো চলছে আবহমান কাল ধরে। সুতরাং বর্তমান কালের মানুষের জীবন যে এই নিয়মচক্রের বাইরে থাকবে তাই-বা কী করে হয়! ভালো মন্দের এ দুটি ধারা চিরকাল নিকটআত্মীয়ের মতো পাশাপাশিই চলেছে এবং চলছে। তারপরও, সত্য সুন্দর কল্যাণই মানুষের আরাধ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো, আরও একটু ভালো— কল্যাণকামী আলোকিত বিরল মানুষেরা এই-ই চেয়েছেন তাঁদের সমসময়ে— সমষ্টির জন্য। নিজেকে ভুলে এই উদ্দেশ্যেই জীবনের গোটা সময় ব্যয় করেছেন। কী পাবেন বা কী পেয়েছেন সে হিসাব করেননি। নিকটঅতীতে আমাদের এই বাংলার মাটিতেই সে রকম মনীষীর জন্ম খুব কম হয়নি। আমাদের সমসময়ে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মনে হয় এই ধারারই একজন উজ্জ্বল মানুষ।

তিনি বিশ্বাস করেন সমষ্টির সুখশান্তিময় জীবনে, সুশিক্ষিত পরিমার্জিত মানুষে, বিশ্বাস করেন ঋদ্ধ সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে। তিনি যখন বলেন, 'আজ আমার জাতির আগামী বংশধরদের সুখের প্রশ্ন আমাকে কোটি কোটি বিষাক্ত ডাঁশের মতো কামড়ে ধরেছে। ... বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তোলার এই ছোট্ট তুচ্ছ অবজ্ঞেয় বিষয়টা আজ আমার কাছে সারা দেশের মানুষের সমস্ত সম্মান সংবর্ধনা আর শ্রদ্ধাঞ্জলির চেয়ে অনেক বড়— ব্যক্তিগত মহিমাকামিতার সমস্ত লালসার চেয়ে অনেক মূল্যবান। .... আমার জাতির ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠায় সব কষ্ট শ্রম অপমান আমি সহ্য করেছি। ... আমাদের সব চেষ্টা যত্ন শ্রম চিরায়ত বাংলাদেশের জন্যে। আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র একদিন সমগ্র বাংলাদেশ হবে'— তখন বলে দিতে হয় না এ কোনো রাজনীতিবিদের ভাষা নয়, এ ভাষা সত্য উপলব্ধির অশ্রুমাখা, শোণিতাক্ত ভাষা— এ ভাষা তাঁর যিনি প্রয়োজনে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ জন্ম গড়পড়তা জন্ম নয়, বর্তমান সময়কে তাড়িয়ে গড়িয়ে সুশীল মানবিক উন্নতির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার জন্যই যুগে যুগে হয় এমন জন্ম ।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে : An ounce of practice is more than a ton of talks— কাজে বিশ্বাসী মানুষের কথাই বটে। গত পঁয়ত্রিশটি বছর ধরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মুখে কিছু না বলে কাজই করেছে। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'প্রথম থেকেই টের পেয়েছিলাম এ দেশে ভালো কিছু করতে হলে করতে হবে অজান্তে, অলক্ষে'। আজ পঁয়ত্রিশ বছর পরে কিছুটা জানাজানি হলেও সবার কাছে যে সুস্পষ্ট কেন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তা আমার মনে হয় না। তাতে অবশ্য ক্ষতি নেই।

এমন কাজের খবর গড়পড়তা মানুষ কমই রাখে; তা ছাড়া অন্তরলোকে আলো এসে থিতু হতে সময় নেয়। সে আলো অন্তরে স্থায়ী হওয়ার প্রক্রিয়াটাও যে কঠিন তাতে সন্দেহ নেই। অথচ প্রকৃত এবং প্রয়োজনীয় মানুষ হতে গেলে এই কঠিনেরে ভালো না বেসে যে উপায় নেই। আমাদের জন্য সেটাই এই মুহূর্তের জরুরি কাজ; এটার গুরুত্বই বুঝতে হবে সবার আগে। আলো ভিতরে এলে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবেই তো ছড়িয়ে পড়বে বাইরে, তবেই তো আলোকিত হবে চারপাশ, একটা সময় একটা দেশ একটা জাতি।

মানুষ যা কিছুই করে তার চিন্তাটা প্রথমেই আসে তার মনে, তারপর কাজের প্রশ্ন আসে। আমরা শুধু কাজটাকে দেখি কারণ সেটা দৃশ্যমান কিন্তু কাজের উৎসলোক যে মন তাকে চোখে পড়ে না এবং গুরুত্বহীন মনে করে খুঁজিও না। অন্তরলোকে জেগে ওঠা আলোকিত এবং বিকশিত একজন মানুষ যেভাবে যে চিন্তায় কাজ করে ঘুমন্ত অথবা আধোজাগা একজন সে কাজ সেভাবে করতে পারে না— এটাই সত্য, এটাই স্বাভাবিক। মনের গঠন গড়ন এবং অবিরাম চর্চা পরিশ্রম ত্যাগ ও আত্মবঞ্চনায় নির্মিত যে মনমাপ সেই মাপই নির্ধারণ করে ব্যক্তিমানুষের মাপ এবং যে যার মাপ মতোই কাজ করে; এর বাইরে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ছোট মাপের মানুষ বড় কোনো কাজ করতে পারে না। যেটা তার ধারণ করার ক্ষমতাই নেই সেটা করার ক্ষমতা তার হয় কী করে?

এই ছোট মাপকে বড়মাপের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার বাসনাই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বাসনা। একটা জাতির এই মূল প্রয়োজনকেই অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য করেছেন, এই বাসনার সুতীব্র জ্বালা বয়ে বয়ে তিনি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বুকে নিয়ে পঁয়ত্রিশটা বছর প্রায় নীরবে পার করেছেন। একটি সুন্দর সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের যে স্বপ্ন তিনি দেখেন তাকে এভাবেই বাস্তবায়িত করতে চান তিনি এবং আমরা বিশ্বাস করি এভাবেই তা সম্ভব।

আমাদের সমস্যা বাইরের নয়, গহিন ভিতরের। সত্য সুন্দর ও শুভবোধ অন্তরে বাসা বাঁধলে বাইরে তা একদিন ছড়িয়ে পড়বেই পড়বে। মানুষ নিজের বোধেই নিজেকে গুছিয়ে নেবে। তাহলে হাজারো সমস্যার সমাধান আপনা আপনিই হয়ে যাবে। হয়তো ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল কালের মানুষেরা মনে করতে পারবে না কোন্ মানুষেরা একদিনের অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল। তা না পারুক। পারার দরকারই-বা কিসের? রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন একটা জাতি মুখ থুবড়ে পড়ার পরও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আবার নিজের অবস্থান সুসংহত করেছে এর চেয়ে বেশি সুখ এবং বড় আনন্দ আর কিসে হয়! 'মানুষের গুণগত সমৃদ্ধি'ই আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'আগামীতে যখন এই জাতির জীবনে বৈদগ্ধ্য আর পরিশীলনের যুগ আসবে তখন সেই সময়ের তরুণেরা আমাদের এই সব হাস্যকর কাণ্ডকারখানার কথা ভেবে অবাক হবে। বুঝে উঠতে পারবে না— কেন তাদের একজন বিমূঢ় পূর্বসূরি তাদেরই মতো মেধা আর মননশীলতা নিয়ে আজীবন কেবল দেশের মানুষের চিৎপ্রকর্ষ বাড়াবার পরিশ্রমে মানবজন্মের অপচয়

করে গিয়েছিল। হয়তো তার মেধার বা মননের ধারকত্ব সম্বন্ধেই তাদের সন্দেহ জাগবে। তারা বুঝবে না যে আকুতিতে তার অন্তরাত্মা সেদিন ক্রন্দন করেছে তা বিস্মিত শিল্পসিদ্ধি নয়, একটা নতুন জাতির নির্মাণের বেদনা। একটা অকর্ষিত আদিম প্রাথমিক জাতিকে গড়ে তোলাতেই তারা ছিল নিঃশেষিত।'

কী হবে, কে কী ভাববে— সে ভবিতব্যই জানে। এসব ক্ষেত্রে শেষ কথা বলার সময় বর্তমানকাল নয়। সমসময় বরাবরই নির্দয় নিষ্ঠুর, কিছুটা অবুঝও। চোখের সামনে ঘটনা ঘটে বলে যথার্থ গুরুত্বও সে পায় না। চোখে দেখা চেনা মানুষ কাজ করে বলে বেশিরভাগ সময়ে অন্যরা তাকে আলাদা করে দেখতে পায় না অথবা দেখার চেষ্টা করে না। হিংসা দ্বেষ বিরূপ আলোচনা সমালোচনা বর্তমান কালে যতটা হয় উত্তরকালে হয়তো ততোটা হয় না; সেকালে অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন বোধহয় সম্ভব। আমাদের বর্তমান যেহেতু উত্তরকালের ভবিষ্যৎ মানুষের হাতে গিয়ে পড়বে সেহেতু দায় তো তাদেরও আছে।

শ্রীঅরবিন্দ কাব্যরস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দিলীপ কুমার রায়কে একবার লিখেছিলেন, `Contemporary judgments we know to be unreliable. There are only two judgments whose joint verdict cannot easily be disputed : the World and Time, but the World's verdict is secure only when it is confirmed by Time— the verdict of posterity.

জনমত এবং কাল এই দুই বিচারকের রায়ই প্রামাণ্য এবং জনমতের রায় বলতে বোঝায় না তার আজকের রায়, বোঝায় অনাগত বিশ্বের লোকমতের পাকা রায়। *[অনুবাদ : দিলীপ কুমার রায়]*

কথাগুলো এ ক্ষেত্রেও খাটে। তবে কেন্দ্রের কাজ যেহেতু একটি জাতি গঠনের সে কারণে বর্তমানের মানুষকেও বুঝতে হবে; বুঝেই অনাগত কালের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।

আর যে মানুষের রক্তক্ষরণ নিজের জন্য নয়, একটি বিপন্ন জাতির সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য তাকে কী বলা যায়?

বলা যায় অনেক কিছুই, তবে আপাতত এটুকুই বলছি যে ধরিত্রীমাতা সুসন্তান প্রসব করা একেবারে ছেড়ে দেননি, এখনও মাঝে মাঝে করেন। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাদেরই একজন।

২০১৪

খায়রুল আলম সবুজ : নাট্যব্যক্তিত্ব ও লেখক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

স্বপ্ন থেকে স্বপ্ন

আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন আমাদের নীরস পাঠ্যবইগুলোর সাথে সুন্দর সুন্দর গল্পের একটা বই ছিল, সেটাও আমাদের পড়তে হত! নতুন ক্লাসে ওঠার পর নতুন পাঠ্যবইগুলো কেনার পর আমাদের প্রথম কাজই ছিল সেই বইটা পড়ে ফেলা। সেটা অবশ্য ছিল মাত্র একটা বই— সেই বইটা পড়ে আমাদের বইপড়ার খিদে মিটত না— সেই খিদে মেটানোর জন্যে ছিল স্কুল লাইব্রেরি। সেই লাইব্রেরিতে ছিল সারি সারি আলমারি। সেই আলমারি বোঝাই ছিল বই। বয়স কম ছিল তাই ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করে প্রচুর সময় কেটে যেত, তারপরেও যে সময় উদ্বৃত্ত থাকত সেই সময়টাতে আমরা লাইব্রেরিতে বসে বসে বই পড়তাম। আমাদের বইপড়ার আগ্রহ দেখে লাইব্রেরিয়ান আমাদের খুব স্নেহ করতেন। একজন ছাত্রের যে কয়টি বই নেবার কথা, আমাদের তার থেকে অনেক বেশি বই নিতে দিতেন। যে বইগুলো লাইব্রেরি থেকে বাইরে যাওয়া নিষেধ ছিল সেগুলোও লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে নিতে দিতেন! শৈশবের বড় একটা সময় কেটেছে বই পড়ে।

জীবনের বড় একটা অংশ দেশের বাইরে কাটিয়ে যখন আবার দেশে ফিরে এসেছি তখন খবর পেয়েছি, যখন দেশে ছিলাম না তখন এখানে একটা অন্ধকার-যুগের সূচনা হয়েছিল। এই দেশ শাসন করেছে মিলিটারি এবং মিলিটারি ধরনের মানুষ। সাধু ভাষায় এদেরকে বলে স্বৈরশাসক— তাদের ধারণা সবকিছু তারা খুব ভালো বোঝে। এবং তাদের হিসেবে একটা স্কুলের ছেলেমেয়ের জীবনে বইপড়ার গুরুত্বটা খুব বেশি নয়। তাই তারা এই দেশের স্কুলের লাইব্রেরিয়ানের পদটি তুলে দিল। একটা দেশের এর চাইতে বড় ক্ষতি আর কোনোভাবে করা সম্ভব বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার জানা নেই। স্কুলে যেহেতু লাইব্রেরিয়ান নেই তাই লাইব্রেরিটা দেখেশুনে রাখার মতো কোনো মানুষ নেই এবং খুব ধীরে ধীরে বাংলাদেশের স্কুলগুলো থেকে লাইব্রেরি ব্যাপারটা উঠে গেল। ছেলেমেয়েদের পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্যান্য বই পড়ার সুযোগ নেই। পুরো শৈশবটা চোখের সামনে রঙহীন বিবর্ণ ধূসর হয়ে গেল।

আমি দেশে ছিলাম না, খবর পেয়েছি এই ঘটনাটা ঘটেছে স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের আমলে। আমি সেজন্যে জেনারেল এরশাদ, তার আমলের মন্ত্রী-উপদেষ্টা-সচিব কাউকে কোনোদিন ক্ষমা করিনি— কোনোদিন ক্ষমা করবও না। সারা পৃথিবীতে সবাই সবকিছুকে আগে যেমন করত, পরে তার থেকে ভালোভাবে করে— আমাদের দেশটা তার ব্যতিক্রম। আমরা আগে যেমন করতাম, পরে তার থেকে খারাপ করে করি।

একজন ছেলে বা মেয়ে যদি তার স্কুলের পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য কোনো বই না পড়ে বড় হয় সে তাহলে কোনোদিনই সত্যিকারের মানুষ হয়ে বড় হতে পারবে না। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটা সবচেয়ে সুন্দর করে বুঝিয়েছেন— শিক্ষার মাঝে যদি সংস্কৃতি না থাকে তাহলে শিক্ষাটা সঞ্চিত হতে পারে না, কারণ সংস্কৃতিটা হচ্ছে একটা পাত্রের মতো, শিক্ষাটা সেখানেই জমা হয়! কাজেই যে ছেলে বা মেয়ে বই না পড়ে বড় হবে সেই ছেলে বা মেয়ের শিক্ষাটার আসলে কোনো গুরুত্ব নেই; তারা চৌকস এবং চালাক-চতুর হয়ে বড় হয়, মানুষ হয়ে বড় হয় না। দেশে যখন এরকম বিশাল একটা শূন্যতা তখন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মোটামুটি এককভাবে সেই শূন্যতা মেটানোর চেষ্টা করে গেছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে যে দায়িত্ব নেবার কথা একটা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেই দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়, কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, বলা যেতে পারে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে। এটা মোটেই অল্পকিছু হাতে-গোনা ছেলেমেয়ের প্রতিষ্ঠান নয়, এটা সারা দেশব্যাপী অসংখ্য ছেলেমেয়ে নিয়ে গড়ে তোলা একটা বিশাল প্রতিষ্ঠান। এই দেশের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যে দেশটির জন্যে বুকের ভেতর এক ধরনের মায়া অনুভব করে, তার বড় কারণ হচ্ছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। তারা এই নতুন প্রজন্মকে বই পড়তে শিখিয়েছে, বই পড়তে আগ্রহী করেছে এবং তাদেরকে বই সরবরাহ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

একটি প্রতিষ্ঠান এমনি এমনি গড়ে ওঠে না, সেটা গড়ে ওঠার পেছনে কোনো একজন বা একাধিক মানুষের স্বপ্ন থাকে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পেছনে যে মানুষটি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলাম এবং তিনি আমার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন। কলেজে থাকাকালীন সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লাস ফাঁকি দিয়ে শুধু তাঁর ক্লাসে উপস্থিত থাকতাম, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদেরও এখন সেই অবস্থা। তারা সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে এখন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের বিশাল ডানার নিচে আশ্রয় নিয়েছে। তিনি সস্নেহে সবাইকে আশ্রয় দিয়েছেন।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন দেখে তিনি শান্ত হননি, তিনি সেই স্বপ্নের পেছনে ছুটে বেড়িয়েছেন এবং শেষপর্যন্ত সেটাকে সফল করেছেন। তাঁর সেই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানে এখন অসংখ্য তরুণ-তরুণী একটা স্বপ্ন দেখার জন্যে এবং স্বপ্ন দেখানোর জন্যে জড় হয়েছে। সেই স্বপ্ন এখন একজনের ভেতর থেকে আরেকজনের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে।

২০০৯

মুহম্মদ জাফর ইকবাল : লেখক
অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামীম আজাদ

শুধু এক পাখি

শীতের দুপুর! রোদের চিরল চোখ এসে পড়েছে আমাদের গায়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের বাংলা বিভাগের বারান্দায়। সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন তাকলাগানো তরুণ অধ্যাপক আকরম হোসেন। যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় আমরা দেখলাম। একটু পরেই, ২০১৭-তে ওয়াকিল স্যারের ক্লাস। স্যার প্রাণপণ পদ্মাবতীর নীল শিরা-উপশিরা তুলে আনবেন। দোতলার বাংলা বিভাগের সামনে থেকে নিচের গাড়িবারান্দার সব দেখা যায়। দেখা যাচ্ছে মুনীর স্যারের সাইকেল। চেষ্টা করলে বটতলার মাইকবিহীন বক্তৃতাও বোঝা যায়। এক গেট দিয়ে রিকশা ঢুকে। শিশু-ইউক্যালিপ্টাস ঘেরা আরেক গেট দিয়ে বেবিট্যাক্সিতে নিচে কেউ এলে ভটভটানো শব্দে নিচে না তাকিয়ে পারা যায় না। সে রকম বিকট শব্দলহরায় নিচে তাকিয়ে দেখি একটি ঢালু ভটভটির ভেতর থেকে দুই তরুণ প্রাণপনে চার হাত নেড়ে আমাকে ডাকছে।

উঠুন, এক্ষুনি ডিআইটি যেতে হবে, সায়ীদ স্যারের শো।

ঊনসত্তর সাল। দেশের একমাত্র টিভি বাংলাদেশ টেলিভিশন। ঢাকা কলেজের বাংলার জনপ্রিয় শিক্ষক তিনি। তাঁর ক্লাসে আশেপাশের কলেজ থেকে ছাত্ররা এসে বসে থাকে। ইয়ামীন আর ইফতেখার ঢাকা কলেজের দুই মেধাবী ছাত্র। বোধকরি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের তুঙ্গ জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে আমার অনুজপ্রতিম ইয়ামীন ও ইফতেখার লেফট্যানেন্টের কাজ করে। ওরাই একদিন তাঁর সঙ্গে পরিচয় করাতে নিয়ে গেছিল ঢাকা কলেজের পেছনে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে অতি ছোট্ট একটা ঘরে তিনি দিনরাত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের স্বপ্ন শেয়ার করেন, টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সাজান। তারপর থেকে আমি উন্মুখ হয়ে ছিলাম কখন ডাক পড়বে।

সেদিন আব্দুল্লাহ ইউসুফ ইমাম আসতে পারেননি বিধায় আমিই সাহিত্যপর্বের ধাঁধার ঠেকা। চলন্ত গাড়িতে এখন ওদের মারি আর কি! এরকম অনুষ্ঠান মানেই হাজার মানুষের সামনে নিজের বেকুব চেহারা দেখানো। আর তাঁর অনুষ্ঠান শুরুর আগে রাস্তা খালি হয়, ব্যাডমিন্টন খেলা বন্ধ হয়, বুড়োরা চশমা খোঁজেন আর তন্বীরা প্রেমে পড়ে। আমার অজ্ঞতার শেষ না দেখে কেউ থামবে না। ভীষণ এই গ্যাঁড়াকলে পড়ে নার্ভাস হতে থাকলাম।

স্টুডিওতে ঢুকে দেখি উল্টো। উপস্থাপক ক্ষণে ক্ষণে ফ্লাস্ক থেকে গরম জল খাচ্ছেন। আশ্চর্য! টিভিতে দেখে তো কখনো এমন মনে হয়নি। সেখানে বরং অংশগ্রহণকারীদেরই তিনি নাজেহাল করে ছাড়ছেন। আজ আমার নাজেহাল হবার দিন। আবার আজই আমার প্রমাণ করার সুযোগ আমি কতটা বিশ্বসাহিত্য প্রেমী। 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থার মধ্যেই লাইট জ্বলে উঠল। কিছুক্ষণ কেটে গেলে হঠাৎ শুনি সেই ম্যাসম্যারাইজড স্বর— 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে— কার কথা?' আমি ভীত ইঁদুরকণ্ঠে মিউ মিউ করে উঠলাম, সঞ্জীব চন্দ্রের *পালামৌ*-এর। পড়া পেরে নিয়মিত সদস্য হয়ে গেলাম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর স্বপ্নযাত্রায়। 'আউট বই' ভারাক্রান্ত তাঁর স্টাফ কোয়ার্টারের ছোট ফ্ল্যাটে রওশন ভাবীর চা'র সঙ্গে শুরু হয় সকাল, কখনো বিকাল। জয়া, লুনা আশেপাশে। এভাবেই অনার্সে সায়ীদ ভাই-র কাছ থেকে ত্রিশোত্তর তিন কবি বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের সাহিত্য শুনে 'ইন বই' না পড়েই তাজ্জব একটা পাস জুটে গেল। ভাবা যায়? তখন স্যারই ডাকতাম। পেছন পেছন হেঁটে শুনতাম— 'জাতি শিক্ষিত না হলে যারা রাজনীতি করবে তাতে দেশের মঙ্গল হবে না'। সুতরাং ছেলেমেয়েদের বই পড়াতে হবে। বিদেশে যেভাবে আইসক্রিমের গাড়ির বাজনা শুনে ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে সেভাবে মোবাইল লাইব্রেরির গান শুনে ছুটে আসবে। আমাদের বাজনা হবে আলো আমার আলো...। এদের জীবনে বইয়ের আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে। কায়েস, লিয়াকতদের সঙ্গে আমি ইন্দিরা রোডে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সাজিয়ে তুলতে থাকলাম। কায়েস সুন্দর স্বপ্নিল সে বাড়ির ঝুলন্ত লতাগাছে জল ঢালে, আমাদের কেন্দ্রের জন্য তাঁর পছন্দে বেতের আসবাব আসতে থাকে। কেন্দ্রের স্বপ্নআর্কিট্যাক্ট আগামী দিনের বিভাগগুলোর নক্সা করেন। মিউজিক লাইব্রেরিতে থাকবে সব ক্লাসিক থেকে কনটেম্পোরারি, ফ্লোরে থাকবে পাটি পাতা, ক্যান্টিনে মুড়ি-পায়েশ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাগানভরা ফুল, হলে লাগাতার শুদ্ধ সংগীত, বই আলোচনা, বিশেষ ভ্যান ভরা বই নিয়মিত দিনে গাড়ির অগম্য সরু সরু রাস্তা দিয়ে পৌঁছে যাবে ছেলেমেয়েদের কাছে, স্কুলগুলোতে হবে বই পড়া কার্যক্রম, পুরস্কার হবে তাড়া তাড়া বই, টিভিতে হবে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান। এর সব কথায় থাকবে কৌতুকরসে ভরা, যেন পিঠার ভিতর ক্ষিরের পুর। প্রতিদিন রাশি রাশি ভারা ভারা ধান আসতে থাকে। বেতের চেয়ার, টেবিল, মেঝে, জানালার বেনিস্টার, ব্যবহার নিষিদ্ধ করে চকচকে নতুন টয়লেটেও রাখা হয় বই। সব জায়গায় বই বই বই আর বই। হাঁটতে গেলেই হাতে নিয়ে থ হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এ বাড়ি তো ভাড়া বাড়ি, চলে যেতে হবে। শুরু হল স্যারের এখানে-ওখানে ধরনা।

ততদিনে আজাদ আমার সাথী হয়েছে, ঈশিতা সজীব হয়েছে। আমার বেগুনি বোগেনভিলিয়া ছাওয়া ধানমন্ডির বাসায় আড্ডায় বলেন, 'জানো আমার মাথায় চল্লিশটি উপন্যাস, আর একটা আধুনিক নাট্যদল। কেন্দ্রের কাজ একটু কমলেই আমি লিখতে পারব।' এসবের মধ্যেই ঢাকা কলেজে পোস্টিং হল। এখন আমার সহকর্মী এবং তিনিই বাংলা বিভাগের প্রধান বিধায় 'বস'। কিন্তু হলে কী হবে, তাঁকে দেখলেই লাফিয়ে উঠে যাই, যেন চেয়ারে উঁচিয়ে আছে সজারুর শলা। আর 'জি স্যার' 'না স্যার' করি। বাচ্চা দুটো আর আজাদকে নিয়ে সবাই আমাদের নতুন ভবন বাংলামটরে যাই। ওরা গিয়েই ক্যান্টিন থেকে মুড়ি-পায়েশ খায়, উপরে লাইব্রেরিতে যায়, আমরা আমতলার মুকুলের গন্ধে চা খেতে খেতে কেন্দ্র কী করে কিছু আয় করতে পারে তার পরিকল্পনা করি। কেনা হয় জেরক্স মেশিন, ভাবা হয় পাবলিকেশনের কথা। সে সময়ই প্রায় ধমকে চেয়ারে বসালেন আর সায়ীদ স্যার থেকে সায়ীদ ভাই হলেন।

শুরু হল বাংলামটরের নির্মাণ ও উপাখ্যান। আমরা ততদিনে পরীবাগের নতুন ফ্ল্যাটে এসে গেছি। মধ্যে মাত্র একটি দেয়াল। সে দেয়াল টপকে মাযহার মাঝে মাঝে এসে সেই কোন কালে যৎসামান্য কিছু অর্থ কেন্দ্রকে ধার দিয়েছিলাম, মাসে মাসে তা শোধ দিয়ে যায়। অক্লান্ত পরিশ্রমী সায়ীদ ভাই মাঝে মাঝে আসেন। এলে অল্প খান কিন্তু সামনে রাখা কিছুই বাদ যায় না। ঈশিতা তখন হলিক্রসের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের স্কুল কার্যক্রমে ঢুকে গেছে। সজীব সেন্ট জোসেফ স্কুলে। একদিন বাসায় এসে দেখি ড্রইংরুমে স্থূল চেয়ারে মাথা এলিয়ে চোখ বুজে আছেন। ঈশিতা আঙ্গুল টেনে দিচ্ছে। সজীব ফিসফিসিয়ে বলল, 'এখন আমাদের সেন্ট জোসেফ স্কুলেও কেন্দ্রের বই আসবে। আজ আমাদের অ্যাসেম্বলিতে সায়ীদ চাচা এসেছিল। সবাইকে লাইসেন্স দিয়ে বাঘ মারার গল্প বলে অনেক হাসিয়েছে।'

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহারে বই ফেরিওয়ালা, বই পড়তে আকৃষ্ট করতে তাঁকে কত কী করতে হচ্ছে! এদিকে নিজের জীবন চলছে এক ঋষির মতো। একদিন আমাকে বললেন, তিনশ'টা টাকা হলে লুনার জন্য একটা হারমোনিয়াম কিনতে পারতাম। যে মানুষ অসংখ্য মানুষের মনে সুর তুলে দিচ্ছেন অনাদিকালের জন্য, এই চিত্তময়ের জীবনটা এমনি বিত্তবিহীন আজো।

"আমরা ব্রিটিশদের তাড়িয়েছি, ব্রিটিশরা আমাদের শোষণ করেছিল বলে। পাকিস্তানিদের তাড়িয়েছি, পাকিস্তানিরা আমাদের শোষণ করেছিল বলে। আজ দুর্বৃত্তরা আমাদের শোষণ করছে, আমরা কি তাদের তাড়াব না?" শিক্ষিত জাতি হলে তাই হবে, তিনি তাই করে চলেছেন। তিনিই শুধু এক পাখি, যে পাখি অক্লান্ত উড়ে চলেছে উঁচু গ্রীবায়।

২০১৪

শামীম আজাদ : কবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতিউর রহমান

স্যারের জন্যে ভালোবাসা

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সৃজনশীল নানা কর্মকাণ্ডের খবর বাতাসে ভাসে। তাই তিল তিল করে গড়ে ওঠা এই ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠানের কথা আমি জানতাম। আর জানতাম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারকে। তিনি আমাকে সরাসরি ক্লাসে পড়াননি। কিন্তু তাঁর ক্লাস তো বিশ্বজুড়েই। আমার সঙ্গে স্যারের পরিচয় এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এরপর লেখাপড়া করতে বিদেশ যাওয়া। ফের দেশে ফিরে গবেষণায় ডুবে গেলাম। আর লেখালেখি। তাই স্যারের সঙ্গে এখানে-সেখানে দেখা হয়ে যায়। স্যার কিন্তু ঠিকই খেয়াল রেখেছেন আমি কী করছি। কোথায় কী বলছি, লিখছি। একদিন হঠাৎ করেই বলে বসলেন— তাঁর সঙ্গে কাজ করতে হবে। শুরু হল পথচলা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পরিচালনা পর্ষদে যুক্ত করলেন। পাশাপাশি পরিবেশ আন্দোলনে একসঙ্গে নানা কাজ করি। ডেঙ্গু প্রতিরোধ আন্দোলনে স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে একসঙ্গে কাজ করেছি। তা ছিল এক স্বর্গীয় অনুভূতি। যখনই কোনো স্কুলে স্যারকে নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধের দাবি নিয়ে গিয়েছি তখনই দেখেছি কী জনপ্রিয় তিনি। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর, সকলেরই স্যার তিনি। ধীরে ধীরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মোবাইল লাইব্রেরিসহ নানা বড় কর্মে জড়িয়ে পড়েছে। চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম তাঁকে নিয়ে। সে কী সাড়া! নিউইয়র্কেও দেখলাম একই অবস্থা। এরই মধ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আরও প্রসার ঘটেছে। বিরাট বিল্ডিং হচ্ছে। কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। আমরা পর্ষদ থেকে সর্বক্ষণ স্যারকে সহযোগিতা করে যাচ্ছি। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই পড়ার প্রতিযোগিতার পুরস্কার নিতে জড় হয় তখন বোঝা যায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তাদের মনের জানালা কীভাবে খুলে দিচ্ছে। এছাড়াও বিশ্বমানের সাহিত্য ও চলচ্চিত্র বিষয়েও যে বিশেষ বিশেষ কোর্স করানো হয় সেখানে তরুণ সমাজের মনে আধুনিক চিন্তাচেতনার যে পরশ লাগছে তাতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎই শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াচ্ছে।

এই যে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের নতুন ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়েছে, তার মূল্যায়ন নিশ্চয় একদিন হবে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নানা কাজে যুক্ত থাকার সুবাদেই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার বাস্তব রূপায়ণ করছে প্রতিষ্ঠানটি। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে 'কেরানিগিরি কল' মনে করতেন। তিনি তাঁর *লক্ষ্য ও শিক্ষা* প্রবন্ধে লিখেছিলেন— 'তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি-মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুল-মাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া, তাহার পর পেন্সন-ভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে চাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে— এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা—এই কথাটি আমাদের নিশিদিন মনে রাখতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা।

আমাদের সমাজ একথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।'

প্রাণহীন এই শিক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বহুমাত্রিক প্রাণের শিক্ষা দেবার চেষ্টা করে আসছে। এই কেন্দ্র বিশ্বাস করে যে, 'মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে, যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া ওঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।' নিজের সমস্যা সমাধান, নিজস্ব মত ও পথের সন্ধান দেবার জন্যেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তরুণদের নিয়ে এভাবে মেতে থাকে। শিক্ষা যে জীবনেরই অংশ সে কথাটিই আড্ডায়, সিনেমায়, ক্লাসে, মোবাইল লাইব্রেরিতে, ডেঙ্গু প্রতিরোধের মতো নানা উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণদের শেখানো হয়। তরুণরাও এই জীবনধর্মী শিক্ষার আয়োজনে আনন্দের সাথেই অংশ নেয়।

আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মাধ্যমে আমাদের তরুণদের জীবনে সুস্পষ্টতা আনার চেষ্টা করছি। "আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি তা বেশ মোটা লাইনে বড় রেখায়" স্বদেশের ললাটে এঁকে দিতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের মতো আমরাও বিশ্বাস করি যে, 'আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে।' আমরা তাই সমাজে আশা করার নানা উপায় সৃষ্টি করছি। আশার অভিমুখে এই যাত্রায় তরুণ সমাজের পাশাপাশি আমরাও যে হাঁটতে পারছি, সে সুযোগ সৃষ্টি করে দেবার জন্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, বিশেষ করে স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২০০৯

আতিউর রহমান : অর্থনীতিবিদ ও লেখক
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসান ফেরদৌস

সায়ীদ স্যারকে অভিনন্দন

খুব দরকার ছিল এই স্বীকৃতিটুকুর। না, সায়ীদ স্যারের জন্য নয়। আমার মনে হয় না স্বীকৃতির জন্য অপেক্ষা তিনি করেন। শুধু তাঁর ছাত্রদের কাছ থেকে যে ভালোবাসা তিনি পেয়েছেন, তারপর অন্য আর কোনো স্বীকৃতির প্রয়োজন তাঁর থাকার কথা নয়। নিজেও সে কথা অনেকবার বলেছেন। এই স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল আমাদের জন্য, বাংলাদেশের জন্য। বাংলাদেশকে ঘিরে চারদিকে যখন ঘন আঁধার, তখন এই হঠাৎ একটি ভালো খবর আমরা পেলাম। হোক না ছোট খবর, কিন্তু ভালো খবর তো। আঁধারভরা সময়েও শোনা যায় গান। এ যেন সেই আঁধারভরা সময়ের গান।

এই স্বীকৃতির দরকার ছিল আরো একটি কারণে। পঁচিশ বছর ধরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নিয়ে লেগে আছেন সায়ীদ স্যার। এমন একটি কাজ বাংলাদেশে যে করা সম্ভব, অনেকেই তা বিশ্বাস করেননি। অনেকে, তার মধ্যে সায়ীদ স্যারের বন্ধুরা আছেন, বাংলাদেশের নামকরা বুদ্ধিজীবীরাও আছেন, যাঁরা কেন্দ্রের পেছনে 'সায়ীদের একটা মতলব আছে' বলে নানাভাবে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এখন আন্তর্জাতিকভাবে এই স্বীকৃতি লাভের পর তাঁদের সে সন্দেহ কমবে কি না জানি না, কিন্তু সে কথা জনসমক্ষে বলতে তাঁরা কিঞ্চিৎ ইতস্তত করবেন তা নিশ্চিত।

বাংলাদেশকে নিয়ে, তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে, সায়ীদ স্যারের মতো এমন আত্মবিশ্বাসী মানুষ আমি দেখিনি। আমার নিজের সে আত্মবিশ্বাস নেই। সব সময় কেবল মেঘ দেখি, সে মেঘের পেছনে যে সূর্য আছে, তা দেখেও দেখি না। অথচ সায়ীদ স্যার শুধু সূর্যকেই দেখেন। কারণ, মেঘ তো কাটবেই। তখন আকাশজুড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে আলোঝলমলে সূর্য। মনে পড়ছে, বছর তিনেক আগে, নিউইয়র্কে, আমার ঘরে সায়ীদ স্যার ও গাফ্ফার ভাইকে (আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী) ঘিরে আমরা জনাকয় বাঙালি রাতভর আড্ডা দিয়েছিলাম। সে আড্ডার বিষয় অন্য কিছু নয়, বাংলাদেশ। আমরা যারা বাংলাদেশের বাইরে থাকি, যাদের বাংলাদেশের বেদনার সঙ্গে পরিচয় প্রধানত স্মৃতি থেকে, আবেগ থেকে, তারা ধরেই নিয়েছিলাম বাংলাদেশ হেরে গেছে, তার হাঁটু ভেঙে গেছে। ঘুরেফিরে সে কথাই বলছিলাম। পরিসংখ্যানের অভাব নেই, মন্দ খবরের কমতি নেই। ফলে গলার আওয়াজ আমাদেরটাই ছিল বেশি। কিন্তু সায়ীদ স্যার সে কথা মানেননি। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর শর্তহীন আস্থার কথা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন, উঠে দাঁড়াতে হলে উঠে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখা চাই আগে। যে মানুষ স্বপ্ন দেখে না, সে মানুষ কখনো জয়ী হয় না। আমি সায়ীদ স্যারের সে কথা বিশ্বাস করিনি। উল্টো পরিহাস করে লঘু মন্তব্যই করেছিলাম।

বিলম্বে হলেও সে অপরাধ স্বীকার করছি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি।

সায়ীদ স্যার শুধু স্বপ্নই দেখেন না, সে স্বপ্ন যাতে সত্য হয়, সেজন্য শ্রমিকের আগ্রহে মাটিতে কোদাল লাগান। আরাম-কেদারা বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এখানে। নিউইয়র্কে তাঁর উৎসাহে কেন্দ্রের একটি শাখা হয়েছে। গত চার বছর ধরে তিনি নিয়মিতভাবে এই শাখার কাজ তদারক করেছেন। কেন্দ্রের সাংবাৎসরিক মেলায় উপস্থিত থেকেছেন, শেষ দর্শকটি না যাওয়া পর্যন্ত দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকেছেন। প্রতিটি প্রসারিত হাতকে স্পর্শ করেছেন। আমি জানি, তাঁর নিজের স্বপ্ন তিনি এভাবেই ছড়িয়ে দেন।

তাঁর লাগানো একটি গাছ এই নিউইয়র্কেও বাড়ছে।

র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনে সায়ীদ স্যারকে ঢাকায় ফোন করেছিলাম। তাঁকে অভিনন্দন জানাতেই তিনি উল্টো প্রশ্ন করলেন, গতবার তোমরা যে পরিবেশ আন্দোলনের জন্য কাজ করবে বলে কথা দিয়েছিলে, তার কী হল?

আমরা কেবলই কথা বলি, কাজ থেকে পালিয়ে বেড়াই। নিজের কাজ নিয়ে সায়ীদ স্যারের ক্ষান্তি নেই। শেষ নেই তাঁর স্বপ্ন দেখারও।

নিউইয়র্ক ২০০৪

হাসান ফেরদৌস : লেখক, কলামিস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর
উদ্যমী ও সৃজনশীল

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কথা বললে সকলের সামনে তাঁর মহত্তম কীর্তি 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের' কথাই প্রথমে মনে আসে। কারণ তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও অবদান থাকা সত্ত্বেও 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের' প্রতিষ্ঠাকে সর্বোত্তম অবদান বলে সবাই স্বীকৃতি দিয়েছেন। শুধু দেশে নয়, বিদেশ থেকেও তিনি এজন্যে সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ হঠাৎ করে এই অবস্থানে পৌঁছাননি। তাঁর রয়েছে সৃজনশীলতার এক দীর্ঘ পথযাত্রা। তাঁর ছাত্রজীবনটা ছিল প্রস্তুতির কাল। তিনি নানাভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। প্রচুর বই পড়া ও খ্যাতিমান অধ্যাপকদের বক্তৃতা শোনা ছিল তাঁর প্রস্তুতির একটা বিশেষ দিক। সেই পঞ্চাশ, ষাট দশকে ঢাকা ও কলকাতার রেডিওর মাধ্যমে অনেক 'নায়কে'র জন্ম হয়েছিল। অনেক শ্রোতার জীবনকে এইসব নায়কেরা প্রভাবিত করেছিলেন। ছাত্রজীবনে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদও প্রভাবিত হয়েছিলেন রেডিও অনুষ্ঠান দ্বারাই। তাঁর প্রথম চমক দেখা যায় অধ্যাপনায়। ঢাকা কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনার মাধ্যমে তিনি জনপ্রিয়তার সিঁড়িতে প্রথম পা রাখেন। তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্রদের কাছে শুনেছি, তিনি খুবই জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। একজন মানুষের জীবনে এটাই তো একটা বিরাট সাফল্য।

ষাটের দশক বাংলাদেশে আধুনিক সাহিত্য বিকাশের কাল। প্রতিষ্ঠিত ও প্রবীণদের পাশাপাশি তরুণ কবি-সাহিত্যিকরা উঠে আসছেন। হঠাৎ হঠাৎ দেখা যাচ্ছে প্রতিভার ঝলক। তখনো সাহিত্যাঙ্গনে প্রবীণদের আধিপত্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাঁদের অনেকের খ্যাতি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই। প্রবীণদের পাশে নানা কারণে তরুণরা ঠিকমতো স্বীকৃতি পাচ্ছিল না। এমনকি জায়গাও পাচ্ছিল না। ঠিক এরকম সময়ে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রকাশ করেন সাহিত্য পত্রিকা *কণ্ঠস্বর*। ত্রৈমাসিক বলা হলেও সবসময় নিয়ম রক্ষা করে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। চরিত্রে লিটল ম্যাগাজিন হলেও সম্পাদনা ও লেখার উচ্চমানে *কণ্ঠস্বর* রীতিমতো একটি মর্যাদাবান সাহিত্য পত্রিকাই হয়ে উঠেছিল। *কণ্ঠস্বর* অচিরেই পূর্ববাংলার তরুণ, প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখকদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। শুধু ঢাকাকেন্দ্রিক নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার তরুণদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে *কণ্ঠস্বরে*। সেকালে এমন কোনো তরুণ লেখক বা সাহিত্যকর্মী পাওয়া যাবে না যারা নিয়মিত *কণ্ঠস্বর* পড়েননি। একটি সাহিত্য পত্রিকা সমগ্র তরুণ লেখকসমাজকে কীভাবে আন্দোলিত করতে পারে *কণ্ঠস্বর* ছিল তার এক বড় দৃষ্টান্ত। *কণ্ঠস্বর*-এর মতো পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের একটি বড় অবদান।

১৯৬৪ সালে ঢাকায় ডিআইটি (এখন রাজউক) ভবনে কয়েকটি ছোট ছোট কামরা নিয়ে এদেশে টেলিভিশনের যাত্রা শুরু। প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই টিভি অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন টিভি মাধ্যমে তাঁর অনেক কিছু করার রয়েছে। স্বাধীনতার আগে ডিআইটি ভবনের ছোট স্টুডিয়োতে তিনি অনেক অনুষ্ঠান করলেও তাঁর প্রতিভার পুরোপুরি প্রকাশ ঘটে স্বাধীনতার পরে। ততোদিনে টেলিভিশন কেন্দ্র ডিআইটি ছেড়ে রামপুরায় বর্তমান ভবনে চলে গেছে। বিশাল ভবন, বিশাল স্টুডিয়ো, প্রচুর সুযোগ-সুবিধা। 'বিটিভি'র সৌভাগ্য, তারা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মতো একজন সৃজনশীল ও দক্ষ উপস্থাপক পেয়েছিলেন অনুষ্ঠানের জন্যে। আর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদেরও সৌভাগ্য, তিনি তাঁর প্রতিভা প্রকাশের জন্যে টিভির মতো একটি মাধ্যম পেয়েছিলেন। একেবারে সোনায় সোহাগা যাকে বলে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মনপ্রাণ ঢেলে, প্রচণ্ড পরিশ্রম করে টিভির জন্যে অসংখ্য অনুষ্ঠান তৈরি ও উপস্থাপনা করেছেন। টিভি অনুষ্ঠান নিয়ে প্রায় এক দশক তিনি মাতোয়ারা ছিলেন। ঢাকা কলেজের শিক্ষকতার বাইরে বাকি সময়টা তিনি টিভির জন্যেই উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর মতো এরকম টিভি-অন্ত-প্রাণ সেকালে খুব বেশি দেখা যায়নি।

টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ দর্শকসমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর মতো জনপ্রিয়তা সেকালে আর কেউ অর্জন করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। কী অনুষ্ঠান করতেন তিনি, যার কারণে এত

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন? তাঁর অনুষ্ঠানগুলো ছিল অভিনব, চিত্তাকর্ষক, শিক্ষণীয়, বিনোদনমূলক ও রসে টইটুম্বুর। তাঁর অনুষ্ঠানের একটা বড় অংশ ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা। নানারকম কুইজ। দর্শকরা তাঁর অনুষ্ঠানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন। এটা খুব সহজ কাজ ছিল না। সেকালে দুই ঈদে তাঁর পরিচালনায় যে *আনন্দমেলা* অনুষ্ঠান হত তা ছিল ছোট-বড় অনেকের প্রধান ঈদ-আনন্দ। ঈদের *আনন্দমেলা* না দেখলে অনেকের ঈদ সম্পূর্ণ হত না। তবে যে কথাটি না বললেই নয়, তা হল : তাঁর অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর চাইতেও বড় আকর্ষণ ছিল তাঁর উপস্থাপনা, তাঁর কথা বলা, তাঁর নানা সরস মন্তব্য। তাঁর মতো সুকথক সেকালে টেলিভিশনে খুব বেশি দেখা যায়নি। তাঁর পাজামা-পাঞ্জাবি পরা বাঙালি অবয়ব, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব, পর্দায় সহাস্য উপস্থিতি, তাঁর কৌতুক সবমিলিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে তাঁর মতো আকর্ষণীয় উপস্থাপক আর আসেনি। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বিনোদনমূলক টিভি অনুষ্ঠান তৈরি ও উপস্থাপনায় যে মান স্থাপন করে গেছেন তা এখনো কারো পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। সেকালে বিনোদনমূলক টিভি অনুষ্ঠানে তিনি যে সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা এখন ভাবলে বিস্ময়কর মনে হয়। এখন অনেক দর্শক কলকাতার নানা টিভি চ্যানেলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে মুগ্ধ হন। কিন্তু তাঁরা অনেকেই জানেন না, এর চাইতে আরো আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান বিটিভিতে প্রচারিত হয়েছে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। যখন এদেশের কেউ বিদেশি টিভি চ্যানেল দেখার সুযোগই পায়নি। শুধু নিজের প্রতিভা ও সৃজনশীলতার ওপর নির্ভর করে সীমিত সুযোগ ও বাজেটের মধ্যে বিটিভিতে এমন আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান প্রচার করা সম্ভব হয়েছিল। আনন্দদায়ক টেলিভিশন অনুষ্ঠান তৈরি ও উপস্থাপনার জন্যে এদেশে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সবচেয়ে বড় অবদান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। কারণ এটি একটি প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানের চলমান কর্মসূচি রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি কোনো কাজ করতে হলে প্রতিষ্ঠানের কোনো বিকল্প নেই। সত্তর দশকের মাঝামাঝি ঢাকা কলেজের কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রকে নিয়ে বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বই পাঠ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে এর সূচনা হয়। অনুমান করি, কেন্দ্র এখন যে অবয়ব লাভ করেছে শুরুর দিকে সেরকম বড় কোনো চিন্তা ছিল না। পৃথিবীর সেরা সাহিত্য পাঠ ও আলোচনাই ছিল মূল চিন্তা। যে কোনো প্রতিষ্ঠানই ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়। তার কর্মসূচি বাড়তে থাকে। নানা আইডিয়ার জন্ম হয়। কেন্দ্র-ও সেরকম একটি বিকাশমান প্রতিষ্ঠান। যার মূল নেতৃত্বে রয়েছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মতো সৃজনশীল ও উদ্যোগী মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্রের দুটি দিক রয়েছে। ক) কেন্দ্রকে ঘিরে নানা কর্মসূচি, খ) কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশজুড়ে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। লাইব্রেরি প্রসঙ্গ আগে আলোচনা করি। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ উপলব্ধি করেছেন, আমাদের ছাত্র, কিশোর ও তরুণদের মধ্যে মূল্যবোধের অভাব, উন্নত জীবনবোধ, দায়িত্বশীলতার অভাব। এরকম নানা নেতিবাচক উপসর্গের প্রধান কারণ তারা যথেষ্ট ভালো বই পড়েনি। শুধু পাঠ্যবইয়ের মধ্যে তাদের পাঠ সীমিত। ছেলেমেয়েরা যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইগুলো পাঠ করত ও উপলব্ধি করত তাহলে তাদের মন আলোকিত হত। জীবনে অনেক বড় কিছু দেখার স্বপ্ন দেখত তারা। ক্ষুদ্রতার মধ্যে তাদের জীবন অতিবাহিত হত না। এই বোধ থেকে তিনি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি গড়ে তোলেন। গাড়িতে করে বই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। আগ্রহী ছেলেমেয়েরা বই নিচ্ছে, পড়ে ফেরত দিচ্ছে। কষ্ট করে লাইব্রেরিতে যেতে হচ্ছে না, পয়সা খরচ করে বই কিনতে হচ্ছে না। প্রিয় বই পেয়ে যাচ্ছে ঘরের কাছেই। দেশের বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত হচ্ছে এই ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। কিশোর ও তরুণদের ভাবজগতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্যে এই ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার একটা নীরব বিপ্লব। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন স্কুলে বই পড়ার কর্মসূচি। যার মাধ্যমে বহু ছাত্রছাত্রী স্কুলে পড়ার সময়েই অনেক ভালো ভালো বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। যা আমাদের প্রচলিত স্কুল শিক্ষাব্যবস্থায় সম্ভব নয়।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের দ্বিতীয় বড় কাজটি এর প্রতিষ্ঠানের ভেতরে। পত্রপত্রিকা থেকে জানতে পেরেছি প্রতিষ্ঠানের নানা কর্মসূচির মাধ্যমে আলোকিত মানুষ গড়ার একটা উদ্যোগ রয়েছে। বিশ্বসাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা, দর্শন আলোচনা, চলচ্চিত্র, সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্য, সমসাময়িক নানা বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান, আলোচনা, প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ, বক্তৃতা ও বিতর্কের মাধ্যমে আগ্রহী ব্যক্তিদের জীবনবোধ উন্নত করার প্রয়াস রয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থা শুধু কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের ধারণা দেয়। অথচ একজন আলোকিত মানুষকে জানতে হয় নানা কিছু। একজন শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও আলোকিত মানুষ হতে হলে মানুষকে বহু বিষয় সম্পর্কে ধারণা রাখতে হয়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তরুণদের সেই জানার সুযোগ করে দিয়েছে। যদিও দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এই আয়োজন খুবই ক্ষুদ্র। তবু এটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা একটা মডেল। একদিন হয়তো এই মডেল অনুসরণ করে সরকারই প্রত্যেক জেলায় একটি কেন্দ্র গড়ে তুলবে। প্রাইভেট উদ্যোগে দেশব্যাপী এরকম কেন্দ্র পরিচালনা করা কঠিন। একটা সফল ও কার্যকর মডেল তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন বিভিন্ন জেলায় স্থানীয়রা এই মডেল অনুসরণ করতে পারে।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখে, প্রতিষ্ঠা করে ও তা পরিচালনা করে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সমালোচকরা কেন্দ্রের অনেক অপূর্ণতা নিয়ে কথা বলতে পারেন। কী নেই— তা বলা সহজ। কী আছে— সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। যা আছে সেটাও তো বাংলাদেশের কোনো সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ যাবত করতে পারেনি।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সরকারসহ নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থসহায়তায় গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি স্বাবলম্বী কীভাবে হবে, কবে হবে সেটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিষ্ঠানের জন্যে এই আর্থিক সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন অনুদাননির্ভর হয়ে চলতে পারে না। প্রতিষ্ঠানকে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। নইলে প্রতিষ্ঠান টেকে না।

নানামুখী সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার জন্যে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের অন্যান্য সৃজনশীল প্রতিভা কিছুটা ঢাকা পড়ে গেছে। অধ্যাপক সায়ীদ একজন সফল লেখক ও কবি। তাঁর গদ্যশৈলী মৌলিক ও শিল্পিত। শুধু লেখালেখি করলে তিনি অনেক বড় মাপের লেখক হতে পারতেন। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে, যা একজন লেখকের বড় সম্পদ। টিভি অনুষ্ঠান ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের জন্যে তিনি লেখালেখিতে বেশি সময় দিতে পারেননি। বড় মাপের বা ভালো লেখা খুবই সময় ও পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ। অধ্যাপক সায়ীদ তাঁর লেখক ও কবিসত্তার প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। আমরা একজন বড় লেখকের সৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজন সুবক্তা। তাঁর বক্তৃতা শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখে। তাঁর বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা নানা বিষয়ে আগ্রহী ও অনুপ্রাণিত হন। আমাদের সমাজে সুবক্তার অভাব রয়েছে। আমাদের টিভিমাধ্যমে এখন উন্নতমানের, আকর্ষণীয়, মেধাবী বক্তৃতা বা আলোচনা তেমন শোনা যায় না। (শহীদ) মুনীর চৌধুরী, বিচারপতি মোস্তফা কামাল, ড. আনিসুজ্জামান, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতো আকর্ষণীয় ও উদ্দীপক বক্তা এখন মিডিয়াতে দেখা যায় না বললেই চলে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মতো সুবক্তাকে আমাদের এখনকার টিভিমিডিয়া কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ অনেক সুযোগ ছিল।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আমাদের সমাজের একজন নমস্য ব্যক্তি। দেশের জন্যে তাঁর অবদান আমাদের সকলকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সবসময় স্মরণ করতে হবে।

২০১৪

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর : কলামিস্ট ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরিদুর রেজা সাগর

হ্যামিলনের বংশীবাদক

এখন যদি কেউ ঢাকার ফার্মগেটের তেজগাঁ পলিটেকনিক স্কুলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার পক্ষে বোঝা মুশকিল এই মাঠ থেকে ঢাকার বহু ফুটবলতারকা বা ক্রিকেটতারকার জন্ম হয়েছে। এই পলিটেকনিক স্কুলের ড্রিল-শিক্ষক ছিলেন মনির হোসেন। একসময় ঢাকার মাঠের দুর্দান্ত রেফারি। ফুটবলই যাঁর ধ্যান-জ্ঞান। যে কারণে পলিটেকনিক স্কুল থেকে অনেক ফুটবল খেলোয়াড় ষাট বা সত্তর দশকে ঢাকার মাঠ কাঁপিয়েছে।

স্কুলের খেলার মাঠটির অর্ধেক সত্তরের দশকে কোনো কারণে বিমানের কাছে চলে যাওয়ায় আকৃতিতে অর্ধেক হয়ে গেছে। একইসঙ্গে কমে গেছে নতুন খেলোয়াড় তৈরিতে স্কুলটির জৌলুশ।

কিন্তু যখন জৌলুশ ছিল সেই সময় ইন্টার স্কুল প্রতিযোগিতায় একটা উত্তেজনাপূর্ণ খেলা চলছিল। ২টি স্কুলের চারপাশের খেলোয়াড়রাই দারুণ ফুটবল খেলে। মাঠের চারপাশেও দর্শক। রেফারি মনির হোসেনের মুখে বাঁশি। লাইন্‌সম্যানের হাতে ফ্ল্যাগ। খেলার শেষ মুহূর্ত। কেউ গোল করতে পারেনি। পেনাল্টি কিক-এ সিদ্ধান্ত হবে— কে বিজয়ী। সেই সময় হঠাৎ করে রেফারির মুখের বাঁশি অন্য রকম সুরে বেজে উঠল। খেলায় এত উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত অথচ দর্শকেরা ভিড় করে অন্যকিছু দেখছে। রেফারির মুখের বাঁশি সেই ভিড়টাকে সরাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ভিড় সরে যাবার পর যাকে কেন্দ্র করে এই ভিড় তার দিকে তাকিয়ে মনির হোসেন স্যারের বাঁশি আবার বেজে উঠল। এবার অন্য সুরে। আপনি তাড়াতাড়ি এদিকে আসুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই সাথে হাতের ইশারা। মনির হোসেন স্যার সবসময় সাদা শার্ট-প্যান্ট পরতেন। এই ভদ্রলোকের পরনেও সাদা পোশাক। তবে সাদা প্যান্ট নয়। পাজামা-পাঞ্জাবি। ভদ্রলোক মনির হোসেন স্যারের চেয়ে উচ্চতায় আরও বেশি। হাতে কয়েকটি বই। তার মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের *সঞ্চয়িতা*। ভদ্রলোককে দেখে দর্শকদের ভিড় হবার কারণ, তিনি টেলিভিশনের নিয়মিত একটি ধাঁধার অনুষ্ঠানের উপস্থাপক। আর এই ধাঁধার অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ অংশ নিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। সেই সময় টেলিভিশনের পর্দার মানুষকে খুব বেশি সামনাসামনি দেখা যেত না। সেখানে একজন জনপ্রিয় উপস্থাপক স্কুলের মাঠ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, সুতরাং তাঁকে দেখার জন্য তরুণ দর্শকদের আগ্রহ থাকবেই। আর মনির হোসেন স্যার হাতের ইশারায় তাঁকে ডাকলেন এই কারণে যে, ভদ্রলোক টেলিভিশন উপস্থাপক হওয়ার পাশাপাশি রাস্তার ওপারে টেকনিক্যাল কলেজের বাংলার শিক্ষক। মনির হোসেন স্যার এই শিক্ষককে বললেন, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই নির্ধারিত হয়ে যাবে আজকের ফুটবল খেলায় কে বিজয়ী। সুতরাং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি থাকলে সবাই উৎসাহিত হবে।

একজন শিক্ষকের কাছে আরেকজন শিক্ষকের অনুরোধ। একই সাথে দর্শকের দাবির কথা চিন্তা করে ভদ্রলোক অপেক্ষা করলেন। খেলা শেষে পুরস্কার দেবার সময় ফুটবলের কিছু কথা তো বললেনই। বললেন, শুধু খেললে চলবে না। বইও পড়তে হবে। খেলা দেখে যে আনন্দ পাওয়া যায়, বই পড়েও সেই আনন্দ পাওয়া যায়। সেদিন মাঠের ওই দর্শকের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আর ঠিক আগের দিন ঢাকা টেলিভিশনে তাঁর যে ধাঁধার অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানের দর্শকও আমি ছিলাম। ফলে ভদ্রলোকের নাম আমি জানতাম। এখন বই-পড়ার কথা উঠলে সেই বয়সের একজন কিশোর বা কিশোরী একবাক্যে তাঁর নাম বলতে পারে। তিনি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

আমার মেয়ে মোহনা এখন স্থাপত্যকলার শেষবর্ষের ছাত্রী। যখন মোহনা ক্লাস ফাইভে পড়ত তখন একদিন আমাকে জিগ্যেস করেছিল, 'তুমি কি সায়ীদ সাহেব বলে কাউকে চেন?'

'কোন সায়ীদ সাহেব?'

'পুরো নাম তো জানি না। খুব সুন্দর কথা বলেন।'

আমি বুঝে ফেলেছি, মোহনা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কথা জিগ্যেস করছে।

'তোমার কী দরকার সায়ীদ স্যারের কাছে?'

'রাস্তার উপরে গাড়ির যে বইয়ের দোকানটা আসে সেটার মালিক তিনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার বই নিতে কোনো অসুবিধা হয়?'

'না।'

'তাহলে?'

'গাড়ির ড্রাইভারকে বলেছিলাম, গাড়িটা রাস্তার এপারে রাখতে। সে বলেছে সায়ীদ স্যারকে বলতে হবে।'

'গাড়ি রাস্তার এপারে-ওপারে রাখার সাথে তোমার কী সম্পর্ক?'

'আম্মু রাস্তা পার হতে দেয় না। ফলে আমি একা বই আনতে যেতে পারি না। তুমি তো অনেককে চেন। তাই ওই বইয়ের দোকানের মালিক সায়ীদ সাহেবকে বলে একটু রাস্তার এপারে গাড়িটা দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করে দিও।'

মোহনার কথাটা একটু অন্যভাবে কানে লাগল। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে কেউ সায়ীদ সাহেব বলে কিংবা বইয়ের দোকানের মালিক বলে এটা কখনো মনে হয়নি।

আমার ছোটবেলা থেকে যাঁকে আমি বইয়ের সঙ্গে দেখি। আমার সরাসরি শিক্ষক নন কিন্তু সবসময় তাঁকে জানি 'স্যার' বলে। হঠাৎ করে মোহনা তাঁকে 'সাহেব' বলছে, ব্যাপারটা যেন কেমন।

এই কেমন কেমন ভাবতে ভাবতেই সময় চলে গেছে অনেক। মোহনা-মেঘনা দুজনই যতই ইন্টারনেটের জগতে থাকুক, টেলিভিশনের জগতে থাকুক, বই পড়তে কখনো ভোলে না। হাতে বই পেলেই চট করে পড়ে ফেলে। ফুটবলের মাঠে আমি যেমন একসময় শুনেছিলাম সায়ীদ স্যার বই পড়ার কথা বলছেন, তেমনই মেঘনা-মোহনার জীবনেও হয়তো কোনো সময় সায়ীদ স্যারের বই পড়ার কথাটা পৌঁছে গেছে।

একবার আমেরিকায় সায়ীদ স্যারের সঙ্গে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। বন্যাকে নিয়ে এই গল্পটি স্যার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলেছেন। টেলিভিশনে বলেছেন। বইতেও বলেছেন। গল্পটা এ-রকম : অনুষ্ঠানে যাবার আগে হোটেলের লবিতে হঠাৎ স্যার কারো আর্তচিৎকার শুনলেন।

'আমার হার ...!' তারপর শুনলেন, 'আমার চুড়ি ...!' এবং তারপর 'আমার পাসপোর্ট...!' আর্তচিৎকার শুনে সায়ীদ স্যার তাকিয়ে দেখেন এই চিৎকার বেরুচ্ছে শিল্পী বন্যার কণ্ঠ থেকে। বন্যার পাসপোর্ট, চুড়ি, হার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সায়ীদ স্যার তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বন্যার এই আর্তচিৎকার ও সুরের করুণ অবস্থা নিয়ে খুবই সুন্দর বর্ণনা দেন। কিন্তু যে কথাটা সায়ীদ স্যারও এখনো জানেন না— সে কথাটা বলেছেন স্বয়ং রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। জিনিসগুলো হারিয়ে খুবই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন বন্যা। এটা সত্য যে, মুখ দিয়ে তাঁর আর্তচিৎকার বের

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল। চুড়ি আর হারের সঙ্গে পাসপোর্টের জন্য বেশি চিন্তিত তিনি। বিভিন্ন দেশের ভিসা রয়েছে সেই পাসপোর্টে। কিন্তু তারপরও আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে সামনে দেখে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার মনে হয়েছিল, জিনিসপত্র তো হারাতেই পারে। কিন্তু তাঁর ব্যাগের মধ্যে এখনো এমন একটা জিনিস রয়েছে যেটা তাঁর আগামী সময়গুলোতে উৎসাহের উৎস হতে পারে। জিনিসটা একটা বই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গীতবিতান*।

সায়ীদ স্যার এবং বই। এরকম নানাভাবে জড়িয়ে আছেন আমাদের জীবনে। সায়ীদ স্যারই বলেন, বই লেখেন পৃথিবীতে যে ক'জন মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক মানুষ বই পড়েন।

সুতরাং একজন পাঠক হিসেবে বইয়ের প্রতি যত অধিকার আমাদের, একজন লেখকের তারচেয়ে অনেক কম অধিকার বইয়ের সঙ্গে। পাঠক না থাকলে লেখকের বই লেখার অর্থ থাকত না। এই কথাটা সায়ীদ স্যার তরুণ প্রজন্মকে গত কয়েক দশক ধরে বোঝাতে পেরেছেন বলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে লেখকের চেয়ে পাঠকের ভিড় বেশি। একটা বয়স গত কয়েক দশক ধরে আটকে আছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের চত্বরে। শুধু বই নয়, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ চেষ্টা করে যাচ্ছেন একজন মানুষের কিশোর বয়স থেকে তার রুচির বিকাশ ঘটাতে। এই রুচি বিকাশের জন্য বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংগীত চিত্রকলা চলচ্চিত্রকে গুরুত্ব দিয়েছেন সমানভাবে। মানুষের কাছে বিশেষ করে কিশোর-তরুণ প্রজন্মের কাছে রুচির বিকাশ ঘটাতে গিয়ে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অনেক সময় অনেক কিছুর আশ্রয় নিয়েছেন বই পড়ানোর জন্য, বইয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি করানোর জন্য। পৃথিবীর সেরা গান শোনানোর জন্য ব্যবস্থা করেছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। চিত্রকলা শিক্ষার জন্য কোর্স চালু করেছেন। আর বিশ্বসাহিত্যের সেরা বই পড়ানোর নানা উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেছেন।

এই উদ্যোগ গ্রহণ করতে গিয়ে তরুণ প্রজন্মকে কালো অনেক কিছু বাদ দেয়ার জন্য আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নানাভাবে নিজেকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। যখন এদেশে মাত্র একটি টেলিভিশন চ্যানেল ছিল তখন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বুঝে গিয়েছিলেন টেলিভিশন-ব্যক্তিত্ব হিসেবে খুব সহজে তরুণ সমাজের হৃদয় স্পর্শ করা যায়। কথাটা এতদিন পরে প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কারণ দেশে এখন পঁচিশটি চ্যানেল। কালের নিয়মে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের বয়স বেড়েছে, এটা হয়তো সত্যি। কিন্তু ক্যামেরার সামনে তাঁর জাদুকরি উপস্থিতি আগের মতোই রয়েছে। তারপরও খুবই বেছে অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি, যেসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠানে এখন তিনি অংশগ্রহণ করেন সেখানেও তিনি তরুণদের আকর্ষণ করার জন্য, বিশেষ করে বই-পড়ার ব্যাপারে সবাইকে আগ্রহী করে তোলার জন্য নানা রকম চেষ্টা করে যাচ্ছেন। একবার তিনি বলেছিলেন, একটা কাজের জন্য সরকারি একজন কর্মকর্তা তাঁকে বলেছিলেন কাজটা করে দিলে পঁচিশ হাজার টাকা লাগবে। সায়ীদ স্যার অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি আমাদের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ছাত্র। তারপরও টাকা চাইছ?'

সেই সরকারি কর্মচারী একসময়ের কেন্দ্রের ছাত্র। তিনি বললেন, 'স্যার, অন্য কেউ হলে এক লাখের কমে কাজটা করত না। আপনি বলে চার ভাগের এক ভাগ টাকায় হচ্ছে।' আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ গল্পটা বলার সময় সবাইকে বলেছিলেন, 'আমার জন্য নয়। ছেলেটি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল বলে উপরি টাকাটা তিন ভাগ কমিয়েছে।'

ঘুষ নিয়ে টেলিভিশনে পর্দায় সায়ীদ স্যার আরেকটি গল্প প্রায়ই বলেন। ইংরেজ আমলে জমিদারের এক নায়েব যে কোনো কাজ করার সময় লোকজনের কাছ থেকে নানাভাবে ঘুষ নিতেন। নায়েবের এই ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ নিয়ে এক ভদ্রলোক গেলেন বড় এক ইংরেজ কর্মকর্তার কাছে। ইংরেজ কর্মকর্তা কিছুতেই ঘুষ শব্দটা কী, বুঝতে পারছিলেন না। আর বাঙালি ভদ্রলোকও ঘুষ শব্দটির ইংরেজি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত বাঙালি ভদ্রলোক সাহেবকে বললেন, চলুন একটু আমার সঙ্গে, বোঝাচ্ছি ঘুষ কাকে বলে। ইংরেজ সাহেবকে নিয়ে বাঙালি ভদ্রলোক চললেন সেই ঘুষ খাওয়া নায়েবের গৃহে। বাঙালি ভদ্রলোকের ভাগ্য ভালো। যখন তিনি সাহেবকে নিয়ে নায়েবের ঘরের কাছে পৌঁছালেন তখন একজন ঘুষ নিয়ে নায়েবের কাছে যাচ্ছেন। বাঙালি ভদ্রলোক প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে সাহেবকে বললেন, ওই যে দেখুন স্যার কীভাবে একজন ঘুষ নিয়ে যাচ্ছে আর নায়েব মশাই খাচ্ছে। ইংরেজ ভদ্রলোক সামনের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারলেন না। বরং জিগ্যেস করলেন, ঘুষ কী? ঘুষ কোথায়?

স্যার, দেখছেন না, ওই যে গেঞ্জিপরা লোকটা ঘুষ নিয়ে যাচ্ছে। দেখলেন, একজন লোক বিশাল এক কলার কাঁদি নিয়ে নায়েবের টেবিলের সামনে রেখেছে, সাহেব বললেন, ওটা ঘুষ কোথায়, ওটা তো কলা। বাঙালি ভদ্রলোক বললেন, ওটাই তো ঘুষ। গরিব লোক আর কিছু না পেয়ে ওর গাছের কলাটা এনে নায়েবকে দিচ্ছে। সাহেব তখন নায়েবের সামনের টেবিলে কলার কাঁদি থেকে একটা কলা খেয়ে বললেন, ঘুষ যদি এরকম মিষ্টি কলা হয় তাহলে Everybody should eat 'ঘুষ'।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজ সাহেব সেই যে বাঙালি জাতিকে ঘুষ খাওয়ার পরামর্শ দিলেন সেই পরামর্শ এখনো বাঙালি জাতির অনেকেই মনে রেখেছে। কিন্তু এই মনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝে ফেলেছি সায়ীদ স্যারের এই গল্পের মধ্যে খারাপ দিক যেমন রয়েছে তেমনই ভালো দিকও রয়েছে। অন্ধকার না এলে আলোর মূল্য আমরা বুঝব কী করে? আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর পাঞ্জাবি-পরা শরীরটা নিয়ে সেই অদৃশ্য সুর এখনো বাজিয়ে চলছেন। সেই সুরের মূর্ছনায় একটা বয়স এখনো বুঝতে পারছে জ্ঞানই শক্তি। আর জ্ঞানের জন্য গান শোনা প্রয়োজন। বই পড়া প্রয়োজন।

আমাদের হ্যামিলনের বংশীবাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। আমাদের সৌভাগ্য আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ যে শহরে যে আলো-হাওয়ার নিশ্বাস নিচ্ছেন আমরাও সেই একই আলো-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছি।

২০১৪

ফরিদুর রেজা সাগর : গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইমদাদুল হক মিলন

আমাদের বাতিঘর

আমি এক পিতার কথা জানি।

খুব ছোট একটা চাকরি করতেন। কেরানির চাকরি। গরিব গৃহস্থঘরের সন্তান ছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও পড়াশুনোটা বেশিদূর করতে পারেননি। ম্যাট্রিকুলেশান পাস করেছিলেন সেকেন্ড ডিভিশনে। বিক্রমপুরের এক গণ্ডগ্রাম থেকে কলকাতায় গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ব্রিটিশ আমল। পূর্ববাংলায় তখন পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল না। ছিল কলকাতায়। ম্যাট্রিক পাসের সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি এবং বিবাহ। এক-দুবছর পর পর সন্তানের জনক হতে থাকেন। সবমিলিয়ে দশটি সন্তান আসে তাঁর সংসারে। ছেলেমেয়ে মিলিয়ে। ওইটুকু এক চাকরি, এতবড় সংসার। ভোরবেলা উঠে তিনি কাজে বেরিয়ে যেতেন। অফিসের আগে দুজায়গায় ছাত্র পড়াতেন। অফিসছুটির পরও পড়াতে যেতেন আর দুটি জায়গায়। দুপুরে কোথায় খেতেন, কী খেতেন, কে জানে। অনেকটা রাত করে বাড়ি ফিরতেন। এত কষ্টের পরও ছেলেমেয়েদেরকে ঠিকমতো খাওয়াতে পারতেন না, জামাকাপড় দিতে পারতেন না, স্কুলের বেতন দিতে পারতেন না নিয়মিত। সময়মতো বেতন না দিতে পারার কারণে আজ এই ছেলের স্কুল থেকে নাম কাটা যাচ্ছে, কাল ওই মেয়ের। তারপরও তিনি হাছড়পাছড় করে স্কুলের টিচারদেরকে ধরে ব্যাপারটা ম্যানেজ করতেন। ছেলেমেয়েগুলো পড়াশুনোয় ভালো। টিচাররাও তাদেরকে নানারকমভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

ভদ্রলোকের স্বপ্ন ছিল একটাই— তিনি তাঁর ছেলেমেয়েগুলোকে ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি করবেন, শিক্ষিত এবং মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে তৈরি করবেন। তাঁর ছেলেমেয়েরা যেন দেশ এবং সমাজের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে।

ভোরবেলা বেরিয়ে, সারাদিন ওই অমানুষিক পরিশ্রম, অনেকটা রাতে বাড়ি ফিরে তিনি দেখতেন, পড়াশুনো শেষ করে ছেলেমেয়েরা সব সার ধরে শুয়ে আছে মেঝেতে। ছেলেমেয়েদের মা এতবড় সংসার সামলান, তিনিও ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ভদ্রলোক কাউকে ডাকতেন না। নিজের খাবারটা নিজেই বেড়ে খেতেন। গরমকাল, ঘরে ফ্যান নেই। আর মশার খুব উপদ্রব। সারাদিনের অতটা পরিশ্রম ভুলে তিনি একটা হাতপাখা নিয়ে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের মাঝখানে বসতেন। ঘুম-ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে, তবু গভীররাত পর্যন্ত পাখা করতেন ছেলেমেয়েদেরকে। তাদের ঘুমটা যদি ভালো না হয় তাহলে সকালবেলায় পড়ায় মন বসবে না। স্কুলে গিয়ে ঘন ঘন হাই তুলবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর এক ছেলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, এক ছেলে কলেজে। তাদের দুজনকেই মুক্তিযুদ্ধে পাঠালেন তিনি। যাও, দেশের জন্য যুদ্ধ করো। দেশ স্বাধীন করো। প্রয়োজনে দেশের জন্য শহিদ হয়ে যাও।

ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে গেল।

কেমন কেমন করে এই খবর গেল মিলিটারিদের কানে। দুই মুক্তিযোদ্ধা ছেলেকে তারা পেল না, পিতাকে ধরে নিয়ে গেল। সেই পিতা আর কখনও ফিরে এলেন না।

কিন্তু সংসারে ওই একজনই উপার্জনক্ষম মানুষ। দশটি টাকাও নেই ঘরে। দেশে চলছে মুক্তিযুদ্ধ। দশ সন্তানের জননী চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। কীভাবে তিনি বাঁচাবেন তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে? কীভাবে মানুষ করবেন তাদেরকে? সন্তানদের নিয়ে স্বামীর যে স্বপ্ন ছিল কীভাবে সফল করবেন সেই স্বপ্ন?

নিজের দায়িত্বের পাশাপাশি স্বামীর দায়িত্বটিও নিয়ে নিলেন তিনি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে ভয়াবহ এক যুদ্ধ শুরু করলেন। বেঁচে থাকার যুদ্ধ, তাদেরকে মানুষ করার যুদ্ধ। স্বামী তাঁকে একটা কথা বলেছিলেন একদিন, তোমার সন্তানরা যেন বইবিমুখ না হয় কখনও। তাদের হাতে যেন বইটা সবসময় থাকে, তাদের চোখের সামনে আর কিছু থাক না থাক, বই যেন থাকে। জীবন গড়তে, মানুষ হতে একটা বস্তুই মানুষের লাগে, সে হল বই।

এই মন্ত্র ছেলেমেয়েদেরকে দিয়েছিলেন বাবা। মা নতুন করে সেই মন্ত্রই আবার দিলেন ছেলেমেয়েদেরকে। ওই একটা সম্পদ নিয়েই তারা দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর অনেক অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। সেই মা-ও চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে। কিন্তু তাঁদের ছেলেমেয়েরা দশজনই এখন প্রকৃত মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি তেমন মানুষ হয়েছে। তিনজন হয়েছেন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক। কেউ দেশে, কেউ বিদেশের ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছেন। কেউ আছেন সরকারের বড় পদে, কেউ ডাক্তার হয়েছেন। কেউ প্রত্যন্ত গ্রামে স্কুল করেছেন। যত রকমভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে এই মনোভাব। মা-বাবা যে পথ তাদেরকে দেখিয়েছিলেন সেই পথেই তারা এগুচ্ছে। দুজন মানুষ এক অন্ধকার জগতের মাঝখান থেকে মোমের আলো হাতে তাদেরকে আলোর পথে নিয়ে এসেছিলেন। অন্ধকার সমুদ্রে দিশেহারা নাবিকদের জন্য তাঁরা পালন করেছিলেন বাতিঘরের ভূমিকা।

যাঁরা পথ দেখান তাঁরাই তো বাতিঘর। তাঁরাই তো আলোকিত মানুষ। নিজের আলোয় অন্যদেরকে পথ দেখান, অন্যদেরকে আলোকিত করেন।

একজন লেখকের কথা জানি, স্কুল, কলেজের জীবন থেকেই বইয়ের পোকা। বই পড়ার নেশা যেমন, বই সংগ্রহের নেশাও তেমন। জগন্নাথ কলেজে পড়ার সময় ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে সে চলে যেত কলেজিয়েট স্কুলের উল্টোদিককার ফুটপাতে। সেখানে দেশি-বিদেশি নানারকমের বই নিয়ে ফুটপাতে বসে বই বিক্রি করে বইঅলারা। এক বুড়োমতো বইঅলা দেয়ালে হেলান দিয়ে উদাস হয়ে বসে থাকেন। বই বিক্রির চেয়ে চুরিই যায় বেশি। সেই যুবকও বই নাড়াচাড়ার ছলে পছন্দের বই প্রায়ই চুরি করত। বেশ কয়েকটি বছর এই কাজটা সে করেছে। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। একদিন বাংলাবাজার যাওয়ার পথে হঠাৎ তার ইচ্ছে হল, দেখি তো একটু সেই বইঅলা বুড়ো মানুষটা এখনও ফুটপাতে সেভাবে বই নিয়ে বসেন কিনা।

মানুষটি তখনও বেঁচে আছেন। অতিশয় বৃদ্ধ। চোখে মোটা কাচের চশমা। এখনও সেই আগের ভঙ্গিতে দেয়ালে হেলান দিয়ে সামনের ফুটপাতে বই ছড়িয়ে উদাস হয়ে বসে থাকেন। লেখক তাঁকে গিয়ে বলেছেন, কেমন আছেন আপনি? আমাকে চিনতে পেরেছেন?

তিনি হাসলেন। না, শরীর তেমন ভালো না। তবে তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমি আমার এখান থেকে কত বই চুরি করেছ।

লেখক হতভম্ব। আমি যে বই চুরি করতাম আপনি জানতেন?

জানব না কেন? প্রায়ই তো দেখতাম, বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে টুক করে একটা বই তুমি কোমরের কাছে প্যান্টের ভেতর গুঁজে ফেলতে। তারপর শার্টটা এমন করে টেনে দিতে যেন কেউ কিছু সন্দেহ করতে না পারে।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকের বিস্ময় তখন চরমে। আপনি তো এই নিয়ে কখনও কিছু বলেননি? আপনার ক্ষতি হচ্ছে তা-ও আপনি চুপচাপ থাকতেন কেন?

সেই মহান বইঅলা তারপর অদ্ভুত কিছু কথা বললেন— একটা ছেলে পড়তে চাচ্ছে, বইটা তার পছন্দ হয়েছে, টাকা থাকলে নিশ্চয় সেটা সে কিনত। পারছে না বলেই তো ওভাবে বইটা সে সংগ্রহ করছে। আমার না-হয় একটু ক্ষতিই হল। ক্ষতিটা আমি মেনে নিতাম একটাই কারণে, ছেলেটা পড়ুক। পড়ে মানুষ হোক।

এই মানুষরাই হচ্ছেন প্রকৃত অর্থে আলোকিত মানুষ। এই মানুষরাই বাতিঘর।

আমাদের সবার প্রিয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার বৃহত্তর পরিসরে এই বাতিঘরের ভূমিকাটি পালন করেছেন। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। যে কেন্দ্রের মূল কাজ ছেলেমেয়েদেরকে বই পড়ানো, তাদের হাতে বই তুলে দেয়া। চিন্তা-চেতনায় এবং কর্মে তারা যেন হতে পারে আলোকিত মানুষ এই মন্ত্র দীক্ষা দিলেন সমগ্র জাতিকে। 'আলোকিত মানুষ চাই' এই মহৎবাক্য গেঁথে দিতে চাইলেন একটি জাতির অন্তরে। যে বীজমন্ত্র তিরিশ বছর আগে বপন করা হল, ধীরে ধীরে সেই মন্ত্র আচ্ছন্ন করল একটি জাতিকে। বইয়ের আলোয় পথ দেখতে শুরু করল আমাদের ছেলেমেয়েরা। নানারকম আয়োজনের মধ্য দিয়ে, নানারকম প্রতিযোগিতা এবং কর্মশালার মধ্য দিয়ে বইমুখী করে তোলা হল ছেলেমেয়েদেরকে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র হয়ে উঠল জাতির বিবেকের কেন্দ্র, আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার কেন্দ্র। বলতে গেলে একক প্রচেষ্টায়, বহু রকমের ত্যাগের বিনিময়ে কাজটি করলেন সায়ীদ স্যার। আমরা যারা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, তাঁকে জানি, আমরা জানি এই ব্রতে ব্রতী হওয়ার পর তিনি কখনও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভাবেননি। পরিবার, স্ত্রী-কন্যা নিয়ে ভাবেননি। তাঁর ধ্যান জ্ঞান প্রেম পুরোটা জুড়ে ছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, আলোকিত মানুষ তৈরির চিন্তা।

আমাকে একদিন একটা কথা বলেছিলেন তিনি— 'আমি জীবনে টাকার কথা ভেবে কোনও কাজ করিনি।' শুনে কেঁপে উঠেছিলাম। নিজেকে এত ক্ষুদ্র মনে হয়েছিল স্যারের সামনে। মনে হয়েছিল আমি দাঁড়িয়ে আছি বিশাল এক হিমালয়ের পায়ের কাছে। মাথা তুলে যতটা উপর দিকে তাকাই-না কেন, হিমালয়ের চূড়াটা তবু দেখতে পাই না।

আমরা তো টাকার কথা ভেবেই সব কাজ করি! আর এই একজন ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

ভাবতে ভালো লাগে, গভীর আস্থা এবং ভরসায় বুক ভরে যায়, আমাদের আর কিছু থাক না থাক, আমাদের আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আছেন। আমাদের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আছে। আমাদের অন্তত একটি বাতিঘর আছে। গভীর সমুদ্রে পথ হারানো মানুষ আমরা ওই বাতিঘরের আলোয় পথ চিনতে পারব।

২০০৯

ইমদাদুল হক মিলন : সাহিত্যিক
সম্পাদক, কালের কণ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহন রায়হান

অদ্বিতীয় তিনি

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এ জগতে একজনই। আছেন অনেক আবদুল্লাহ। পাওয়া যাবে আবু। মিলবে সায়ীদও। কিন্তু এ তিনের সমাহার আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একজনই। কথায় কাজে মানে মহিমায় তিনি অদ্বিতীয়। তিনি আমার শিক্ষক। আমার সৌভাগ্য তাঁর সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভের সুযোগ হয়েছে। সৌভাগ্য হত না যদি না ঢাকা কলেজে পড়তাম। আইএ-র পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ভর্তি হওয়া হয়নি। ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীনতার অঙ্গীকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল মুক্তিযোদ্ধাদের দলে যোগ দিয়েছিলাম। এর ধারাবাহিক পরিণতিতে এইচএসসি দিতে হয়েছিল কারাগারে বসে। পরীক্ষা পাসের খবরও শুনতে হয়েছে কারাগারে। পঁচাত্তরের পরিবর্তনে যখন মুক্তি পেলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ভর্তি তখন শেষ। শেষমেশ ঢাকা কলেজে অনার্সে ভর্তির কথা ভাবি। দেশে সামরিক শাসন। পুনরায় গ্রেফতার এড়াতে বাবা ও বড়ভাই পাবনা জেল থেকে সরাসরি ঢাকায় নিয়ে আসেন। সিরাজগঞ্জ যেতে দিলেন না। আমি তখন সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর। সামাজিক বিপ্লব করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ। লেখাপড়া ছেড়ে সশস্ত্র গণবাহিনীতে যোগ দিয়ে একজন ভূতলবাসী গেরিলা যোদ্ধা। গ্রামে গ্রামে যুবক ও কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত। সে অবস্থায় গ্রেফতার হই। নকশাল বাহিনী দ্বারা আওয়ামী লীগের চার নেতার হত্যা মামলায় ক্ষমতাসীনরা আমাকে মিথ্যা আসামি করে। দুই বছর বিচার চলে। রায়ে আসল আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় আর আমার নিঃশর্ত মুক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবার ইচ্ছে ছিল এসএসসির মতো সায়েন্স নিয়েই ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ডাক্তারি পড়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত খোকশাবাড়ি হাসপাতালে যোগ দেই। কিন্তু আমার রাজনৈতিক নেতা আব্দুল লতিফ মির্জা আমাকে রাজনীতিক বানানোর জন্য জোর করে সিরাজগঞ্জ কলেজে আর্টসে ভর্তি করে দেন। আমারও ইচ্ছা ছিল পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ার। কিন্তু কেন যেন তখন রাজনীতিকের চেয়ে কবি হওয়ার বাসনা বেশি পেয়ে বসে। সিদ্ধান্ত নিলাম ঢাকা কলেজে বাংলা সাহিত্যে পড়ব। যথারীতি ভর্তি পরীক্ষা দিলাম। এমনকি সে পরীক্ষায় প্রথম হলাম। একদিন বিভাগীয় প্রধান রওশন আরা রহমান শিক্ষকদের পরিচয় করিয়ে দিলেন— নজিবর রহমান, আবদুর রহমান, কামাল আতাউর রহমান, ফরিদা আখতার জাহান, খুরশিদ জাহান, সুলতানা পারভিন ...। তাঁদের সঙ্গে আরেকজন অনুপস্থিত শিক্ষকের নাম শুনে চমকে উঠলাম— আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। লেখালেখির সূত্রে *কণ্ঠস্বর* সম্পাদক হিসেবে এ নাম আমি জানতাম। তিনি ঢাকা কলেজের শিক্ষক তা জানতাম না। আর তিনি আমার শিক্ষক হবেন, আমি তাঁর সান্নিধ্য পাব, কল্পনাও করিনি। আমার ভিতরে অদম্য আনন্দ আর কৌতূহল জেগে উঠল। তাঁকে দেখার জন্য তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য সেদিন সারাবেলা উন্মুখ হয়ে থাকলাম— এই বুঝি এলেন, এই বুঝি ... কিন্তু না, সকাল গড়িয়ে বিকেল হল। হৃদয়-মনের শিহরণের ঢেউ আস্তে আস্তে স্তিমিত হল। কিন্তু আমার স্বপ্নের নায়ক এলেন না। মনটা খারাপ হল। আর অপেক্ষার আগুনে পুড়তে লাগলাম।

পরদিন ডিপার্টমেন্টে গেলাম আনন্দ-আশার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে। যদি তিনি আসেন, যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। ভাবতে লাগলাম কেমন তিনি— রাশভারী অহংকারী নাকি হাসিখুশি অমায়িক? কেমন করে কথা বলেন— বিশুদ্ধ বাংলায় নাকি আঞ্চলিক উচ্চারণে? তিনি আমাদের কোন বিষয়ে পড়াবেন? নানা প্রশ্ন মনে উদয় হল। ডিপার্টমেন্টের পিয়ন সোলেমানকে জিগ্যেস করলাম, সায়ীদ স্যার কি আজ আসবেন? বলল— হ, স্যার তো আসেই। আবার অপেক্ষা। ডিপার্টমেন্টের সেমিনার রুমে বই পড়ছি। কিন্তু চোখ বারবার দরজার দিকে যাচ্ছিল। আগের দিন প্রায় সব শিক্ষকের সাথে পরিচয় হয়েছে। আজ নতুন কেউ এলেই বোঝা যাবে ইনিই তিনি। বেলা এগারটার দিকে পাঞ্জাবি-পাজামা পরিহিত একজনকে টিচার্সরুমে যেতে দেখলাম। আমার হৃৎস্পন্দন বাড়ল। উঠে গিয়ে সোলেমানকে জিগ্যেস করলাম— এইমাত্র যিনি ঢুকলেন ... হ, উনিই তো সায়ীদ স্যার। হার্টবিট আরও বাড়ল। কখন মুখোমুখি হব? হাঁ, আজ তাঁর ক্লাস আছে। আমার চরম উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি ক্ল্যাসে এলেন। সামনের বেঞ্চে বসেছিলাম। গভীর মনোযোগে তাঁকে দেখছিলাম। সুদর্শন। মাথায় একরাশ চুল।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নভরা প্রত্যয়দীপ্ত চোখ। প্রথম দেখাতেই ভালোলাগার মতো সুন্দর মুখ। ভীষণ ভালো লেগে গেল। একবেলা একরাত একদিনের আশা-নিরাশার দোলাচল দূর হয়ে অদ্ভুত আনন্দে মন ভরে উঠল। মনে হল, বহু প্রতীক্ষার পর স্বপ্নেদেখা এক রাজাকে বাস্তবে দেখলাম। হ্যাঁ, একজন রাজার মতোই সব স্তব্ধতা ভেঙে তিনি সুকণ্ঠের সুললিত স্বরমধু ছড়িয়ে দিলেন। মনে হল, এইমাত্র স্বর্গ থেকে কোনো শব্দদেব নেমে এসে তাঁর সর্বগ্রাসী শব্দভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন। কবিতার মতো সুন্দর শব্দের বুননিতে এমন চমৎকার কথা শোনা আমার জীবনে সেই প্রথম। মনে হল তিনি শব্দের যাদুকর, একজন জীবন্ত কথাশিল্পী। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম তাঁর অমিয় বাণী। ক্লাস যেন পরিণত হয়েছিল স্বর্গপুরীতে। যেন কোনো দেবতা তার শিষ্যকুলকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল অলৌকিক অনুভূতিতে।

অনেকে হয়তো ভ্রু ভাঁজবেন, দেবতা! হ্যাঁ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর ছাত্রদের জীবনে প্রায় দেবতার মতোই। কালক্রমে তিনি মহান শিক্ষক বা বিশিষ্ট মানুষ হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তাঁর আবির্ভাব সেরকমই। সারা পৃথিবীতে তাঁর ভক্ত ছাত্র অনুসারীদের কাছে তিনি জীবন্ত কিংবদন্তি। তাঁর সমালোচক-নিন্দুকের অভাব নেই। কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের কাছে তিনি সবসময়ই প্রিয়। তিনি আমাদের প্রিয় শিক্ষক প্রিয় লেখক প্রিয় সংগঠক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম ক্লাসে তিনি কেবল সুন্দর কথায় মুগ্ধ করেননি, অনেক অপ্রিয় সত্যকথা বলেও শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় আপ্লুত করেছিলেন। তাঁর শুরু ছিল এরকম— কি হে, বাংলা পড়তে এসেছ কেন? পড়া আর পাস করা সহজ ভেবে? বাংলা সাহিত্য জানতে, আস্বাদন করতে কিংবা সাহিত্যচর্চার জন্য তো বাংলা পড়তে আসোনি। অন্য সাবজেক্টে চান্স না পেয়ে আর পাস করা সহজ হবে ভেবে বাংলা পড়তে এসেছ। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে পড়ে ডিগ্রি নেয়া সহজ না। অন্য সাবজেক্টের চেয়ে অনেক বেশি পড়তে হবে বাংলায় ডিগ্রি নিতে। শুধু ডিগ্রি নেয়াই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে বাংলা না পড়ে অন্য কিছু পড়া ভালো ছিল। বাংলায় এমএ হতে হলে অনেক জানতে হবে। পড়তে হবে। এখানে পড়ার বিকল্প নেই। আর আমার ক্লাস পরীক্ষা পাসের জন্য নয়, আনন্দের জন্য। আরো যা তিনি বলেছিলেন তা ছিল প্রকৃত মানুষ হওয়ার কথা। সভ্য সুন্দর সংস্কৃত তথা আলোকিত মানুষ হওয়ার কথা। স্বপ্নের সমান বড় হওয়ার কথা। কথাগুলোর পিছনে তাঁর যুক্তি তথ্য তত্ত্ব এমন ভাব ভাষা ও উচ্চারণমাধুর্যে উপস্থাপন করেছিলেন যে, জীবনের ব্রত হিসেবে তা গ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমাদের প্রথম ক্লাসেই সারাজীবনের জন্য জয় করেছিলেন। জয় করেছিলেন শিক্ষক অভিভাবক আর পথ দেখাবার গুরু হিসেবে। আমার বিশ্বাস সেদিন সেই ক্লাসে যারা উপস্থিত

ছিলাম, সবার জীবনেই আজীবন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার সেই আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন। জীবন বাঁচাবার সংগ্রামে আজ আমরা যে যেখানেই থাকি, সায়ীদ স্যার আছেন হৃদয়-চেতনার সম্পদ হয়ে। অনুপ্রেরণার অফুরান উৎস হয়ে।

প্রথম দিনের ক্লাস শেষেই স্যারের সঙ্গে কথা বললাম। ভালোলাগার কথা, মুগ্ধতার কথা। জানালাম, আমি লিখি। জিগ্যেস করলেন, কী লেখো? কবিতা। গদ্যও লিখি। ভালোই হল, একজন অন্তত পাওয়া গেল। বললাম— স্যার, আরো আছে। তাহলে তো বেশ ভালো। বাংলা ডিপার্টমেন্টে লেখক-কবি থাকবে না তা হয়?

স্যারের সঙ্গে এভাবেই সম্পর্কের সূত্রপাত। ধীরে ধীরে আসে ঘনিষ্ঠতা। আমি ছাড়াও বাংলা বিভাগে লেখার সঙ্গে জড়িত ছিল মিলু চৌধুরী, নুরুল ইসলাম (কবি ফজলে রায়হান), মুকুল পারভেজ, আব্দুল হালিম, আমীরুল আরহাম, আব্দুল্লাহ আল হারুন খসরু প্রমুখ। ফলে আমাদের কয়েকজনকে পেয়ে স্যার যেন স্বস্তি পেয়েছিলেন। সাহিত্যপিপাসু ছাড়া আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ কাকে তাঁর বোধ বিতরণ করবেন, কে তাঁর ভাষা বুঝবে? স্যার ক্লাসে সিলেবাসের বইয়ের কিছুই পড়াতেন না। শিল্প সাহিত্য দর্শন ইতিহাস জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন। আমরা কবিতা লিখতাম বলে কবিতা নিয়ে কথা বলতেন। কবিতার ভাষা শব্দ ছন্দ উপমা উৎপ্রেক্ষা চিত্রকলা বিষয়ে স্যারের কাছ থেকে আমরা ধারণা পাই। তিনি আমাদের নীরেন্দ্রনাথের *কবিতার ক্লাস* বইটি পড়তে বলেন। এত সহজ ভাষায় কবিতা বিষয়ক এমন চমৎকার বই আমরা তখনও পড়িনি। স্যারের কাছে আমার অনেক ঋণের মধ্যে এ ঋণের কথা কখনো ভুলবার নয়।

একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে আলোকিত মানুষ গড়ার স্বপ্ন তাঁর আজীবনের। আমরা ধন্য তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের শুরুর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম। আমরা যখন ঢাকা কলেজে, একদিন তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন। তিনি একটি প্রতিষ্ঠান গড়তে চান যেখানে আলোকিত মানুষ তৈরি হবে। আর তা হবে বই পড়ার মাধ্যমে। সেই সময় কয়েকজন ছাত্র আর কাছের মানুষ নিয়ে তিনি স্বপ্নযাত্রা শুরু করেন। ঢাকা কলেজের পাশে শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রের গ্যালারিতে আজকের আলোকিত মানুষ গড়ার কারখানা 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' শুরু হয়। আব্দুল মান্নান সৈয়দ, জুয়েল আইচ, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, আলী রীয়াজ, মোহন রায়হান, মিজারুল কায়েস, জাফর ওয়াজেদ, লিয়াকত আলী, মিলু চৌধুরী, নিজাম, সুশীল সূত্রধর, নুরুল ইসলাম, মুকুল পারভেজ, আব্দুল হালিম, আমীরুল আরহাম, আব্দুল্লাহ আল হারুন খসরু, হেদায়েতুল ইসলাম, রুহুল আমিন, আমির আলী মাহমুদ এবং আরও কয়েকজন সেই স্বপ্নদিনে উপস্থিত ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবার ক্লাসে একটা করে বই পড়তে দেয়া হত। পরের ক্লাসে সেই বই নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা। মনে পড়ে সেদিন সবাইকে নিজের পরিচয় দিতে হয়েছিল। আমার পালা এলে বলেছিলাম— 'আমি শালা এক বাঘের বাচ্চা চোখ দু'টো তো জ্বলে,/ বাবরী মাথায় লোমশ শরীর আগুন বুকের তলে।' ক্লাসজুড়ে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সেই যাত্রা কখনো থামেনি। বাংলামটরে নিজস্ব আধুনিক ভবনে বইয়ের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলে আর নানা কর্মসূচি পালন করে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরন্তর আলো ছড়াচ্ছে— আলোকিত মানুষ গড়ার কেন্দ্র হিসেবে। কিন্তু এর পিছনে স্যারের যে শ্রম কষ্ট বেদনা রক্তক্ষরণ হয়েছে তা অনেকেই অনুভব করতে পারবে না। এই ঈর্ষা হিংসা হীনতা দীনতা লোভ লালসার শাসন ও সমাজব্যবস্থার ভিতর থেকে কীভাবে যে স্যার দেশের মননশীলতার প্রতিভূ এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুললেন, ভেবে অবাক হই। এখানেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এক অদ্বিতীয় অতুলনীয়। তিনি নিশ্চয় এ সমাজ ও শাসনব্যবস্থাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে নিজের কৌশল ঠিক করেছিলেন। তিনি সবসময় দলনিরপেক্ষ থেকেছেন। এ নিয়ে সমালোচনায় পড়েছেন। দেশের অনেক জরুরি জাতীয় বিষয়ে তাঁর নীরব ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু তিনি অবিচল থেকেছেন। তিনি কখনো রাজনীতিক এমপি মন্ত্রী হতে চাননি বরং তাদের শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। আলোকিত মানুষ করতে চেয়েছেন। 'সবার ওপরে মানুষ সত্য' এ-ই যেন স্যারের জীবনব্রত। তাঁর অনেক ছাত্র আমলা এমপি মন্ত্রী হয়েছেন। অনেকেই দেশ পরিচালনা করেছেন। আজো করছেন। কিন্তু তাঁদের ক'জন সত্যিকারের মানুষ হয়েছেন, মানবপ্রেমিক হয়েছেন? এ বেদনাবোধ থেকেই তিনি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ার চিন্তা করেছেন। তাঁর সে চিন্তা ও স্বপ্নের বাস্তবায়নকে বিপদমুক্ত রাখতে তিনি দলাদলিতে যাননি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তোলার অনড় পরিকল্পনা-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থেকেছেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সব মত ও পথের মানুষকে সুশিক্ষিত আর আলোকিত করতে চেয়েছেন। তিনি কাউকে সুনির্দিষ্ট পথ দেখাতে চাননি। চেয়েছেন পথ চিনে নেয়ার যোগ্য করে তুলতে। এ নিয়ে স্যারের সঙ্গে আমাদের তর্ক হয়েছে। আমরা তাঁকে আমাদের রাজনেতা হিসেবেও দেখতে চেয়েছি। কিন্তু তাঁর কোনো রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল না। ফলে অন্তত আমার পক্ষে বেশি দিন তাঁর ছত্রছায়ায় থাকা সম্ভব হয়নি। তাই বলে স্যারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটেনি। তিনি সব সময় প্লেটো অ্যারিস্টটল ডিরোজিওর মতো আমাদের শিক্ষাগুরু হয়ে আছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রের গ্যালারিতে শুরু হওয়া বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আজ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। অসংখ্য তার সদস্য। তিনি যদি রাজনীতিতে যোগ দিতেন, ক্ষমতার উচ্চাসনে বসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তাতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন হয়তো অপূর্ণ থেকে যেত।

কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি 'কারো সঙ্গে বিরোধ নয়'-এর যে কৌশল নিয়েছিলেন তা ঠিক ছিল। একজন সৎ শিক্ষক হিসেবে তাঁর অর্থ-বিত্ত ছিল না। কিন্তু জীবনে সম্মান আর ভালোবাসার অভাব হয়নি তাঁর। বহু অনুরাগীর অসামান্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা একজন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে সফল করে তুলেছে— জাতি গঠনের বাতিঘর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলতে। একদিকে শূন্যতার বিড়ম্বনা তাঁকে বিমর্ষ করেছে, অন্যদিকে পূর্ণতার বর্ষিত বারি বিভূষিত করেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে লুকিয়ে থাকা অশুভ-অকল্যাণের দানবরা তাঁর মহৎ উদ্যোগকে বাধা দিয়েছে। আবার শুভ-কল্যাণের মানবরা উদার সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন। তিনি খুব প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন কেন্দ্রের ট্রাস্টিবোর্ড গঠন করে। তাতে দেশের কৃতী কিছু মানুষকে একত্র করতে পেরেছিলেন। যেমন শুরু থেকে এ পর্যন্ত রকিব উদ্দিন, ফরিদ উদ্দিন, ড. ইফতেখারুজ্জামান, মনসুর আহমেদ, মিজারুল কায়েস, লুৎফর রহমান সরকার, ড. আতিউর রহমান, মাহবুব জামিল, খন্দকার আসাদুজ্জামান প্রমুখ সহযোগিতা করেছেন তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে। তা না হলে হিংসা দ্বেষ অসূয়া জর্জরিত এদেশে সম্ভব হত না বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো মহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। তাই স্বপ্নবান আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ কাল থেকে কালান্তরে মানুষের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। বেঁচে থাকবেন সবসময়ের স্বাপ্নিক হিসেবে।

ব্যক্তিজীবনে আজকের এই আমি হয়ে ওঠার পিছনে স্যারের অবদান প্রণিধানের। ঢাকা কলেজে ছাত্র হিসেবে তাঁর সান্নিধ্যে না এলে, তাঁর স্বীকৃতি না পেলে যা-ই যতটুকু কবিখ্যাতি তা জুটত না। তাঁর ছাত্র হওয়ায় কবিতা জানার ও বোঝার আগ্রহ আমার বেড়ে যায়। মূলত এ সময়টা আমার লেখক জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। কলেজে তাঁর ক্লাসে যোগ দেয়া, কেন্দ্রের ক্লাসে বইপড়া, আলোচনা, তর্ক-বিতর্কে অংশ নেয়া এবং পুনর্বার প্রকাশিত *কণ্ঠস্বর*-এ ছাপবার উপযোগী লেখার জন্য নিজেকে তৈরির তাগিদ পাই আমি। নিরন্তর নিজেকে বদলাবার তাড়না অনুভব করি ভিতরে ভিতরে। ভাবি, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ কবে বলবেন— তোমার কবিতা 'কবিতা' হয়েছে। ঠিক এ সময়ই ঘটে যায় আমার জীবনের সেই স্মরণীয় ঘটনা।

ঢাকার কবি ও কবিতা জগতে তুলে ধরার জন্য নিজের কিছু কবিতা একত্রিত করে একটি ফোল্ডার প্রকাশ করলাম। তখন ছিল সামরিক শাসনকাল। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোল্ডারের নাম দিলাম 'নিপাত যাক'। সেটা কবি লেখক সাংবাদিক পত্রপত্রিকা বাংলা একাডেমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা কলেজসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দিলাম। একটা আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠল। সে সময় সাহিত্য অঙ্গনে বাংলাদেশ লেখক শিবিরের ভালো অবস্থান। ড. আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আহমদ ছফাসহ অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবী তখন এর নেতৃত্বে। টিএসসিতে লেখক শিবিরের বার্ষিক সম্মেলনে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁর বক্তৃতায় আমার ফোল্ডারটি দেখিয়ে বললেন— 'এই দেখুন একজন নতুন কবির সন্ধান পাওয়া গেছে। আমরা এই রকম কবি চাই, মোহন রায়হানের মতো কবি চাই।' তিনি কয়েকটি কবিতা পড়েও শোনান। আমার বন্ধুমহলে সাড়া পড়ে গেল। রুদ্র, কামাল, জাফর, মুক্তি তখন বেশ নাম করেছে। স্বাভাবিকভাবেই লেখক শিবিরের কবিতা বিষয়ক সেমিনারে তাদের কবিতা আলোচিত হওয়ার কথা, কিন্তু হল আমার কবিতা। সেই যে আমি কবি-বন্ধুদের দৃষ্টি কাড়লাম। কিন্তু আমার মন ভরে না। আমি তো *কণ্ঠস্বর* সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের স্বীকৃতি চাই। একদিন স্যার ক্লাস শেষে ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, আমি পিছু নিলাম। তিনি দোতলা থেকে নেমে টিচার্স লাউঞ্জ হয়ে মেইন গেটের দিকে হাঁটছেন। আমি পিছে পিছে। কিন্তু তাঁর পাশাপাশি হতে পারছিলাম না। বুক টিপটিপ করছে। স্যার যখন গেটের কাছাকাছি, মনের সমস্ত সাহস জড়ো করে পাশে গেলাম। ডাকলাম, স্যার। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি হে? হলুদরঙা কবিতার ফোল্ডারটি এগিয়ে দিলাম। হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি পড়তে লাগলেন। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি তো কবি হে'। বলে সামনের রাস্তা দিয়ে চলতে থাকলেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে তাঁর চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকলাম। একপর্যায়ে দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করলেন— ঘিয়ে পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামায় ব্র্যান্ডেড আমাকে আজীবন কৃতার্থ করা শিক্ষক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তারপর থেকে আমার দশ দিগন্ত জুড়ে কেবলি ধ্বনিত হতে থাকল— তুমি তো কবি হে। তারপর থেকে কবি হওয়ার বাসনায় আমি আজও লিখছি ...

এছাড়াও প্রাক্সিস অধ্যয়ন সমিতি প্রকাশিত আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *আমাদের ঐক্য আমাদের জয়*-এর প্রকাশনা অনুষ্ঠানে স্যার আমার কবিতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা-ও আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বলেছিলেন, 'মোহন নজরুলের মতো দ্রোহী প্রতিবাদী বা বিপ্লবী কবি হিসেবে চিহ্নিত হলেও মোহনের কবিতায় আসলে প্রেমই প্রধান। আমার কাছে মোহনের বিপ্লবের কবিতার চেয়ে প্রেমের কবিতাগুলিই বেশি ভালো লাগে। সবকিছুর আড়ালে কোথায় যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা কান্না লুকিয়ে আছে, একটা তীব্র আবেগ জড়িয়ে থাকে যা কবিতার জন্য জরুরি।' আমার অন্য গ্রন্থ-আলোচনাতেও স্যার উপস্থিত থেকে আমার কবিতা সম্পর্কে উচ্চাশা প্রকাশ করেছেন। আমার কবিতার যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া উচিত এবং আমার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো নির্বাচন করে একটা নির্বাচিত কবিতাগ্রন্থের দাবি রাখে। এমনকি বাংলা একাডেমির বইমেলায় আমার *কবি কাপুরুষ হলে* গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, 'সময় পেলে আমি নিজেই মোহনের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো নির্বাচন করে দেব।' আমি অনুক্ষণ অপেক্ষায় থাকি কবে এই ঘোষণা বাস্তবায়ন করে তাঁর নগণ্য কবিছাত্রের প্রকৃত কাব্যমূল্যায়ন করবেন।

স্যারের সঙ্গে ছোট-বড় অনেক স্মৃতির দুটো আজ এ লেখায় না বললেই নয়। ঘটনা দুটো মৃত জিয়ার আমলের। প্রথমটি আমার ভর্তি হওয়ার বছরের। ঢাকা কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। বিশাল আয়োজন কলেজ অডিটোরিয়ামে। প্রধান অতিথি তখনকার সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার। অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা ও আবৃত্তির জন্য আমাকে পুরস্কার দেয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। আমি জানতাম না। আমাকে যখন পুরস্কার নেয়ার জন্য মঞ্চে ডাকা হল আমি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিলাম সামরিক জান্তার দোসর ভাইস প্রেসিডেন্ট সাত্তারকে কলেজে আনার প্রতিবাদে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করব। মঞ্চে উঠতে উঠতে মনে মনে সামরিক শাসনের প্রতিবাদের কবিতা বানিয়ে ফেললাম। মঞ্চে উঠে সরাসরি মাইকে বললাম, দেশে চলমান সামরিক শাসনের প্রতিবাদে এবং সামরিক জান্তার দোসরকে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করে আনার প্রতিবাদে আমি আমার পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করছি এবং প্রতিবাদে একটি কবিতা পড়ছি— *কলের চাকার মতো যে যুবক অনর্গল সত্য কথা বলে/ রাইফেলের বেয়োনেটের মতো যার বুকের পাটা/ আমি সেই স্পর্ধিত আগুন/ এই সামরিক শাসন স্বৈরতন্ত্র মানি না, মানবো না কোনোদিন*। প্রধান অতিথি, প্রিন্সিপাল ও কয়েকজন শিক্ষক মঞ্চে ছিলেন। কেউ ভাবতে পারেননি আমি এমন কাণ্ড করব। হলভর্তি ছাত্র করতালিতে ফেটে পড়ল। শ্লোগান উঠল— 'সামরিক শাসন মানি না মানব না।' বিচারপতি সাত্তার ক্ষুব্ধ হয়ে চেয়ার ছেড়ে নেমে গেলেন। প্রিন্সিপাল হন্তদন্ত হয়ে তাঁর পিছনে ছুটলেন। আমি বুকটান স্পর্ধিত পায়ে মঞ্চ থেকে নেমে এলাম। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা ও কর্মী, সাধারণ ছাত্ররা আমাকে জড়িয়ে ধরল। বাহবা দিল। আমার সাহসের তারিফ করতে লাগল। অনুষ্ঠান প্রায় পণ্ড। শিক্ষকরা কোনো রকমে প্রধান অতিথি ছাড়াই অনুষ্ঠান শেষ করে দিলেন। সারা কলেজে হৈ চৈ পড়ে গেল।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন ছাত্রদের সে কী উল্লাস। বাপের বেটা। কাজের মতন কাজ করেছে। কলেজ ক্যান্টিনে আমাকে দেখার জন্য তাদের ভিড়। আমি রাতারাতি নায়ক হয়ে গেলাম। কিন্তু ডিপার্টমেন্টে যেতেই বিভাগীয় প্রধান রওশন আরা রহমান ভীষণ ক্ষিপ্ত হলেন— এটা কী করলে তুমি? ডিপার্টমেন্টের মানসম্মান ধুলায় লুটিয়ে দিলে! প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেতাই বকলেন। বললেন— তোমাকে ডিপার্টমেন্ট থেকে বের করে না দিলে তিনি আমাকেই কলেজে রাখবেন না। আপার উচ্চকণ্ঠ কথাবার্তায় অসহায়ের মতো অনেক ছাত্র-শিক্ষক আমার চারপাশে ভিড় করল। সবাই আমার পরিণতি দেখার আশংকায় নিশ্চুপ। আমি কিছু বলার চেষ্টা করলেও আপার ধমকে বলতে পারলাম না। এই সময় কোথা থেকে সায়ীদ স্যার এসে হাজির। অবস্থা দেখে রওশন আপাকে জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে খালা? কী আর হবে, তোমার প্রিয় ছাত্রের কাণ্ড কিছু শোনোনি? না তো। আপা সব বললেন। এ-ও বললেন, প্রিন্সিপাল এখন ওর সাথে সাথে আমাদেরও তাড়াবে, দেখবে। শুনে স্যার হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন— বলেন কী, এ তো সাংঘাতিক কাণ্ড করেছে মোহন! সাবাস। এইতো চাই। স্যারের কথায় সবাই থ। স্যার বললেন, খালা চলেন তো ওকে নিয়ে প্রিন্সিপালের রুমে, দেখি তিনি কী করেন। আমাকে বললেন, চলো হে দেখি। এই বলে বীরের মতো বুক টান করে রওশন আপা আর আমাকে নিয়ে প্রিন্সিপালের রুমে ঢুকলেন। বললেন, স্যার কী হয়েছে? আমাকে দেখে প্রিন্সিপাল আলী আহমদ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, এই বেয়াদপটাকে কেন আমার সামনে নিয়ে এসেছেন? ওর জন্য কলেজের মানসম্মান সব গেছে। ভাইস প্রেসিডেন্টকে অপমান করেছে। এখন দেখবেন কী অবস্থা হয় কলেজের। ওকে ফোর্স টিসি দিয়ে বের করে দিতে হবে। না হলে রক্ষা নেই। সায়ীদ স্যার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, না স্যার, ওকে ফোর্স টিসি দেয়া যাবে না। ও এই কলেজেই পড়বে। এ রকম দু'চারজন ছাত্র তৈরির জন্যই তো ঢাকা কলেজ। প্রিন্সিপাল হা হয়ে গেলেন। রওশন আপা কর্তব্যবিমূঢ়। প্রিন্সিপাল সাহেব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে জানতেন। তিনি শুধু বললেন, ঠিক আছে আপনি সামলান সব। স্যার বললেন— ঠিক আছে, যা হয় দেখা যাবে। আমাকে বললেন, চলো হে চিন্তা নেই। আরো সাহসী কবিতা লেখো।

ইতোমধ্যে কলেজে মিছিল বের হয়ে গেছে— মোহন রায়হানের বহিষ্কার আদেশ মানি না, মানব না। প্রিন্সিপালের রুমের সামনে ছাত্রদের ভিড়। আমাকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে তারা সোচ্চার। আমি সবাইকে শান্ত করলাম। বললাম, আমার বহিষ্কার আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার ঠেকিয়ে দিয়েছেন। আমার শিক্ষাজীবন রক্ষায় স্যারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিনের সাহসী ভূমিকার ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না। একজন প্রকৃত শিক্ষক আর অভিভাবকের এ এক বিরল ইতিহাস। এজন্য বলতে হবে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অনন্য।

জিয়াউর রহমান তখন ক্ষমতায়। দেশজুড়ে অসন্তোষ। ক্ষোভ-বিক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত হল সরকারি কলেজ শিক্ষক ধর্মঘট। স্বাভাবিকভাবে ঢাকা কলেজ তার কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষকরা ক্লাস বর্জন করেছেন অনেকদিন। সরকার তাঁদের ন্যায্য দাবি মানছে না। ছাত্ররা কলেজে আসে। ক্যান্টিনে ক্লাসে করিডোরে মাঠে বাগানে বেঞ্চে আড্ডা দিয়ে চলে যায়। আমার জন্য বেশ ভালো হল। এমনিতেই তেমন ক্লাস করি না। ডিপার্টমেন্ট বা ক্যান্টিনে ঢুঁ দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাই। সেখানে মিছিল-মিটিং করি। হাকিম চত্বর, লাইব্রেরি বারান্দা, ডাকসু ক্যাফেটেরিয়া, টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ায় রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, কামাল চৌধুরী, আলী রীয়াজ, সলিমুল্লাহ খান, জাফর ওয়াজেদ, আওলাদ হোসেন, তুষার দাশ, রেজা সেলিম, মঈনুল আহসান সাবের, আলমগীর রেজা চৌধুরী, শাহজাদী আঞ্জুমান আরা মুক্তি, আহমেদ আজিজ এসব লেখক-কবি বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দেই। শিল্প সাহিত্য রাজনীতি আন্দোলনের পরিকল্পনা করি।

একদিন সকালে ঢাকা কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছি। কলেজের শহীদ মিনারের কাছে দেখি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, কামাল আতাউর রহমানসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক জটলা করছেন। কী ব্যাপার? এগিয়ে গিয়ে স্যারকে জিগ্যেস করলাম, কী হয়েছে স্যার? স্যার খুব উত্তেজিত।

'কী বলব মোহন, শিক্ষকজীবনে এমন প্রিন্সিপাল দেখিনি। শিক্ষকরা ধর্মঘট করেছেন বলে টিচার্স রুমে তালা দেয়া হয়েছে, আমাদের বসতে দেবেন না। তিনি একাই সরকারের পক্ষে, শিক্ষকদের বিপক্ষে।'

'কী বলেন স্যার, শিক্ষকদের রুমে তালা ঝুলিয়ে তাঁদের বসতে দেবেন না? শিক্ষকরা কি এই বাগানে আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন? চলেন স্যার, প্রিন্সিপালকে দেখছি। আপনারা প্লিজ আমার সঙ্গে আসেন।'

শিক্ষকরা আহ্বানে সাড়া দিলেন। কলেজ বাগানের এক জায়গায় কিছু ইট ছিল। আমি সেখান থেকে একটা ইট হাতে নিয়ে শিক্ষকদেরসহ টিচার্স লাউঞ্জের সামনে গেলাম। ধমাধম ইট মেরে টিচার্স রুমের তালা ভেঙে বললাম, যান স্যার আপনারা ভিতরে যান, আপনাদের রুমে আপনারা বসেন। আমি দেখছি কোন অধিকারে প্রিন্সিপাল টিচারদের রুমে তালা দিয়েছেন। ইতোমধ্যে সাধারণ ছাত্ররা সেখানে জড় হয়েছে। আমি তাদের নিয়ে প্রিন্সিপাল আলী আহমেদের রুমের দিকে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলাম। পেছন থেকে সায়ীদ স্যার উঁচু স্বরে বললেন, মোহন, স্যারের সঙ্গে যেন বেয়াদবি কোরো না। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আমার তখন রক্ত মাথায় উঠে গেছে। সোজা প্রিন্সিপালের রুমে ঢুকে বললাম, স্যার আপনি টিচারদের রুমে তালা দিয়েছেন কেন? স্যাররা বসবেন কোথায়? তিনি ভীষণ রেগে বললেন, সে কৈফিয়ত কি তোমাকে দিতে হবে?

'জ্বি স্যার, আমরা আমাদের শিক্ষকদের অপমান মেনে নেব না।'

'তাঁরা ক্লাস নেবেন না, ধর্মঘট করবেন, তাহলে টিচার্স রুমে বসবেন কেন?'

'স্যার, এটা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার। তাঁদের দাবি ন্যায্য। এই দাবি তো একজন শিক্ষক হিসেবে আপনারও দাবি। আপনার উচিত এই দাবি আদায়ের জন্য সরকারের সঙ্গে কথা বলা। আমরা চাই অবিলম্বে শিক্ষকদের দাবি মেনে নিয়ে সারাদেশে কলেজগুলো খুলে দেয়া হোক। এই সরকার তো স্বৈরাচারী। আপনি তার দালালি করছেন। আপনি আর কলেজে আসবেন না। এখন বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন। শিক্ষকদের তাঁদের রুমে বসতে না দিয়ে যে অপমান করেছেন তার প্রতিবাদে আমরা আপনার রুমে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে আমি তাঁর পিয়নের কাছ থেকে রুমের তালাচাবি নিয়ে তাঁকে ভিতরে রেখে তালা দিয়ে ছাত্রদের নিয়ে মিছিল বের করলাম। শ্লোগান দিলাম— শিক্ষকদের দাবি আমাদের দাবি, এই দাবি মানতে হবে। শিক্ষকদের দাবি ন্যায্য দাবি, মানতে হবে মেনে নাও। শিক্ষকদের দাবি মেনে নিয়ে, অবিলম্বে কলেজ খোলো।

ক্যান্টিনে মিছিল শেষ করে ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সাথে মিটিং করলাম। সারাদেশের সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে তাঁদের দাবির সমর্থনে 'বাংলাদেশ সরকারি কলেজ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করলাম। আমাকে আহ্বায়ক আর মুজিববাদী ছাত্রলীগের কামরুলকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হল। সিদ্ধান্ত হল অবিলম্বে কলেজগুলো খুলে দেয়ার দাবিতে আমরা মিছিল-মিটিং ঘেরাও স্মারকলিপি প্রদানসহ সর্বাত্মক আন্দোলন করব। এ আন্দোলন জোরদার করতে ঢাকার সব সরকারি কলেজ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি নিয়ে 'সরকারি কলেজ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে। সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির সঙ্গেও যোগাযোগের সিদ্ধান্ত হল। জানলাম, বদরুন্নেসা কলেজের প্রিন্সিপাল জাহানারা বেগম সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতির প্রেসিডেন্ট। সমিতির কার্যক্রম তাঁর অফিসেই চালানো হয়। আমি ও কামরুল মিটিং শেষ করে বদরুন্নেসা কলেজে রওনা হলাম। গেটে খবর নিয়ে দোতলায় প্রিন্সিপালের রুমের কাছে যেতেই চেনা কণ্ঠের কথা ভেসে এল— 'আপা আর বলবেন না, কী কাণ্ড আজ ঢাকা কলেজে ঘটে

গেল। আলী আহমদ তো টিচার্স রুমে তালা দিয়ে আমাদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছিল। আমার এক ছাত্র মোহন রায়হান এ কথা শুনে তালা ভেঙে আমাদের ভিতরে ঢোকার ব্যবস্থা করল। আর প্রিন্সিপালকে তাঁর রুমে বন্দি করে রাখল...' বলেই হো হো করে হাসতে থাকলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। নাটকীয় ঘটনার মতো ওই হাসি থামতে না থামতেই আমি ও কামরুল ভিতরে ঢুকলাম। আমাদের দেখে স্যার আনন্দে বিস্ময়ে উল্লাসে বললেন, আরে কী কাণ্ড! বলতে না বলতেই আমাদের হিরো হাজির। আপা এই যে, এই সেই মোহন রায়হান। জাহানারা আপাসহ অন্য শিক্ষকরা খুশি হয়ে আমাদের বসতে বললেন। চা-মিষ্টির অর্ডার দিলেন। আমরা কেন গিয়েছি সব বললাম। আন্দোলনের সমর্থনে ছাত্ররা এগিয়ে আসায় তাঁরা ভীষণ ভরসা পেলেন। শিক্ষক সমিতি এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ একসাথে আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত হল। কলেজের একটি কক্ষ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাজের জন্য দেয়া হল। বদরুন্নেসা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ডেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হল। আমরা যুক্ত হওয়ায় নতুন শক্তিতে আন্দোলন নতুন রূপ পেল। সারাদেশে সরকারি কলেজের ছাত্রনেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করায় সংগঠনের বিস্তার ঘটল। দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠল। বঙ্গভবন পর্যন্ত ঘেরাও করা হল। আন্দোলনের চাপে শিক্ষকদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হল সরকার। ওই আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে আমরা 'ধর্মঘট' নামে একটি কবিতা বুলেটিন বের করি। দেশের খ্যাতিমান কবিরা তাতে ছড়া-কবিতা লিখেছিলেন।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের সঙ্গে আমার এরকম আরও স্মৃতি আছে। সব লেখার পরিসর এটা নয়। যদি কখনো জীবনস্মৃতি লিখি স্যারের কথা আসবে। তাঁকে বার বার স্মরণ করতে হবে। আমার জীবনের সঙ্গে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এক অবিচ্ছেদ্য নাম। আমি জীবনে দুটি প্রধান কাজ করেছি— লেখালেখি আর রাজনীতি। লেখার কাজটি স্যারের ভূমিকাপুষ্ট। তাঁর স্নেহ সৌহার্দ্য প্রেরণা প্রশ্রয় আমার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বেদনাদগ্ধ জীবনে অন্তহীন শক্তির উৎস। চরম দুর্দশায় যখন দিশেহারা হই, অতল অন্ধকার যখন চারদিক ঘিরে ফেলে, আমাকে নতুন পথ দেখায়, চলার নতুন সাহস জোগায় স্যারের সেই অমোঘ বাণী— 'তুমিতো কবি হে'।

২০১৪

মোহন রায়হান : কবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাবীব আহসান

ঋদ্ধিমান মহীরুহ

"আমাদের কাছে সেই ব্যক্তিই অভিজ্ঞ বলে বিবেচিত; যিনি নিজ হাতে তাঁর কাজ করেন, অন্যকে করতে দেখে শেখেন এবং তাঁর পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের করা কাজগুলো মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে, অনুধাবন করে, নিজের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেন।"

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রাজ্ঞ এই সুধীজনকে মূল্যায়ন করার অপচেষ্টার ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস আমার নেই।

এ বিষয়ে আমি নেহাতই অপোগণ্ড এবং মূর্খ। তাঁকে নিয়ে আমি শুধু আমার ভালোলাগার কথাই বলতে চাই।

সব মিলিয়ে এই মানুষটিকে আমার খুব ভালো লাগে। হেলেন হান্ট জ্যাকসন নামের একজন লেখিকা বলেছেন— "যদি তুমি কাউকে ভালোবাসো তাহলে আজই তা মুখে বলো, জীবনের পরপারে নীরবতা অসীম। কাউকে ফুল দিতে হলে সে বেঁচে থাকতে দাও। যদি কাউকে ভালো লাগে তো তার প্রশংসা করো।" এই লেখার মাধ্যমে আমি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে আমার ভালোবাসার কথা জানাতে চাই। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় যদিও তাঁকে শিক্ষক হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি; কিন্তু তাঁকে আমি গুরু বলে মান্য করি।

আকাশের মতো অসীম স্বপ্নচারী সায়ীদ স্যারের পড়া-লেখা, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সামাজিক-সচেতনতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানব-কল্যাণে প্রাণের নিবেদন, দার্শনিক মনোভঙ্গি, কর্ম-প্রচেষ্টা, বাঙালিয়ানার প্রতি বিনম্র আকুলতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত দেশপ্রেমের বাঙ্ময়তা এবং সর্বোপরি আলোকিত হওয়ার ও আলোকিত করবার দুর্দমনীয় অভিলাষ— তাঁকে একজন Stylist ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের Style-Time Independent, চিরায়ত, কালোত্তীর্ণ, ধীতস্থি, স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত, অনুসরণীয়; যা তাঁর সারা জীবনের যৌগিক ফলাফল।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মতো একজন Luminous Personality-কে বুঝে উঠতে আমার সময় লেগেছে প্রায় ৪০ বছর। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে এম.এ পরীক্ষা দিয়ে ভাগ্যের অন্বেষণে ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে ঢাকায় পাড়ি দেই। সদ্য স্বাধীন হওয়া; প্রায় সম্পূর্ণ অচেনা এই বিশাল, জটিল এবং রহস্যময় রাজধানী শহরের কাউকেই আমি চিনি না, জানি না। অনীশ বড়ুয়া নামের অন্তরঙ্গতম বন্ধুর শরণাপন্ন হওয়ার অভিপ্রায়ে একেবারেই অনিশ্চিতের হাত ধরে এই শহরে আমার আগমন। কাঁধে একটি ট্রাভেলব্যাগ আর বুকপকেটে দুটি কাগজ। একটি রেডিও বাংলাদেশ চট্টগ্রাম কেন্দ্রের দেয়া NOC (No Objection Certificate), অন্যটি আমার প্রিয় এবং শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক অধ্যাপক হারুন অর রশিদের (সাবেক মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি) লেখা একটি চিরকুট। চিরকুটে লিখা— 'প্রিয় লালু, পত্রবাহক আমার প্রিয়ভাজন ছাত্র হাবীব। প্রতিভা আছে। ঢাকায় ওর জানাশোনা কেউ নেই। ওকে একটু দেখিস। তোর হারুন।'

লালু মানে সায়ীদ স্যার তখন গ্রিন রোডের অফিসার্স কোয়ার্টারে থাকতেন। রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রযোজক প্রয়াত মনতোষ দা'র কাছ থেকে সায়ীদ স্যারের ঠিকানা জোগাড় করে নিয়ে একদিন সন্ধ্যার পর হাজির হয়ে, হারুন স্যারের দেয়া জীর্ণ চিরকুটটি তাঁর হাতে দিলাম। শিষ্য-সাগরেদ পরিবেষ্টিত সায়ীদ স্যার চিরকুটটি এক নজরে পড়ে নিয়ে খুবই নির্লিপ্ত কণ্ঠে আমাকে বসতে বললেন। তাঁর বসার ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে; ধীরে ধীরে ক্রমাগত বিস্ময় আক্রান্ত হতে থাকলাম।

তিনি তখন তাঁর কর্মীবাহিনীর সাথে *কণ্ঠস্বর* পত্রিকার দ্বিতীয়বার প্রকাশনার বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। আমি *কণ্ঠস্বর* পত্রিকা হারুন স্যারের টেবিলে দেখেছি, হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, এক পলকে যতটুকু চোখ বুলানো যায়— চোখ বুলিয়েছি; পত্রিকাটির বিষয় নির্বাচন, ছাপানোর শোভনীয় আঙ্গিক, সম্পাদকীয় বক্তব্য— সবমিলিয়ে অভিভূত হয়েছি। *কণ্ঠস্বর*-এর

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মান-সম্পন্নতা ও পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের গভীর-ওজন সম্পর্কে হারুন স্যার ও সহপাঠী ঊর্মি রহমানের কাছে অনেক গল্প শুনেছি। নানা কারণে ওটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; আবার শুরু হবে বুঝতে পেরে বেশ পুলকিত বোধ করেছি।

সে রাতে সায়ীদ স্যার তাঁর কর্মীবাহিনীকে সিদ্ধান্ত দিলেন— কবি সিকান্দার আবু জাফর এই পুনঃপ্রকাশনা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন এবং বাংলা একাডেমির মূল ভবনের দোতলার ছোট্ট পরিসরের হলে এই প্রকাশনা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে।

সবাইকে বিদায় দিয়ে সায়ীদ স্যার আমার প্রতি মনোযোগ দিলেন। রাত তখন ১১টা। সেগুনবাগিচার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাসার পেছনের অংশে প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয় একটি গুদামঘরের মতো ঝুপড়িতে বন্ধু অনীশ বড়ুয়ার সাথে আমার বসবাস। ১৯৭৪ সালে ঢাকা শহরে রাত ১১টা মানে ম্যালা রাত। সুনশান রাজপথ, টুংটাং রিক্সার বেল বাজে, দু' একটা বেবিট্যাক্সি উদ্ভট শব্দ করে চলে যায়; ট্রাক চলে, লরি চলে, পাবলিক বাসের দেখা নেই। যাও-বা মুড়ির টিন মার্কা দু'একটা বাস আসে— তাতে বাদুড়ঝোলা যাত্রী। আনকোরা নতুন বাসিন্দা আমি— গ্রিন রোড থেকে সেগুনবাগিচা পাড়ি দেব কী করে! পকেটের মানিব্যাগটাও তেমন ভারি নয়। আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সায়ীদ স্যার নির্লিপ্ত। না, ঠিক নির্লিপ্ত নয়; তিনি তখন চিরকুটটা হাতে নিয়ে কেমন যেন একটা ঘোরের মাঝে মগ্ন ছিলেন। একসময় একটা ছোট্ট প্যাড তুলে নিয়ে লিখতে শুরু করলেন। হঠাৎ লেখা থামিয়ে বললেন— হারুন ক'দিন আগে এসেছিল। তোমার কথা বলে গেছে। তুমি তো নাটক করো।

আমি ঢোক গিলে বললাম— জ্বি স্যার, চেষ্টা করি।

স্যার বললেন— চেষ্টা করতে করতেই হয়। তুমি টিভিতে যাও।

আমি বললাম— তেমন কাউকে চিনি না, মনিরুল আলম সাহেবের সাথে দেখা করব; জিয়া হায়দার স্যার তাঁর সাথে দেখা করতে বলেছেন।

হ্যাঁ, যাও। বাকিটা আমি দেখছি— এই বলে নীরব হয়ে আবার লিখতে শুরু করলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে লিখলেন। লেখা শেষ করে প্যাডের কাগজগুলো আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন— এদের সাথে দেখা করো। কী হয় আমাকে জানিয়ো।

কাগজগুলো হাতে নিয়ে দেখি প্যাডের ডান কোণায় সবুজ কালিতে ছোট ফন্টের ছাপা— আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। স্যার নয়জন মানুষকে নয়টি চিঠি লিখেছেন। দুজন রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা কেন্দ্রের— জনাব টি এইচ শিকদার ও প্রয়াত কবি আবু তাহের; ছ' জন বাংলাদেশ টেলিভিশনের— অনুষ্ঠান বিভাগের পরিচালক— প্রয়াত মনিরুল আলম, প্রয়াত আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রয়াত আব্দুল্লাহ ইউসুফ ইমাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

প্রয়াত মোহাম্মদ জাকারিয়া, বেলাল বেগ ও শফিক রহমান। নবম চিঠিটি ছিল *দৈনিক বাংলা* পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক প্রয়াত কবি আহসান হাবীবের কাছে।

এই নয়টি চিঠি আমার ব্যক্তিজীবনের ওপর; এমনকি আমার পারিবারিক জীবনের ওপরও প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছিল। এই নয়টি চিঠির ফলাফল আমাকে স্বপ্নভুক করে তোলে। টেলিভিশনের মতো শক্তিশালী মাধ্যমে কাজ করার দুর্নিবার বাসনাকে অপরিসীম রকমের তীব্র করে তোলে। এই চিঠিগুলোর ফলে যে টুকটাক কাজ পাই তা দিয়ে আমার কোনো রকমে দিন গুজরান হতে থাকে। টেলিভিশনের কর্মী হওয়ার দুর্বিনীত আকাঙ্ক্ষা অধরা থেকে যায় প্রায় সাত বছর। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাত বছর বেকার জীবনযাপনের কারণে মা বাবা ভাই বোনদের কাছে অচেনা হয়ে পড়ি। অবশেষে ১৯৮০ সালে বিটিভি নামের আগুন-পাখি ধরা দেয়। অনেক কষ্ট, হিংসা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে বিটিভিতে সরাসরি অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে যোগ দেই। অনেক পরিশ্রম, ক্রিয়া এবং সংশোধন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ২৭ বছর কাজ করে সাফল্যের শিখরের কিছুটা কাছাকাছি পৌঁছাবার চেষ্টা করি। একজন মিডিয়া-কর্মী হিসেবে আজ যেখানে পৌঁছেছি; তার পেছনে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল— বিটিভি'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সায়ীদ স্যারের উপস্থাপনায় বিটিভি'র ইতিহাসে দীর্ঘতম ব্যাপ্তির (১২০ মিনিটের) একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান প্রযোজনা করেছিলাম। দলীয় উদ্যোগ আর ১৭ দিনের অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে আমাদের সবার জীবনে সেটি একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান।

আবার আগের কথায় ফিরে যাই। নয়টি চিঠির পর; জীবিকার প্রয়োজনে ব্যাংকে চাকরি করার সময় আবার সায়ীদ স্যারের সান্নিধ্য পাই। তখন তিনি 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র'কে বাড়-বাড়ন্ত করার অভিপ্রায়ে নিরলস পরিশ্রমরত। মতিঝিলের ব্যাংকপাড়ায় আসতেন। রম্য-লেখক, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর, তৎকালীন অগ্রণী ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার প্রয়াত লুৎফর রহমান সরকারের সাথে সায়ীদ স্যারের সখ্য-সম্পর্ক সুবিদিত। তাঁর সুবাদে মতিঝিলের ব্যাংকপাড়ায় এলেই সায়ীদ স্যার আমার অফিসে খানিকটা বিশ্রাম নিতেন। আমিও কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ সেবা করার চেষ্টা করতাম এবং এরই সূত্রে 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে'র আংশিক কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে যাই। কেন্দ্রের সংগীত সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের সাথে আমার একটা হার্দিক সম্পৃক্ততা রয়েছে। এখন প্রতি পূর্ণিমাতে কেন্দ্রের ছাদে জোৎস্নাভেজা রাতে গানের যে আসর বসে তার একজন নগণ্য সেবক আমি। এই উদ্যোগেরও মধ্যমণি এবং প্রেরণাদাতা সায়ীদ স্যার।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান-বাজনার সমঝদারিতেও সায়ীদ স্যার একটা হিমালয় পাহাড়ের মতো। এই মানুষটি আনন্দের ফেরিওয়ালা। আনন্দ, বিনোদন এবং মনোরঞ্জনের তফাৎ সায়ীদ স্যার যেমনভাবে অনুধাবন করেন তেমনটি আর কাউকে দেখি না। মানুষটি সংগীতশিল্পী নন; সংগীতবিদও নন, কিন্তু শ্রোতা হিসেবে বিশ্লেষাত্মক। সংগীতকে সংগীতের মাধ্যমে বুঝে রসগ্রাহী হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ক্লান্তিহীন। তাঁর মননশীল স্বভাব দেখে আমার যা মনে হয় তা হল— "যাহা অকারণে সুন্দর তাহার মতো সুন্দর অন্য কোনো জিনিস নহে। যেখানে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই সুন্দর এবং যেখানে বিনা কারণে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা সেই জন্যই অতি সুন্দর"— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর এই আপ্তবাক্য সায়ীদ স্যার তাঁর অন্তরের গভীর থেকে উপলব্ধি এবং বিশ্বাস করেন।

সায়ীদ স্যারের অনেক অনেক ভালোলাগা গুণাবলির মাঝে তাঁর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আমি ভয় পাই; তা হল— তাঁর সংশয় আক্রান্ত মনোভাব। কখনো কখনো কোনো কোনো কাজ অন্যকে দায়িত্ব দিয়ে; তিনি প্রচণ্ড সংশয় আক্রান্ত হয়ে মানসিক চাপে ভোগেন। অবশ্য তাঁর মতো একজন Perfectionist মানুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। অনুরোধ রইল— দায়িত্ব দিন; কিছুটা ছাড়ও দিন। যে দায়িত্ব নিয়েছে; সে-ও তো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে একদিন Perfection–এর একটা মাত্রায় পৌঁছানোর চেষ্টা করবে।

"ভালোবাসা বাণী পেলে সমৃদ্ধ হয়। সৌরভ ছড়ায় জীবনের চারপাশে। সবচেয়ে বড় আনন্দ হল দেওয়ার এবং দানের সুঘ্রাণে আছে স্বর্গের সুষমা।" স্যার, আপনি 'দেয়া-নেয়া'র ছলে স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত আনন্দ উপভোগ করছেন, করতে থাকুন এবং করবেনই।

"দেয় যে জনা কী দশা পায় তাকে
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে
পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে
বাতাসেতে-উড়িয়ে-দেওয়া গানে
তারে কি আর স্মরণ করে পাখি?
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন ক'রেই তারা দিতে পারে
কিছু না রয় বাকি — "

I love you Sir from the core of my heart। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন, কর্মযজ্ঞময় থাকুন। আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক।

আপনি আমাদের আলোর দিশারী। আমাদের গ্যারিব্যাল্ডি। এক ঋদ্ধিমান মহীরুহ।

২০১৪

হাবীব আহসান : সাবেক পরিচালক-প্রামাণ্য অনুষ্ঠান, বিটিভি
বর্তমানে উৎসব চ্যানেলের প্রধান নির্বাহী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলবুল সরওয়ার

আলোর প্রতীক্ষা

শব্দের ওজন আছে কিনা, পদার্থবিদরা সেটা ভেবে দেখতে পারেন। আলোর ভর নিয়েও গবেষণা চলতে পারে। শুধু মনের ভাব আর প্রেমের বিষয়টা অন্যরকম। কারণ তুলাদণ্ডটা তো কবি-লেখকদের হাতে— যাদের বিষয়-আশয় ভিন্নরকম! বিজ্ঞানের সাথে সাহিত্যের যত সাযুজ্যই জগদীশ বোস দেখান না কেন— বিজ্ঞানীরা শব্দ-গন্ধ-বর্ণের ওজন আমলে নিতেই নারাজ। অথচ কি ধর্মগ্রন্থ, আর কি রিসার্চ আর্টিকেল, সর্বত্রই জ্ঞানের ভার মাপা হয় শব্দের ওজনে। তার্কিকরা কেউ কেউ একে যুক্তি বলেও বিশেষায়িত করে থাকেন। তবে সেই বিতর্ক জোরদার না করেই আমরা বলতে পারি, শব্দের ওজন অবশ্যই আছে; যদিও বাটখারা আর দাঁড়িপাল্লার হদিস দেয়া কঠিন।

তো সেই শব্দের ওজনে পদার্থবিদরা যতই উন্নাসিক হোন না কেন, আমাদের চৈতন্য কিন্তু তাতেই মুগ্ধ ও আপ্লুত। বরং বলা যায় : প্রণয়ে দিশাহারা। কারণ অনেক। তবে এ-মুহূর্তে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদেই সীমাবদ্ধ থাকি। তিনি সংগঠক, লেখক, বক্তা এবং আরো অনেক কিছু। তবে তাঁর সব পরিচয়কে মুখ্য করে তোলে শব্দের ওজন বোঝাবার বিস্ময়কর ক্ষমতা। প্রবন্ধকাররা যুক্তির ভারে জিততে চান; কবিরা দ্বিত্বের ভারে। ছন্দ ও অনুপ্রাস প্রায়শই কাব্যের বাহন; কখনো আবার কৌশল কিংবা উপস্থাপনা। আর বিষয়, অর্থাৎ বক্তব্য তো দেহজ সৌন্দর্যের মতো; অবশ্যই বিবেচ্য। কিন্তু কবিদের এই শক্তি সবসময় তাঁদের ইচ্ছাধীন নয়। কারো জিহ্বায় সরস্বতী বসেন, কারো হৃদয়ে লক্ষ্মী। কেউ বর লাভ করেন আফ্রোদিতির,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ মিনার্ভা'র। তো তারা যে-যেখানেই বসুন না কেন, এক ধরনের ইলহাম তাদের বাক্যে, গাঁথুনিতে, বিষয়ে আর বক্তব্যে এমন আতশবাজির মতো জ্বলে ওঠে যে আমাদের সাদা-কালো চোখ তার মহাবর্ণিল সপ্তধনুতে খেই হারাতে বাধ্য।

কিন্তু গদ্যের বেলা সরস্বতী বা আফ্রোদিতির কার্পণ্য বড় নিষ্ঠুর। ব্রহ্মা কিংবা জিউস— পরোক্ষে যিনিই কলকাঠি নাড়ুন না কেন— গদ্যে তাঁদের সদয় সম্মতি নেই। সোমরস ছাড়া যেমন মজলিশ মঁ-মঁ করে না; নূপুরের নিক্বণ ছাড়া যেমন উজল হয় না দরবারের জৌলুশ— তেমনি, এঁরাও কবিতা ভিন্ন অন্যপাত্রে আশীষ দিতে নারাজ। গদ্য তাই চিরকালই বৈধব্যের সকরুণ সাদায় রঙহীন। ঈষৎ অপাঙ্‌ক্তেয়ও বটে।

কিন্তু ঈশ্বর তো আর বিবেচনাহীন নন। তিনি আমাদের অনুভবে ও তৃপ্তিতে শব্দের ওজনকে মূল্যবান করে রেখেছেন। সুতরাং মেধার মধ্যে, মননের গভীরে কিংবা চেতনার চারধারে যে উপলব্ধিরা ছুটে বেড়ায়— সেখানে পুরোপুরিই গদ্যের রাজত্ব। এখানেই প্রভু সব বিচারকের চেয়ে ন্যায়বান। পাঠকের বোধে বা বিবেচনায় যে অর্থটুকু প্রবেশ করে এবং স্থিত হয় চেতনায়, তার তো কাব্যিক কোনো রূপ নেই; পদার্থবিজ্ঞানের তো প্রশ্নই ওঠে না। এখানে এসেই আমি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে শ্রদ্ধা জানাই। পাঠক এবার একটু তেড়াচোখে তাকাতেই পারেন। আমি তাতে বিব্রত নই। কারণ আমার পাঠকসত্তা কাউকে তোয়াজ করে আনন্দ খোঁজে না; কারো ঢোল-শহরতেও ওয়াহ্-ওয়াহ্ করে না। সে চায় কথার বুনন, শব্দের যাদু, অর্থের ব্যঞ্জনা আর সব মিলিয়ে উপলব্ধির পরিতৃপ্তি। অথচ, মিডিয়ার এই দাপুটে যুগেও, ক্যামেরার ঝলক আর ডিজিটালাইজেশনের অলীক বাস্তবতায় কোথাও আমি আত্মার প্রশান্তি পাই না। ঘুমের থেকেও কাম্য যেমন স্বপ্ন, তেমনি বিজ্ঞানের ঝিকিমিকির মাঝেও আমার মন খুঁজে বেড়ায় সেই নন্দনলোক, যা অনন্ত আনন্দের প্রবাহ। ক্ষণকালের মৃদঙ্গকে যা করে তুলবে অর্ফিয়াসের চিরন্তন রবাব! সেই শব্দকল্পদ্রুমেই আমার আসক্তি। আমার সেই মুগ্ধতার নামই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ— তাঁর শব্দের জন্য, ওজনমাফিক স্থাপনার জন্য, অব্যর্থ নিশানার জন্য। আমার এ পক্ষপাত প্রতিতুলনা কিংবা ফরমায়েশের জন্য নয়। সৈয়দ মুজতবা আলীর পর আমাদের গদ্যের যে দীনতা, তা যেমন চমৎকার রান্না এবং ত্রুটিহীন আয়োজন সত্ত্বেও পোলাও-জর্দা-রেজালা-ডেজার্টের গৎবাঁধা রেসিপির বাইরে না-যাবার শপথে সীমাবদ্ধ— তা যেন আমাদের চিরস্থায়ী সম্পদ হয়ে গেছে। না তার মধ্যে কেউ নিয়ে আসলেন কাঁচামরিচের চিকন জ্বালা কিংবা শুকনো মরিচের আগুনে-দহন, না কেউ দিতে পারলেন আইসক্রিমের বরফপোড়া স্বাদ কিংবা কাজির-নেশা। ব্যাতিক্রম শুধু

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'একজন আল মাহমুদ বা নির্গুণ— আর আমার প্রিয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ; যাঁরা খানিকটা বদলাতে চেয়েছেন রসনার ধারা; উসকে দিয়েছেন বসন্তবাতাস! যদিও বলেছি, উপলব্ধির জায়গাটা আসলে গদ্যের; কাব্যের নয়। কারণ, এ-তো অভাজনও স্বীকার করবেন— মিলনের চরম মুহূর্ত কবিতার হলেও, সূচনা ও শৃঙ্গারের দায় পুরোপুরিই গদ্যের। এখানেই আমি পক্ষপাতদুষ্ট। ভারবহ কিংবা ভয়াবহ বাক্য লেখকমাত্রেই লিখতে পারেন; কিন্তু অর্থের নিপুণ যথার্থতায় কথাকে কোহিনূর করার কুশলী কায়দা আর কজনের থাকে! সুশীল-শালীন-পরিমিত গদ্য নির্মাণে আমরা সততই দুর্বল। প্রেমের আধিক্যে কখনো এতটাই থলথলে যে, সেই স্থূল নারীদেহে দ্বিতীয়বার চোখ দিতেই পাঠকের ইচ্ছে জাগে না। কখনো আমাদের উচ্ছ্বাস এতই স্থূল হয়ে ওঠে যে মনে হয় গদাযুদ্ধের যুগেই বুঝি সকলের বসবাস। এর কোনোটিই শিল্পবিচারে আরাধ্য নয়। তদুপরি, জাতীয় চরিত্রের অর্থহীন বিশেষণ-প্রয়োগের অবুঝ-অভ্যাস তো মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র মতো রক্তে মিশে আছেই। সবমিলিয়ে সাহিত্য ও সাংবাদিকতা দুটোই হয়ে উঠেছে সাংঘাতিক তরল কিংবা প্রতিশোধপরায়ণ। না-বুঝেই যেমন পক্ষেরজনকে আমরা বিশেষায়িত করি অমূলক গুণাবলিতে; তেমনি শত্রুও সৃষ্টি করি অনর্থক নির্বুদ্ধিতায়। প্রতিতুলনা মানে যে উপমানকে বড় না করে উপমেয়কে খাটো করা নয়, তা বুঝি আমাদের কথাকাররা পুরোপুরিই ভুলতে বসেছে। গদ্যকে এতটা দ্বেষপূর্ণ বা তোষামুদে করার প্রলয়কাণ্ড সব বিশ্লেষণেই লজ্জার। এখানেই আমি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কাছে নতজানু। তাঁর ভ্রমণ কিংবা কথকতা (যেমন : *ভালোবাসার সাম্পান*); উপন্যাস বা ব্যক্তিক বিষয় (বিস্রস্ত জর্নাল) সাহিত্যমানে যাই হোক না কেন, শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্যে কালসেরা। কথা বলতে বলতেই তার এই অর্জন, নাকি বুদ্ধিকে প্রয়োগের সিদ্ধ পদ্ধতিতেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব— আজো আমি সমঝে উঠতে পারিনি। মুগ্ধ হতে হতে কখনো এতটা বিমোহিত হয়ে যাই যে ঘোর এসে চেতনা কব্জা করে। শেকসপিয়ারের নাটক, মার্কটোয়েনের স্যাটায়ার কিংবা টলস্টয়ের অন্তর্দৃষ্টির উপমানে আমি নিয়ে যেতে চাই তাঁকে; শুধু একটি দুর্বলতায় পারি না। তা হলো তাঁর বিষয়। সাহিত্য যখন জীবনেরই রূপায়ণ, তখন তাকে দেখতে হবে বিপুল পৃথিবীর বিশাল আয়নায়; হোক তা 'রূপান্তরের' তেলাপোকা-কাহিনী কিংবা জয়েসের 'ইউলিসিস'। এখানে এসেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ দুর্বল থেকে যান। তাঁর মোক্ষম শব্দ ব্যবহার, বাক্যের নিখুঁত গঠন এবং উপমার সিদ্ধেশ্বরী নৈপুণ্য সত্ত্বেও। প্রায়ই আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি: এত বড় মাপের একজন কারিগর কেন নূহের-নৌকা বানাবার উদ্যোগ নেন না? তবে কি, পক্ষীশ্রেষ্ঠ ঈগল সিদ্ধান্ত নিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবারও ডাল ছেড়ে না-ওড়ার? তাঁর সাথে এ-বিষয়ে কখনো আমার কোনো কথা হয়নি, ঠিক। কিন্তু গত পয়ঁত্রিশ বছর ধরে তাঁর রচনা, তাঁর সংগঠন, তাঁর বক্তৃতা এবং তাঁর ক্ল্যাসিক ব্যক্তিত্বের সাথে আমার নীরব কথোপকথনে মনে হয়েছে : এ বোধহয় মিডিয়ার ইদিপাসীয়-নিয়তি; সেলিব্রিটিদের অনন্ত যন্ত্রণার অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্য! আবার ভাবি, এত উত্তীর্ণ মেধার ক্ষেত্রে এ-তো হবার কথা নয়; খোঁড়া যুক্তিতেও যে এ মেলে না। তখন নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেই : তবে কি তিনি সেই বসরাই গোলাপ, যিনি নিজেও তাঁর রূপ সম্পর্কে অবহিত নন; অথবা তিনি সেই লাজুক-কোকিল, যাঁর মধুকণ্ঠ কেবলই পাতার আড়ালে আড়ালেই বাজ্ময় হবে? বোঝার চেষ্টা করি, কেন তাঁর এই অসম্পূর্ণতা। কেন একজন বারাব্বাস-ও তাঁর তুলিতে আঁকা হয় না, যার আলো সেন্ট পিটার্সের সুউচ্চ গির্জাকেও আলোকোজ্জ্বল করবে? বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের দিকে তাকালে একটি সরল জবাব পাই বটে, 'যে গড়ে সে ভরে না'। তবু, তাঁর কলমের অসাধারণ ধার, তাঁর শব্দের যথাযথ স্থাপনা, এবং তাঁর বাক্যের মধুর জাল আমাকে হামেশাই বিরহ-কাতর করে। মনে করিয়ে দেয় সেইসব প্রতিভাবান সংগঠকদের কথা— যাঁরা রাজনীতি বা সংঘের পেছনে সমস্ত শক্তি ও শৌর্য ঢেলে দিয়ে নিজে হয়ে যান তেলশূন্য লণ্ঠনের মতো নিষ্প্রদীপ। তারও মোক্ষ যদি তাই হয়ে থাকে, আমার কিছু বলার নেই; তবে সাহেব-বিবি-গোলাম দেখা এই অতি মেধাবী লোকটি যদি একজনও 'ছোটি-বহু' বা 'সতী' সৃষ্টি করে না যান, সে আমাদের সত্যিকারের দুর্ভাগ্য বলতে হবে! বাঙালি গুণীদের দিকে তাকিয়ে আমি প্রায়শই বেদনাকাতর হই। কত ক্ষুদ্র সাফল্যে তাঁরা জীবন ব্যয় করেন; কত করুণ সমাপ্তি তাঁদের অন্তিম-অর্জন! আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁদের থেকে সর্বান্তঃকরণে ব্যতিক্রম এবং বিভায় উজ্জ্বল হয়েও কেন তাঁদেরই অনুসারী, আমি বুঝতে অক্ষম। হয়তো তিনি লাইট-সাউন্ড-কাট ভালোবাসেন; হয়তো তিনি বিমোহিত তাঁর নিজেরই উচ্চারণে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন— নিজের প্রতি সুবিচার করা তাঁর একান্ত উচিত। শব্দের ওজন বোঝাতে যিনি বিজ্ঞানীদের মতোই সফল, কবিদের সমকক্ষ ম্যাজিশিয়ান— তিনি নিজের এই অক্ষমতাকে জয় করতে পারবেন না, এ আমি বিশ্বাসই করতে রাজি নই! পথ চেয়ে আছি, কবে আলোর ভেতরেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঘটে! কবে দূর হয় ঊষসীর অন্ধকার!!

২০১৪

বুলবুল সরওয়ার : চিকিৎসক, লেখক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুৎফর রহমান রিটন

আমার শিক্ষক আমার বন্ধু

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? আমি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কে? আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? তিনি আমার কে হন, আমিই তাঁর কী হই? মাঝে-মধ্যেই আচমকা এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় আমাকে। সন্দেহ নেই, অত্যন্ত সরল প্রশ্ন। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর এককথায় প্রকাশ করা কঠিন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের 'মানসিক উৎকর্ষ কার্যক্রম'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে ঢাকার উল্লেখযোগ্য প্রায় সবক'টি স্কুলে আমাকে যেতে হত। যেতে হত ঢাকার বাইরেও। কখনো কিশোরগঞ্জে, কখনো রংপুরে, আবার কখনো পিরোজপুরে। সর্বত্রই এরকম বেকায়দা প্রশ্ন করে বসত স্কুল এবং কলেজপড়ুয়া কিশোর-কিশোরী বন্ধুরা। তাঁদের শিক্ষকরা। অভিভাবকরা। ওরা জানতে চাইত কেন্দ্রের সভাপতি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি শিক্ষক-ছাত্রের নাকি সহকর্মীর? গুরু-শিষ্যের নাকি সহযোদ্ধার? পিতা-পুত্রের না কি অসম বয়েসী বন্ধুর? আমি বলতাম— সব ক'টাই।

আমি ঢাকা কলেজে সায়ীদ স্যারের সরাসরি ছাত্র ছিলাম। সেই হিসেবে আমাদের সম্পর্কটা তো শিক্ষক-ছাত্রেরই। গুরু-শিষ্যেরই। কেন্দ্রে একসঙ্গে দীর্ঘদিবস দীর্ঘরজনী কাজ করেছি। সম্পর্কটা তো সহকর্মীরও। সমাজে আলোকিত প্রজন্মের প্রত্যাশায়, আলোকিত মানুষের প্রত্যাশায় আমরা লড়াই করছি। সুতরাং সম্পর্কটা তো সহযোদ্ধারও। শিক্ষক বা গুরুস্থানীয়রা স্নেহ-মমতার এবং সোহাগ-শাসনের অধিকার সম্পন্ন বিধায় এমনিতেই তাঁরা পিতার আসনেই থাকেন। সুতরাং আমাদের সম্পর্কটা তো পিতা-পুত্রেরও। বয়েসের তথাকথিত গোঁড়ামিপূর্ণ সমস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষেধ অগ্রাহ্য করে তিনি আমার সঙ্গে অবলীলায় গড়ে তুলেছেন এমন চমৎকার একটি সম্পর্ক যে সম্পর্কটির আভিধানিক নাম 'বন্ধু'। সুতরাং তিনি আমার অসমবয়েসী বন্ধুও। বর্ণিত সম্পর্কগুলোর একটা প্যাকেজ নাম— আলোর পথের যাত্রী। হ্যাঁ। আলোর পথের যাত্রী আমরা।

দূর গন্তব্যে যেতে হলে সময়মতো সঠিক বাহনটিতে চেপে বসার জন্যে প্রথমেই দাঁড়াতে হয় প্লাটফর্মে। প্লাটফর্ম থেকে কিছুক্ষণ পরপর একেকটা বাহন একেক গন্তব্যে ছুটে যায় হুইশেল দিতে দিতে। অপেক্ষমাণ যাত্রীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছানোর স্বপ্নটিকে বাস্তবায়নের জন্যেই প্লাটফর্মে এসে শামিল হন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে আমার ওরকম একটি প্লাটফর্ম বলে মনে হয়। আমাদের আগামী প্রজন্মকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেবার জন্যেই নির্মিত হয়েছে এই প্লাটফর্ম। সারাদেশে দু'তিনশ প্লাটফর্মে যে যাত্রীরা এসে জড়ো হয়, বয়সে তারা কিশোর-তরুণ। উদ্দীপ্ত, শাণিত, দীপ্র এবং স্বপ্নবান। প্লাটফর্ম থেকে অবিরাম ছুটে চলা বাহনগুলোর চালক অর্থাৎ কিনা ড্রাইভার, সারেং, পাইলট কিংবা মাঝিটি হচ্ছেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। আমরা কতিপয় তাঁর হেলপার। টিকিট চেকিং, ইঞ্জিনে পানি ঢালা, এবং যাত্রীদের সঠিক আসনে বসানোর মতো কাজগুলো আমাদের। গুরুর দেয়া গুরুদায়িত্ব পালনে সদাসচেষ্ট আমরা।

অতীতে এভাবেই ব্যাখ্যা করতাম আমি আমাদের সম্পর্কটিকে।

২

আমাদের স্বপ্নের কেন্দ্রটির নাম ছিল 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র'। আমরা আমাদের তুমুল তারুণ্যের উদ্দাম দিনগুলো কাটিয়েছি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। আমি আমার জীবনের সবচে উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চকচকে দিনগুলোর কথা বলতে গেলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কথাই বলি সবার আগে। একটা সময় ছিল যখন আমার সকাল-সন্ধ্যা দিন-রাত্রির পুরোটাই দখল করে নিয়েছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়— আমার জীবনটাই ছিল কেন্দ্র-কেন্দ্রিক। প্রতিদিন খুব সকাল সকাল বাংলামটর চলে আসতাম। বাড়ি ফিরতাম গভীর রাতে। একদিন কেন্দ্রে না এলে জীবনটা মনে হত অর্থহীন, অপূর্ণ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নাম-দুটির সঙ্গে আমার ছিল গভীর সখ্য। এই নাম-দুটি আমার আত্মার আত্মীয়। আমার বর্ণালি তারুণ্যের স্বর্ণালি স্মৃতির আলোর ঝালর এই নাম দুটি। একটিকে আরেকটি থেকে আলাদা করতে পারি না। একটিকে অন্যটি থেকে সরিয়ে নিতে পারি না।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যদি হয় স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু তবে সায়ীদ স্যার হচ্ছেন স্বপ্নের ফেরিঅলা। পৃথিবীতে মানুষ কত কিছুই না বিক্রি করেন। কেউ বিক্রি করেন সোনা রুপা হীরক মুক্তা। কেউ বিক্রি করেন চাল ডাল তেল লবণ মরিচ। সায়ীদ স্যার বিক্রি করেন স্বপ্ন। স্বপ্ন বিক্রি করে আবার তিনি স্বপ্নকেই কেনেন সমান দামে। স্বপ্ন বিকিকিনিতে সায়ীদ স্যার বিরামহীন, অক্লান্ত। স্বপ্ন বিকিকিনির হাটে সায়ীদ স্যার এক অবাক ফেরিঅলা। এক আজব ফেরিঅলা। নিজের স্বপ্ন বিক্রি করতে এসে নিজের সেই স্বপ্নকে অন্যের স্বপ্নে পরিণত করে ফেলেছেন স্যার। স্যারের একক স্বপ্ন এখন আমাদের সম্মিলিত স্বপ্ন। স্যারের একক স্বপ্ন এখন আলোকসন্ধানী একটি জাতির স্বপ্ন।

কোথায় থাকেন সেই ফেরিঅলা? কোথায় থাকতেন সেই ফেরিঅলা?

একটু পেছনে ফিরে তাকাই।

বাংলামটর মোড়ের পেট্রোলপাম্প লাগোয়া সরু গলিটার মুখেই একটা সাইনবোর্ড। সেই সাইনবোর্ডে হালকা ইয়েলো অকার রঙে ফ্রি হ্যান্ডে লেখা 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র'। লেখার শুরুতে একটা লোগো। সেই লোগোতে একটা বই এবং আলোর একটা শিখা। ফ্রি হ্যান্ড লেটারিংটা শিল্পী হাশেম খানের করা। বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী হাশেম খান।

একধরনের নিস্তরঙ্গ সুনসান মফস্বলগন্ধী সেই গলিতে প্রবেশ করে খানিকটা এগোলেই হাতের ডান দিকে বৃক্ষ এবং পাতার ঘনসবুজ আর গাঢ়খয়েরি আলো-আঁধারিতে কী বিপুল গৌরব আর অনিঃশেষ মমতা নিয়ে দাঁড়িয়ে দেড়তলা সাইজের দোতলা একটি ছোট্ট বাড়ি। বাড়ির মূল ফটক পেরোনো মাত্র ডানপাশের লন-এর সবুজ দূর্বাঘাসের মখমল কার্পেট স্বাগত জানাবে নিঃশব্দে। অতঃপর অজস্র আমের মুকুলের মাতাল-করা গন্ধ কিংবা বেলীফুলের উদাস-করা সুবাস অথবা কামিনীফুলের সুতীব্র ঘ্রাণ এসে জড়িয়ে ধরবে— এসো বন্ধু এসো। এই বাড়িটিকে কেন্দ্র করেই আমাদের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। এই বাড়িটিতেই 'স্বপ্নের ফেরিঅলা' থাকেন। এখানে বসেই তিনি স্বপ্ন বিক্রি করেন। তাঁর ক্রেতারা সবাই বয়েসে নবীন। এরা তরুণ কিন্তু সংযত। ক্ষীণদেহী কিন্তু বলিষ্ঠ। একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে টগবগ করছে সারাক্ষণ, কিন্তু উদ্ধত নয় এদের কেউই। এই তরুণদের সামনে মামুলি শাদা পাজামা আর খদ্দরের সাধারণ পাঞ্জাবি পরা অসম্ভব দ্যুতিময় চোখ আর মুগ্ধতায় ভাসিয়ে নেয়া হিরণ্ময় কণ্ঠস্বরের একজন ফেরিঅলা অনর্গল বলে চলেছেন তাঁর স্বপ্নের কথা। তিনি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। আমাদের বইপ্রেমী তরুণদের একালের সক্রেটিস। তরুণদের মস্তিষ্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বিরামহীন অক্লান্ত রোপণ করে চলেন সেই সম্মোহনী মন্ত্র— 'মানুষ তার আশার সমান বড়'।

আলোকিত মানুষ আর সম্পন্ন মানুষের স্বপ্ন বুকে ধারণ করে তিলতিল যত্নে গড়ে তুলেছেন তিনি দেশের একমাত্র আলোর ইশকুল— বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

আমাদের চারপাশে যখন ভণ্ড প্রতারক লোভী আত্মকেন্দ্রিক মূর্খ একটি লুটেরা শ্রেণি বিকশিত হচ্ছিল অবিশ্বাস্য দ্রুততায়, এবং কুপমণ্ডূক রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন তাদের অন্ধ অনুসারীদের বিপুল সমর্থন নিয়ে নিজেদের সর্বগ্রাসী তমসাচ্ছন্ন থাবাটির বিস্তার ঘটিয়ে যাচ্ছিল নির্বিঘ্নে, তখন একজন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এগিয়ে আসেন অতিশয় ক্ষুদ্র একটি আলোকশিখা হাতে। শিল্পী হাশেম খান কেন্দ্রের লোগোতে সেই ক্ষুদ্র কিন্তু অবিনাশী আলোকশিখাটিকেই মূর্ত করে তুলেছেন।

বাংলামটরের ছোট্ট সেই বাড়ির লবিতে সিঁড়িতে অডিটোরিয়ামে লাইব্রেরিতে ছাদে সর্বত্র একদল কিশোর-কিশোরী আর তরুণ-তরুণীর অস্থির চঞ্চল পদক্ষেপ আর তাদের অফুরন্ত কলকাকলি সারাক্ষণ একটা প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ঝলমলে আবহ তৈরি করে রাখত। এইখানে এলে চরম নৈরাশ্যবাদীরও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটত। সবকিছুতে হতাশ সেই নৈরাশ্যবাদীটি নিতান্ত অনিচ্ছায় অনুভব করতে বাধ্য হত যে— কিছু একটা হচ্ছে এখানে। একটা কিছু ঘটছে এখানে। কিন্তু কী সেটা?

এই প্রশ্নের উত্তরটা বেশ বিমূর্ত। খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু অনুভব করা যায় যে একটা কিছু ঘটছে। ঘটেই চলেছে। সেই একটা কিছুর প্রভাবে দেশের নানান প্রান্তে নানান সেক্টরে আমরা কিছু আলোকিত মানুষ পাচ্ছি। সম্পন্ন মানুষ পাচ্ছি। যাঁদের সম্মিলিত জাদুর পরশে একদিন ফুটে উঠবে আলো। ঘুচে যাবে অন্ধকার। পাল্টে যাবে দেশ। পাল্টাবে দেশের মানুষের নিয়তি।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ অন্ধকারে আলো ফোটানোর কাজটি করে যাচ্ছেন নিরন্তর। *নিষ্ফলা মাঠের কৃষক* নামে বই লিখলেও আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আসলে 'শস্যশ্যামল ফসল ভরা মাঠের ডালি' নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন জাতির সামনে।

৩

আমি, আমরা আমাদের যৌবনের সবচে উজ্জ্বল সময়টা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে দিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ থেকে ধার করে বলি, 'আমি তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ।' হ্যাঁ, আমাদের প্রাণ বাঁধাই ছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সঙ্গে। কোনো শুক্র-শনি ছিল না। ঝড়, বৃষ্টি, পিচগলা

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খরতাপ, বরফঠাণ্ডা শৈত্যপ্রবাহ, অসহ্য লোডশেডিং কিছুই আটকাতে পারত না আমাদের। আমার, আমাদের কতিপয় তরুণের জীবনটাই ছিল কেন্দ্রমুখী এবং কেন্দ্র-কেন্দ্রিক। কিন্তু কেন? কিসের টানে আমরা প্রতিদিন ছুটে গেছি বাংলামটরের সেই ছোট্ট বাড়িটাতে? অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সম্মোহনী আকর্ষণ ছাড়াও আরো কিছু একটা ছিল সেখানে। উজ্জ্বল উচ্ছল প্রাণবন্ত একদল মুক্তোখচিত চকচকে ঝকঝকে ছেলেমেয়ে ছাড়াও কিছু একটা ছিল সেখানে। সারা পৃথিবীর সেরা বইগুলোর সুবিপুল সমাহার ছাড়াও কিছু একটা ছিল।

সেই কিছু একটার আকর্ষণে এখন, বর্তমানের স্বপ্নবান তরুণরাও ছুটছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের দিকে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের দিকে। আমি জানি আগামীতেও ছুটবে আরেকটি দল। প্রজন্মের এই রিলে রেস চলতেই থাকবে।

৪

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নামের আমাদের স্বপ্নের সেই বাড়িটা এখন আর আগের চেহারায় নেই। স্মৃতির শ্যাওলাজমা দেড়তলা সাইজের দোতলা সেই বাড়িটা এখন অতি আধুনিক মহা জাঁকজমকপূর্ণ বহুতল ভবন হিসেবে আকাশ ছুঁতে চাইছে। কেন্দ্রের সেই আমগাছটি এখন আর সহস্র মুকুলের গন্ধে কাউকে মাতাল করে তোলে না। ইসফেন্দিয়ার জাহেদ হাসান মিলনায়তনটিও নেই আর। অতিউঁচু ভবনের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে আটপৌরে আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ কেন্দ্রের সেই পলেস্তারা খসেপড়া পুরনো হার্দিক উন্মুক্ত ছাদটিও। কেন্দ্রের মূল ফটকে প্রবেশমুখের সবুজ দূর্বাঘাসের কার্পেটটিও উধাও হয়েছে। কামিনীফুলের তীব্র ঘ্রাণের বদলে কেন্দ্রে আসা অতিথিকে জড়িয়ে ধরে বেলজিয়ামের মূল্যবান কাচের চাকচিক্যময় অচেনা এক রৌদ্রের প্রতিচ্ছায়া।

বাংলামটরের সেই জাদুমাখা গলির ভেতরে প্রবেশ করলেই আমি কেমন নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হই। আমার বুকটা হু হু করে ওঠে। চোখ দুটো জলে ভরে যায়। ওইতো আমার প্রিয় আঙিনা। আমার যৌবনের বহু আনন্দ-বেদনার ছায়াসঙ্গী। আমার সৃজনশীলতার অপরূপ ক্যানভাস। ওইখানে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নামের এক সপ্রতিভ জাদুকর একদা অপরূপ কিছু ম্যাজিক দেখিয়ে বিস্মিত করেছিলেন আমাকেও! প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর সেই ম্যাজিশিয়ানের পাঞ্জাবির পকেটে অদ্ভুত একটা বাঁশি আছে। সেই বাঁশির সিম্ফনিতে আছে অপূর্ব এক হৃদয়হরা সম্মোহনী সুধা। সেই সুধা একদা সম্মোহিত করেছিল আমাকেও!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

আমাদের স্বপ্নের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তার যৌবনদীপ্ত পঁয়ত্রিশ বছর অতিক্রম করছে! বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র দিন দিন নতুন যৌবনের সঞ্জীবনী সুধায় দীপ্র-ক্ষিপ্র আর অপরূপ হয়ে উঠছে! বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে পাশাপাশি হাতধরাধরি করে আমাদের নায়ক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদও নতুন যৌবনের বিপুল উচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন। চিরসবুজ এই মানুষটি বার্ধক্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর পরশে সারাদেশে অবিরাম ফুটছে বর্ণালি সব আলোর কুসুম। সেই কুসুমের সৌরভে আর গৌরবে সুরভিত হয়ে উঠছে আমাদের আঙিনা।

স্বপ্নের ফেরিঅলা আলোর পথের দুর্দান্ত ম্যাজিশিয়ান জাদুর বাঁশির অলৌকিক বাঁশরিয়া আমার শিক্ষক এবং বন্ধু আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে— আটলান্টিকের এপার থেকে একসমুদ্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা।

অটোয়া, কানাডা, ২০১৪

লুৎফর রহমান রিটন : ছড়াকার ও শিশুসাহিত্যিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমাদ মাযহার

সায়ীদস্যার

কোনো বস্তু যদি কোনো মানুষের দৃষ্টিসীমার এক ফুটের চেয়েও কম দূরত্বে থাকে তাহলে যেমন সে বস্তুটি ওই মানুষের চোখে ঝাপসা হয়ে যায়, তেমনই অবস্থা হয় খুব নিকটজন সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে। সায়ীদস্যারকে নিয়ে লিখতে গিয়ে আমিও এমনই সংকটে পড়ি। কারণ এত কাছাকাছি এতটা দীর্ঘসময় ধরে এই মানুষটির নিকটে আছি যে তাঁর সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া আমার পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার। সে কারণে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে নৈর্ব্যক্তিক হবার কৃত্রিম চেষ্টা না করে ব্যক্তিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করাই সমীচীন মনে করি। তবে দীর্ঘ কাল ধরে পরিচয়ের কারণে তাঁকে প্রথম দিকে যেভাবে দেখেছিলাম তার সঙ্গে বর্তমানের দেখায় খানিকটা দূরত্ব তো সৃষ্টি হয়েছেই। সে হিসেবে খানিকটা হয়তো নৈর্ব্যক্তিকও হওয়া যাবে। সুতরাং ব্যক্তিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তাঁর সত্তার সম্পন্নতাকে সন্ধানের একটু চেষ্টা করে দেখা যাক না!

টেলিভিশনে ১৯৭৮ সালের ঈদের আনন্দমেলা দেখে ও সেই অনুষ্ঠানে তাঁর কথা শুনে এত ভালো লেগেছিল যে সেদিনই সায়ীদস্যারের ছাত্র হবার বাসনা পোষণ করেছিলাম। সেজন্যেই জগন্নাথ কলেজের ভর্তি ফরম সংগ্রহ করার পরও কয়েকদিনের নিদারুণ অনিশ্চয়তা বরণ করে ভর্তি হয়েছিলাম ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগে, সম্মান শ্রেণিতে। সে-সব কথা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়; শুধু এটুকু জানিয়ে রাখি যে আমি তখন আঠারো বছরের তরুণ, সায়ীদস্যার বিয়াল্লিশ বছরের প্রবীণ— সবে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ খেতে শুরু করেছেন। এমন একটা বয়সে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থান করছিলেন যখন তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রাণশক্তির সঙ্গে জীবনাভিজ্ঞতাময় পরিণত বয়সের গাম্ভীর্য যোগ হয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে খ্যাতিমান কলেজের শিক্ষক, লিটল ম্যাগাজিন *কণ্ঠস্বর*-এর সম্পাদক ও টেলিভিশনের সফল উপস্থাপক— জীবনের এই তিন সফল অধ্যায়ের সম্মিলনে তিনি ততদিনে ঢাকার নাগরিকসমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। সমাজের প্রতিষ্ঠিত প্রবীণেরাও তাঁকে সমীহ করেন। মধ্যবিত্ত টেলিভিশন দর্শকের কাছে তো তখন তিনি খুবই সমাদরণীয় মানুষ।

ওই বয়সেই তাঁর ব্যক্তিত্বের তিনটি বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এক : ভরাট কণ্ঠের রুচিময় রসিকতা, দুই : সাহিত্য-মূল্যায়নে ক্ল্যাসিকতার মূল্য বেশি দেয়া ও তিন : বিচারের ক্ষেত্রে নির্মোহ থাকতে পারা। বিভিন্ন বক্তৃতায়, ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় মানুষের কর্মিষ্ঠতাকে সবসময় মূল্য দিতে দেখেছি তাঁকে— এতেও আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তাঁর প্রতি। টেলিভিশনের উপস্থাপনাতে তাঁকে দেখেই প্রথমে মুগ্ধ হলেও তা অনেক বেড়ে গিয়েছিল যখন শুনেছিলাম যে তিনি ঢাকা কলেজের বাংলার শিক্ষক। বাংলার শিক্ষকেরা রুচিমান হবেন এমন একটা প্রত্যাশা কী করে যেন আমার মধ্যে ততদিনে জেগে গিয়েছিল। অন্যকে পরীক্ষা না করে সেদিনই আমি সায়ীদস্যারকে নির্বাচন করে নিয়েছিলাম আমার শিক্ষাগুরু হিসেবে।

ঢাকা কলেজে আমাদের সম্মানশ্রেণির ক্লাসে স্যার যেদিন প্রথম আসেন সেদিন রুটিন জানতে ভুল করায় আমি উপস্থিত হতে পারিনি। তাঁর রসিকতার শিকার হওয়ার কাহিনী সহপাঠীদের কাছে পরে শুনেছি। সবাই জানেন স্যারের কণ্ঠস্বর এখনও গমগম করে; তখন আরও বেশি করত। যে রুমটাতে স্যার ক্লাস নিয়েছিলেন সেটা মন্দ্রিত হচ্ছিল। মনে পড়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমার বালখিল্য চেষ্টায় সামান্য রুষ্ট হয়ে মৃদু তিরস্কার করেছিলেন আমাকে। ক্লাসের শেষে বললেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কথা। বই-পড়ায় আগ্রহ থাকলে ওখানে যাবার আহ্বান জানালেন। তিরস্কৃত হলেও আমার দৃষ্টিআকর্ষণী প্রচেষ্টাটি কাজে দিয়েছিল। আমার কথা থেকেই তিনি হয়তো অনুভব করেছিলেন যে, বই-পড়ায় আমার আগ্রহ আন্তরিক।

সেই থেকে আমি জড়িয়ে গেছি কেন্দ্রের সঙ্গে। প্রতিটি বই পড়ে যেতাম সাপ্তাহিক আলোচনায় অংশ নেয়ার জন্য। কথা বলতে পারতাম না, তবু সুযোগ নিতাম কথা বলবার। পদে পদে অনুভব করতাম নিজের সীমাবদ্ধতাকে। জেদ চেপে যেত তা অতিক্রমের। সাপ্তাহিক বইপড়াতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি আমার পঠনপাঠন। কেন্দ্রের যোগ্য কর্মী হয়ে উঠতে চেয়েছিলাম বলে কেবল বই-পড়াতেই

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমিত রাখিনি নিজেকে। নানা দায়িত্ব নিয়েছি। যেসব দায়িত্ব পালন করেছি হয়তো তার যোগ্যতা ছিল না, তবু পিছপা হইনি। দেখতে দেখতে এভাবেই সতেরটি বছর সেখানে কেটেছে দিনরাত্রির হিসাব ছাড়া। আমি যুক্ত ছিলাম কর্মী হিসেবে। ১৯৯৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর কেন্দ্র-সমন্বয়কারীর দাপ্তরিক দায়িত্ব ছেড়েছি। কিন্তু কেন্দ্রের সঙ্গে আমার আত্মার যোগ ছিন্ন হতে পারেনি। সেই হিসেবে বত্রিশ বছর ধরে আমি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত! এর মধ্যে সায়ীদস্যার আর কেন্দ্র যেমন এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা, কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক আমারও ছিল তেমনি। এখন আমি খানিকটা দূরে সরলেও ভালোবাসা কমেনি, বরং বেড়েছে।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ব্যক্তিত্বে চারটি সত্তার সমাহারকে আমি অনুভব করি। এক : তাঁর শিক্ষক-সত্তা, দুই : তাঁর বিনোদনকারী-সত্তা, তিন : তাঁর সংগঠক-সত্তা এবং চার : তাঁর সাহিত্যিক-সত্তা। এই চারটি সত্তার প্রতিটিই একটি অপরগুলোর পরিপূরক। ব্যক্তিগতভাবে নৈকট্যলাভের সূত্রে তাঁর ব্যক্তিত্বের সবগুলো সত্তার সঙ্গেই আমার গভীর পরিচয় রয়েছে। তাঁকে আমি প্রথমে চিনেছিলাম রুচিমান বিনোদনকারীর ভূমিকায় থাকা অবস্থায়, টেলিভিশনে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে। পরিশীলিত মধ্যবিত্ত রুচির বিনোদনকারী ব্যক্তি হিসেবে তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। যে সময়ের কথা বলছি তখন টেলিভিশন মধ্যবিত্তের বিনোদন-সংস্কৃতির এক বড় প্রভাবশালী মাধ্যম। মধ্যবিত্ত জনমানসে সামগ্রিক ব্যক্তিত্বে পরিশীলনের এক উচ্চতর প্রতিভূ হিসেবে তাঁর ছিল ব্যাপক পরিচয়! দর্শক হিসেবে আমি প্রত্যক্ষ করেছি তাঁর সেই ভূমিকা! কেবল আমিই যে অনুভব করেছি তা নয়, আমার চারপাশের মানুষদেরও দেখেছি আনন্দিত হতে!

বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক এই দুই ধারার অনুষ্ঠান উপস্থাপনাতেই তিনি ছিলেন অসাধারণ। বিনোদন সক্ষমতা ও সৃজনীবৈশিষ্ট্যে টিভি উপস্থাপক হিসেবে তাঁর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বকে তিনি নিয়ে গেছেন মননশীলতার উচ্চতর স্তরে। ষাটের দশকের সূচনাকাল থেকে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে তিনি যে মনস্বিতা, রুচিমানতা, বিনোদন-সক্ষমতা দেখিয়েছেন তা এখনও কিংবদন্তি হয়ে আছে। সবকিছু মিলিয়ে তিনি তাঁর সুস্মিত ব্যক্তিত্বকে বিনোদন ও শিক্ষামূলক টিভি-অনুষ্ঠানে এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন, যা ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের উৎকর্ষের নিদর্শন।

সায়ীদস্যার কেবল অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সূত্রে আমার শিক্ষক নন। বিদ্যায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবেই আমি তাঁর কাছ থেকে শ্রেণিকক্ষে দীর্ঘকাল পাঠ গ্রহণ করেছি। সেখানে তিনি ছাত্রদের মনে কীভাবে সাহিত্যের বোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

সংক্রমিত করে দেন পরিচয় পেয়েছি তার। সুতরাং শ্রেণিকক্ষের শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রজ্ঞা ও আনন্দদান-ক্ষমতা তরুণদের মধ্যে কী প্রভাব রাখতে পারে সে খবরও আমার ভালোভাবেই জানা! তিনি যখন ঢাকা কলেজের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যচেতনা জাগিয়ে তুলছেন তখন লক্ষ করেছি তাঁর আকর্ষণীয় ভাষ্য শুনতে অন্য কলেজের ছাত্রদেরও যোগে শ্রেণিকক্ষ উপচে উঠছে। তিনি সাহিত্যের সিলেবাসসীমিত পাঠ্যসূচির শিক্ষক প্রায় কখনও ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের সাহিত্যের আনন্দময় মহাভোজে আমন্ত্রণ জানানো! সাহিত্য কীভাবে জীবনসার হয়ে ওঠে, কীভাবে হয়ে ওঠে জীবনদীপের আলো, তার ইশারা তিনি দেখিয়ে দিতেন ছাত্রদের!

আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর শিক্ষকতার জীবন ছিল বত্রিশ বছরের। এই দীর্ঘ সময়ে শিক্ষাব্যবস্থায় বিবর্তন ঘটেছে। বিবর্তনের অনেক কিছুকেই তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। যা যোগ করতে চেয়েছিলেন তা করা যায়নি বলে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে চেয়েছেন সেটা করতে। ফলে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষক-সত্তার মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষক-সত্তার। এখানেও তিনি অনানুষ্ঠানিকের মুক্তি সঞ্চার করতে পারতেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেন তারই প্রতিসরণ ঘটল এবং পেল আরও ব্যাপ্তি।

তাঁর সাহিত্যিক পরিচয় উদ্ভিন্নমান ছিল ষাটের দশকজুড়ে। সংগঠক-সত্তাও জায়মান ছিল সেই সময়েই! নিজের কবিতা ও মননশীল গদ্য রচনা এবং সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদনার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃজনশীলতা ও সংগঠনিকতা ওই সময়ে এমন এক মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছিল যার আঁচ আমি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হবার আগেই পেয়েছিলাম। ঘোষণা দিয়ে বন্ধ করে দেয়ার পাঁচ বছরের মাথায় তাঁর সম্পাদিত *কণ্ঠস্বর* পত্রিকাটির নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যাটি দেখে তাঁর সাহিত্য আন্দোলনের অতীত নিয়ে কৌতূহলী হই। এই সূত্রেই আমি যুক্ত হয়েছিলাম এর পরবর্তী সংখ্যাগুলোর সঙ্গেও। তিল তিল করে *কণ্ঠস্বর* পত্রিকা, 'লিটল ম্যাগাজিন', 'সাহিত্য পত্রিকা' বিষয়ে দিনের পর দিন তাঁর ভাবনাসার শুষে নিয়েছি। এর মধ্য দিয়ে জেনেছি ষাটের দশকের বাংলাদেশের সমাজ যখন ছিল সামরিক স্বৈরশাসন কবলিত সংকটের আবর্তে ঘূর্ণায়মান সে সময়ের তারুণ্য এই সংকট থেকে উত্তরণের আহ্বানে জেগেছিল দুই ভাবে। এক, রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে; দুই, ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী পরিচালিত অসাধু বিত্তবৈভবে বীতশ্রদ্ধ অবক্ষয়ী সাহিত্যকৃতিতে নিমজ্জিত হয়ে! সায়ীদস্যার বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনের এই নতুন জীবনবোধ ও চেতনার জেগে ওঠার কালের অন্যতম

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিভূ! সাহিত্য-আন্দোলনে দ্বিতীয়োক্ত ধারার সংগঠক হিসেবে তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়! বাংলাদেশে, বাংলার মুসলমান সমাজে চিন্তাচর্চার শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু চিন্তা-প্রকাশের ভাষায় শিল্প-সৌকুমার্য প্রতিষ্ঠার সচেতন প্রয়াস খুব বেশি ছিল না। গত শতকের ষাটের দশকে এই প্রয়াসের সচেতন কাণ্ডারী ছিলেন তিনি।

সায়ীদস্যার একজন সৃষ্টিশীল লেখক। কবি হিসেবে যুগপৎ অবক্ষয়ের বেদনা ও আশাবাদিতাকে ধারণ করেন; কবিতায় তাঁর আবেগ শব্দিত হতে দেখি সাংগীতিকতা ও চিত্রময়তার যুগল শস্ত্রে। অবক্ষয়ী যুগে জন্ম নিলেও অবক্ষয় তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর বিচরণ মধ্যবিত্ত সমাজ পরিমণ্ডলে। তাঁর ছোটগল্পকার সত্তা প্রধানত বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্বে সামাজিক অবক্ষয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভিঘাতে স্পন্দিত। আবার নান্দনিকতার একটা কল্পজগৎকেও তিনি বাস্তব করে তুলতে পারেন তাঁর ছোটগল্পে। নাট্যকার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকালের দুই বিবদমান সত্তার সংঘাতের মধ্য দিয়ে বাঙালির মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বিধা ও দ্বন্দ্বকে তুলে এনেছেন তিনি। নাট্যআঙ্গিকে তিনি পাশ্চাত্য রীতির অনুসারী। অনুবাদক হিসেবেও তাঁর লক্ষ্য বিশ্বসাহিত্যের চিরায়তের সঙ্গে আধুনিকতার যোগ ঘটানো।

লেখক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ঝোঁক প্রধানত সাহিত্যের দিকে; যদিও তাঁর লেখকসত্তার আবর্তন শুধু সাহিত্যকেন্দ্রী নয়; সমাজ নিরীক্ষার ও পর্যবেক্ষণের ক্ষমতায়ও তাঁর ব্যক্তিত্ব সমৃদ্ধ। স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি যে গভীর জীবনাগ্রহে জেগে উঠেছে তার প্রাণস্পন্দনকে তিনি অনুভব করেন। সে কারণে বিগত প্রায় তিন দশক ধরে বাঙালি জীবনে মূল্যবোধের যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার মধ্যেই তিনি দেখতে পান উত্তরণের স্বপ্ন। জাতীয় জীবনের যে অবক্ষয় ও ঊনতা তাঁকে ব্যথিত করে, তার প্রতিকারে তিনি নিজে অবতীর্ণ হতে চান জন্মান্ধের মতো এবং অন্যদের মধ্যেও জাগিয়ে তুলতে চান সে প্রেরণা। কিন্তু এরই উল্টোপিঠে তাঁর লেখক-সত্তার রয়েছে আর একদিক; তা হল— নিরাসক্তভাবে জীবনের ব্যবচ্ছেদ।

সবমিলিয়ে সায়ীদস্যারের লেখক-সত্তায় বা সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে তাঁর প্রাবন্ধিক-সমালোচক সত্তা। সাহিত্য সমালোচক হিসেবে উচ্চ মানদণ্ডে সমকালীন সাহিত্যকে বিচার করে দেখতে চান তিনি। ফলে তাঁর বিচার হয়ে উঠতে পারে নির্মোহ। সমালোচক হিসেবে তিনি প্রধানত নিজের সমকালীন অবক্ষয়ী সাহিত্যেরই ব্যাখ্যাতা। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য অনুসারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাগরিক আধুনিকতা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল চল্লিশের দশকে। ষাটের দশকে এর একটা বাঁকবদল ঘটেছিল। সেই বাঁকবদলের অন্যতম সাহিত্যিক ব্যাখ্যাতাও তিনি। এর কার্যকারণ-অনুসন্ধানে সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্যকে বিবেচনায় রাখবার ফলে তাঁর ব্যাখ্যা হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র ও বস্তুনিষ্ঠতর। স্বসম্পাদিত *কণ্ঠস্বর* পত্রিকায় যেমন তিনি সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন সমকালীন লেখকমণ্ডলীর শক্তিমত্তাকে, তেমনি লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তাঁদের উজ্জ্বলতার দিকগুলোকে। এই সবকিছুর ওপরে আমাদের সমাজের সুদীর্ঘ কালের পটভূমিতে উচ্চতর নান্দনিকতাকে অনুসন্ধান করেন তিনি সমকালীন সাহিত্যে। সার্বিকভাবে তাঁর গদ্য বিশেষণপ্রবণ, কারুকার্যময়, প্রসাদগুণসম্পন্ন, দার্শনিকতামণ্ডিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। বাংলা একাডেমি পুরস্কারের মধ্য দিয়ে সাম্প্রতিক কালে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেলেও তাঁর সত্তার অন্য পরিচয়কে ছাপিয়ে লেখক পরিচয় এখনও সামনে আসেনি। অথচ লক্ষণীয় যে, তাঁর সবগুলো সত্তার সমন্বিত প্রেরণার মূলে রয়েছে তাঁর সাহিত্যিক-সত্তাই! আমার তো মনে হয়, যে পরিচয়ে সকলের কাছে এখন তিনি সবচেয়ে বেশি চেনা সেই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সংগঠক-সত্তারও মূলে রয়েছে তাঁর সাহিত্যিক সত্তাই। অন্তত যে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তাঁকে আমি কাছ থেকে দেখছি, তাঁর ব্যক্তিত্বপ্রভায় আলোকিত ও প্রভাবিত হচ্ছি তাতে আমার এই-ই মনে হয়!

সায়ীদস্যারের জন্ম হয়েছিল ২৫ জুলাই ১৯৪০ সালে। সাহিত্যপ্রাণিত এই মানুষটির অতিক্রান্ত হয়েছে এক কর্মিষ্ঠ জীবন। তাঁর এই কর্মলিপ্ত জীবন যে-মানুষদের ঘিরে এগিয়ে চলেছে তারা তাঁর জন্মদিন উদযাপন করবে তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে। এটা ঘটবে তিনি না চাইলেও। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রাঙ্গণে আজও তা-ই ঘটছে। পঁচাত্তর বছর পূর্তির লগ্নে তাঁর জন্মদিনকে উপলক্ষ করে সবাই সমবেত হবে কারও আমন্ত্রণের তোয়াক্কা না করে! আমিও এই উপলক্ষের অংশী। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই তাঁকে। কামনা করি তাঁর কর্মমুখর দীর্ঘ জীবন।

২০১৪

আহমাদ মাযহার : প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমীরুল ইসলাম

স্যার ও আমরা

আমাদের পরম গুরু আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কল্যাণে, ভালোবাসায় আমাদের যৌবন যে রক্তরাগে রঞ্জিত হয়েছিল সেই স্মৃতি কখনো বিস্মৃত হবার নয়। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে একদা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলাম। নানা কাজে নানা উদ্যোগে নানা পাঠচক্রে সক্রিয় অংশ নিতাম। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হত কিশোর-তরুণদের উৎকর্ষধর্মী পত্রিকা *আসন্ন*। প্রায় দশ বছর এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম আমি। অথবা সায়ীদ স্যার আমাকে সম্পাদক বানিয়েছিলেন। এছাড়া কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত অনেক বইয়ের লেখক-সম্পাদক বা অনুবাদক হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এ সবই সায়ীদ স্যারের বদান্যতা। এক আশ্চর্য সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। ক্লান্তিহীন স্বপ্নবাজ তরুণতম হৃদয়ের অধিকারী তিনি। কারো ভিতরে যে কোনো বিষয়ের সামান্যতম সম্ভাবনা দেখলে তার পরিচর্যা করতে তিনি একান্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আমি যে সামান্য লেখালেখি করতে পারব এই জীবনে, আমার ভেতরের এই শক্তিকে জাগ্রত করেছিলেন সায়ীদ স্যার।

ঢাকার ব্যস্ততম এলাকায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো এমন অনিন্দ্যসুন্দর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ভবন থাকতে পারে এটা অবিশ্বাস্য। এমন সুচারু সৌন্দর্যময় পরিচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ করা একমাত্র সায়ীদ স্যারের পক্ষেই সম্ভব। শত শত ছাত্র-ছাত্রী, কর্মী, লেখক, সাংস্কৃতিক কর্মীদের পদভারে মুখর হয়ে উঠত প্রতিদিন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অঙ্গন। কিন্তু কোথাও কোনো মলিনতা থাকত না। আমরা ছিলাম অর্বাচীন। বাঁধনছেঁড়া দুষ্টু ছেলের দল। বাধাবন্ধনহীন মুক্ত, স্বাধীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা। সায়ীদ স্যার অসীম ধৈর্য নিয়ে আমাদের প্রশ্রয় দিতেন। আমাদের নিষ্ঠুর অকারণ যন্ত্রণায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মনও নিশ্চয়ই খারাপ হত। তখন যৌবনের দুঃসাহসের স্পর্ধায় দলিত-মথিত করে ফেলতাম সবকিছু। আজ পরিণত বয়সে উপলব্ধি হয় সায়ীদ স্যারের কাছে আমাদের অপরিশোধ্য ঋণ। স্যারের আন্তরিক প্রশ্রয়ে আমাদের যৌবনের দিনগুলো হয়েছিল রক্তিম, আনন্দময় ও বৈভবময়। একেই বলে সোনালি যৌবন।

প্রতি মুহূর্তে কামনা করি, সায়ীদ স্যার দীর্ঘজীবী হোন। আরও তরুণেরা, অনাগত তরুণেরা স্যারের প্রিয়তম মধুর সান্নিধ্যে উপভোগ করুক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আনন্দময় জীবনের জয়গান। সায়ীদ স্যার ছাড়া কে আমাদের উচ্চতর সাহিত্যের ধারণা দেবে? বিশুদ্ধতম কবিতা আমরা কী করে বোঝার চেষ্টা করব? নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে কে আমাদের ব্যাখ্যা দেবে? সভ্যতার ইতিহাস, দর্শনের ইতিহাস কীভাবে জানব? একজন সম্পন্ন মানুষ হয়ে ওঠার যে পথপরিক্রমা তার ঠিকানা কে দেবে? আলোকিত ও উচ্চতর মানুষ হতে গেলে সায়ীদ স্যারের ছায়া প্রয়োজন— এ যুগের আশাবাদী তরুণেরাও একথা ভালোভাবেই জানে।

সায়ীদ স্যার, জ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ নির্মাণ করেছেন কেন্দ্রে। দার্শনিক ভিত্তি আছে এমন জ্ঞানীদের মতো সায়ীদ স্যার সকলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ছোট হোক বড় হোক, কারো মতামতকে তিনি উপেক্ষা করেন না। তরুণতম শিক্ষার্থীর মতামতও তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন। ভুল বক্তব্যেও তিনি উত্তেজিত হন না। সকলের প্রতি স্যার সমান দরদী। যে কারণে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে মুক্ত বাতাসের প্রবাহ। মুক্ত-চিন্তার প্রাণপ্রবাহকেই সায়ীদ স্যার আলোকিত মানুষ হবার লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করে থাকেন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ঐশ্বর্যময় আকাশছোঁয়া নতুন ভবনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি সেই দিন আর দূরে নয়— আলোর ইশকুল থেকে উদ্দীপ্ত প্রাণের অসংখ্য আলোকিত তরুণের আগমন হবে আমাদের দেশে।

২০১৪

আমীরুল ইসলাম : ছড়াকার ও শিশুসাহিত্যিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনিসুল হক

ভালোবাসার সাম্পানের অক্লান্ত কাণ্ডারী

এইবার!
এইবার আমি আমার উপযুক্ত পথ খুঁজে পেয়েছি, মান্নান!
যাদের মধ্যে জ্বলছে শিল্পের শিখা,
জিজ্ঞাসার ক্ষুধা আর স্বপ্নের অজস্র আক্রমণ!
এক জায়গায় গুছিয়ে নিয়ে বসেছি এবার।
প্রকৃত স্বস্থতা! প্রকৃত শান্তি! প্রকৃত সমীকরণ!
ক ণ্ঠ স্ব র! টে-লি-ভি-শ-ন?—
লে-খা-লে-খি? শো-ম্যা-ন-শি-প?—
বি শ্ব সা হি ত্য কে ন্দ্র?—
ওসব অনেক হয়েছে।
তুমি তো জানোই, আমি আসলে নাট্যকার,
নাটকের রক্ত বইছে আমার শিরা উপশিরায়।
হ্যাঁ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে
একটি অলিখিত অসম্ভব নাটকের
শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে আমি শিরোপা দিতে চাই।
(আশা করি, জনাব কবীর চৌধুরী ও জনাব সাঈদ আহমদ অনুমোদন করবেন)

এই কবিতাটি আবদুল মান্নান সৈয়দের লেখা, *কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের অনেকগুলো পরিচয় এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতাটিতে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। *কণ্ঠস্বর* নামের সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক তিনি, টেলিভিশনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থাপক, আর এদেশে টেলিভিশন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের প্রবক্তা, প্রবল রকম জনপ্রিয়, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা তথা বইপড়া আন্দোলনের সংগঠক— আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের এই পরিচয়গুলো এই কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে সঠিকভাবেই। কবিতাটি ইদানীংকালে রচিত নয় বলে পরিবেশ আন্দোলনের আপসহীন সেনাপতি হিসেবে অধ্যাপক সায়ীদের সাম্প্রতিকতম পরিচয়খানি এ কবিতায় অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। কিন্তু আবদুল মান্নান সৈয়দ যে গোপনতম খবরটি এ কবিতায় নির্ভুলভাবে পরিবেশন করতে পেরেছেন, তা হল লেখক-কবি-নাট্যকার আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের দ্বন্দ্বদীর্ণ অতৃপ্ত হৃদয়ের হাহাকার; নিজের লেখালেখির ব্যাপারে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তরুণতম লেখকের মতোই আন্তরিক, অতৃপ্ত, নাছোড় এবং লাজুক। শত ব্যস্ততার মধ্যেও লিখে চলেছেন তিনি, গত কয়েক বছরে তাঁর লেখার পরিমাণ ছাপার হরফে সহস্র পৃষ্ঠার চেয়ে বেশি।

২

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে ভবিষ্যৎকাল কেন মনে রাখবে?

কিংবা কেন এবং কীভাবে তিনি আমাদের কালে আমাদের সমাজের একজন অগ্রগণ্য নায়ক হয়ে উঠলেন?

প্রথমত তিনি ছিলেন শিক্ষক। আমাদের কাছে তিনি স্যার। আরো নির্দিষ্ট করে বললে তিনি সায়ীদ স্যার। জীবনের তিরিশটি বছর কাটিয়েছেন শিক্ষকতায়। ১৯৬২ সালের ১ এপ্রিল তিনি রাজশাহী কলেজে যোগ দিয়েছিলেন প্রভাষক পদে, ১৯৯২ সালে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক পদটি তিনি যেদিন ছেড়ে দেন, সেদিনটিও ছিল বোকা-দিবস, ১ এপ্রিল। কাকতাল মনে হতে পারে এই দুই বোকা দিবসের সংযোগ, কিন্তু যখন আমরা জেনে যাই যে তাঁর প্রিয়তম উপদেশটি হল ছোটবেলায় তাঁকে বলা তাঁর শিক্ষক পিতার উক্তি— 'বোকা হোস', তখন বোঝা যায়, অন্তত চাকরি ছেড়ে দেবার তারিখটি হয়তো ভেবেচিন্তেই বেছে নেওয়া।

বোকা হোস— এই উক্তিটি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের প্রিয় কেন? তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওপরে দেওয়া এক তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় এ সম্পর্কে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, নিজের মঙ্গল-অমঙ্গল-স্বার্থ চিন্তা না করে অন্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মঙ্গল, দেশের কল্যাণ, সমাজের উন্নতির জন্যে যারা আত্মোৎসর্গ করে, সমাজের আর দশজন সাধারণ মানুষের চোখে তারা বিবেচিত হয় বোকা বলে। এই ধরনের বোকা মানুষরাই যুগে যুগে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন এই রকমের একজন বোকা মানুষ।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর চাকরিজীবনে পদোন্নতি, বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করেননি। পড়িয়ে গেছেন। তা-ও বোধ করি বোকার মতোই। কারণ পরীক্ষায় কোন প্রশ্নের উত্তর কীভাবে লিখলে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে, তাঁর ক্লাসে তা আলোচনা হত না। কিন্তু যা আলোচনা হত, তার সুখ্যাতি এখনও ছড়িয়ে আছে সমস্ত ঢাকায়, কিংবদন্তির মতো, এমন বহু লোকের দেখা আমরা পাই, যাঁরা বলেন, স্যারের ক্লাস করার জন্যে তাঁরা অন্য ক্লাস, অন্য কলেজ, অন্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হয়েও ছুটে যেতেন ঢাকা কলেজে।

হ্যাঁ। অসাধারণ বাগ্মিতার প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন এই নায়কমানুষটি। রসবোধ, কৌতুকবোধ, বাকভঙ্গি, পাণ্ডিত্য, দেশপ্রেম, কথায় কথায় কবিতা মুখস্থ বলার ক্ষমতা— সবমিলিয়ে কথক হিসেবে তাঁর ক্ষমতা হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতোই। তাঁর ওপর তিনি সুদর্শন; পোশাক নির্বাচনে ফ্যাশনদুরস্ত নন, কিন্তু স্টাইলিশড এবং সুরুচিসম্পন্ন। শব্দ নির্বাচনে ও বাক্যগঠনে তিনি খানিক অভিজাতপন্থী। তাঁর বক্তৃতা শোনা কিংবা তাঁর সঙ্গে ঘরোয়া আড্ডায় যোগ দেওয়া এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

৩

কিন্তু লোকটা কবি ছিল। তাঁর কবিতার বই আছে— *মৃত্যুময় ও চিরহরিৎ*। ছোটগল্পের বই আছে— *রোদনরূপসী, খরযৌবনের বন্দি, স্বপ্ন দুঃস্বপ্নের গল্প*। আর নাটক *যুদ্ধযাত্রা*। লোকটা কবি হতে চেয়েছিল, তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *বহে জলবতী ধারা*-য় অবশ্য তিনি লিখেছেন, ছেলেবেলায় তিনি কবি হতে চেয়েছিলেন, খেলোয়াড় হতে চেয়েছিলেন, দার্শনিক হতে চেয়েছিলেন, এমনকি হতে চেয়েছিলেন গুণ্ডা। কিন্তু ষাটের দশকের ঢাকা শহরে শিক্ষকতা আর সাহিত্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি চারপাশে দেখতে পেলেন এক বিশাল সাহিত্যিক যুগের আগমনের লক্ষণগুলো। অনেক প্রতিভাবান তরুণ লেখক এসে ভিড় করছে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায়, যাদের প্রত্যেকের ভেতরে দেখা যাচ্ছে অমিত সম্ভাবনা, এই সম্ভাবনার বিকাশের আয়োজনে একজন শ্রমিক হিসেবে কাজ করে যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের কবিতা লেখার চেয়ে বড় হয়ে উঠল তাঁর কাছে। তিনি এবং তাঁরা প্রকাশ করলেন সেই সময়ের তারুণ্যের মুখপত্র *কণ্ঠস্বর*, যা পরবর্তীকালে বিবেচিত হবে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী সাহিত্যিক পত্রিকা হিসেবে। সেই পত্রিকা সম্পাদনা করা, প্রকাশ করা, তার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে জিভ বের হয়ে আসা গ্লানিকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আর প্রতিষ্ঠান-বিরোধী একদল রাগী প্রতিভাবান তরুণ লেখককে বুকভরা ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখা— এই কাজগুলো যিনি করতেন, তাঁর নাম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। ষাটের দশকের বিখ্যাত সব কবি-লেখক— আবদুল মান্নান সৈয়দ, রফিক আজাদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, হুমায়ুন কবির, আসাদ চৌধুরী, (এমনকি হাসান আজিজুল হক), মোহাম্মদ রফিক, ফরহাদ মজহার, আবুল কাশেম ফজলুল হক, মুহম্মদ নূরুল হুদা, আহমদ ছফা, মাহমুদুল হক, আবদুশ শাকুর, সিকদার আমিনুল হক, সাযযাদ কাদির, আলতাফ হোসেন, শহীদুর রহমান, সেলিম সরোয়ার, আবু কায়সার, সনৎ কুমার সাহা, রবীন সমাদ্দার, শাহনূর খান প্রমুখ, সত্তরের দশকের আবিদ আজাদ, সানাউল হক খান, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, জাহিদুল হক, শিহাব সরকার, খান মুহম্মদ ফারাবী, ইকবাল আজিজ, কামাল চৌধুরীসহ আরো আরো কবি-লেখকদের একটা অন্যতম প্রধান আশ্রয় হয়ে উঠেছিল সেদিনকার সেই *কণ্ঠস্বর*।

কণ্ঠস্বর-এর লেখকদের অনেকেই আজকের বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখক। একটা দেশের সাহিত্যের জন্যে এটা একটা অনেক বড় ঘটনা। শুধু এই ঘটনার প্রধান কুশীলব হিসেবেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নায়কের মর্যাদায় আসীন হতে পারেন।

৪

শিক্ষকতা করছেন তিনি ঢাকা কলেজে, ঢাকা টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করেছেন, আর বের করেছেন *কণ্ঠস্বর*, আর তা করতে গিয়েই তাঁর মনে হল, তাঁর কালের লেখকদের প্রধান দুর্বলতা হল তাঁরা বেড়ে উঠেছেন বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে আর তিরিশের লেখকেরা বেড়ে উঠেছেন বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে। তিনি শুরু করলেন, ষাটের দশকের শেষের দিকে, পাঠচক্রের মাধ্যমে বইপড়া, বইয়ের আলোচনা করার অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম। সেটাই ছিল তাঁর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্মযজ্ঞের প্রথম বীজটির মাটিতে পড়া।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী কর্মযজ্ঞই না গড়ে তুলেছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ! সারা দেশে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শ-পাঁচেক শাখা আছে। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে এই শাখাগুলোর মাধ্যমে বই পড়ে। বই পড়ে বই বিষয়ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। পুরস্কার পায়। সে-ও বই-ই। বিশ্ববিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়-উত্তর ছাত্রছাত্রী আর ব্যক্তিদের জন্যে কেন্দ্রের আছে নানা মানসিক উৎকর্ষ কার্যক্রম। বিশ্বের আর বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ বইগুলো প্রকাশ করার জন্যে আছে প্রকাশনা কার্যক্রম। আছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংগীত আর চলচ্চিত্র উপভোগের ব্যবস্থা। ঢাকাসহ সারাদেশে এই কেন্দ্র ফি-বছর অন্তত ৫০০০টি মননশীল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। কেন্দ্রের আছে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার। বই নিয়ে শকট হাজির হয় রাজধানীর মহল্লায় মহল্লায়, পাঠকের দোরগোড়ায়। আলোকিত মানুষ চাই— এই শ্লোগান নিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র চালিয়ে যাচ্ছে আলোর পরশমণি ছুঁইয়ে দিতে আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের হৃদয়ে-মননে।

১৯৯৭ সালে এক প্রতিবেদনে তাঁকে নিয়ে যা লিখেছিলাম, তা এখনও বলা যায় তাঁর সম্পর্কে। এখানে সেটা উদ্ধৃত করি।

'বাতিওয়ালা, স্মৃতির শহরের সেই জাদুকরি লোকটা। যখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়, চরাচর ছেয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে, লোকটা তখন আলো হাতে চলেছে এক স্তম্ভ থেকে আরেক স্তম্ভে, জ্বেলে দিচ্ছে বাতি। আকাশ থেকে অন্ধকার নামছে নিচের দিকে, যবনিকার মতো; আর লোকটা মইয়ের সাহায্যে নিচ থেকে উঠছে উপরে, আলোকস্তম্ভের চূড়ায় চূড়ায়। অন্ধকারের বিরুদ্ধে, পতনের বিরুদ্ধে এই এক প্রতীক-মানবের প্রতীক-সংগ্রাম।

আমাদের বৈদ্যুতিক আলোর (ও লোডশেডিং-এর) এ শহরে আর কোনো বাতিওয়ালা নেই। কিন্তু আছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। এক লক্ষ আলো হাতে নিয়ে যিনি চলেছেন বাংলাদেশের তরুণ প্রাণপ্রদীপগুলোর কাছে। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই; নিয়তিতাড়িত বাতিওয়ালার মতোই যেন তাঁর এই ভবিতব্য। মানুষের প্রাণে প্রাণে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া। আলোকিত মানুষ গড়ে তোলা। আলোকিত মানুষ চাই। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'বাংলাদেশ একটা নতুন দেশ। এখন এর নির্মাণের সময়। নির্মাতা প্রয়োজন। একজন দুজন নয়, চাই সহস্র লক্ষ নির্মাতা। চাই আলোকিত মানুষ, সম্পন্ন মানুষ। আমরা ৫০০ জায়গা থেকে চেষ্টা করছি সেই আলোকিত মানুষ গড়ে তোলার।'

৫

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ১৯৬৬ থেকেই টিভি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে শুরু করেন। শিশুদের অনুষ্ঠান করতেন, করতেন নানা ধরনের কুইজভিত্তিক অনুষ্ঠান। ১৯৭৩ সাল থেকে টেলিভিশন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তিনি সিরিয়াস হয়ে ওঠেন। '৭৫-এ রামপুরায় বিশাল স্টুডিও পেয়ে তিনি মত্ত হয়ে উঠলেন টিভি অনুষ্ঠান নিয়ে। সত্তর দশকের শেষের অর্ধেকে এদেশের টেলিভিশন দর্শকদের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে আদরণীয় ব্যক্তিত্ব। *সপ্তবর্ণা*, *চতুরঙ্গ*, *আনন্দমেলা*— নানা নামে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান করেছেন তিনি। *সপ্তবর্ণা* প্রচারিত হত সপ্তাহে একটা, প্রতিটা পর্বের ব্যাপ্তি ছিল ৯০ মিনিট। এমনও হয়েছে, অনুষ্ঠান চলতে চলতে খবর শুরু হয়ে গেছে, খবরের মধ্যেই বলা হচ্ছে, এখন আমাদের স্টুডিওতে চলছে *সপ্তবর্ণা*, খবরের পরে সরাসরি আমরা যাচ্ছি সেখানে। *সপ্তবর্ণা* চলাটা তখন ছিল একটা জাতীয় সংবাদ।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ পারফরমিং আর্টের এই ক্ষেত্রটাও উপভোগ করেছেন ভীষণভাবে। আজকে বাংলাদেশে আমরা যত ধরনের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দেখি, তার প্রায় সব কটাই কোনো না কোনোভাবে ঋণী তাঁর কাছে। প্রায় ১৫০ ধরনের কুইজ তিনি করেছিলেন তাঁর ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানগুলোয়। আজ ভারতীয় স্যাটেলাইটে যে অন্ত্যক্ষরী জাতীয় গানের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, সেটাও তাঁরা করেছিলেন বিটিভিতে, সে আমলেই। আনন্দমেলা করেছিলেন ২৫ পর্ব, পরে সেটা ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে পরিবেশিত হতে থাকে। শেষতক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আর থাকেননি টিভি অনুষ্ঠান নিয়ে, কিন্তু ঈদে আনন্দমেলা করার চল এখনও রয়ে গেছে। টিভি অনুষ্ঠান উপস্থাপনার তুঙ্গ দিনগুলোতে তাঁর মনে হয়েছিল, অনুষ্ঠান করতে করতে যদি ফ্লোরের উপরে মরে পড়ে থাকতে পারতাম, তাহলে এ মর জীবন সার্থকতা পেত।

সেই মত্ততা থেকেও সরে আসেন তিনি। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কাজ বেড়ে যাওয়ায় ১৯৮২ সালের দিক থেকে তিনি ছেড়ে আসেন টিভি অনুষ্ঠান উপস্থাপকের জনপ্রিয়তার শৃঙ্গ থেকে, স্বেচ্ছায়।

৬

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের জন্ম ২৫ জুলাই, ১৯৪০, কলকাতায়। তাঁর পৈতৃক নিবাস কামারগাতি, কচুয়া, বাগেরহাট। পিতা মরহুম আযীম উদ্দিন ছিলেন কলেজ

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষক। পিতার কর্মসূত্রে তাঁর শৈশব কেটেছে করটিয়া, জামালপুর, পাবনা, বাগেরহাটের সভ্যতা আর নিসর্গ জড়াজড়ি করা পরিবেশে। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন পাবনা জিলা স্কুলের ছাত্র হিসেবে, উচ্চ মাধ্যমিক প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ, বাগেরহাট, স্নাতক আর স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

জীবনের একেকটা পর্যায়ে মেতে থেকেছেন একেকটা বিষয় নিয়ে। তিনি বলেন, মানুষের যৌবন একটা নয়। একেকটা বয়সে একেকটা নতুন বিষয় নিয়ে যদি উৎসাহিত হওয়া যায়, তাহলে একটা করে নতুন যৌবন সঞ্চারিত হয়, মস্তিষ্ক আবার সজাগ হয়ে ওঠে।

এখন তিনি লেগে পড়েছেন পরিবেশ আন্দোলন নিয়ে। এটা কেন তাঁর মধ্যে হঠাৎ এল?

এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই আমি একটু প্রকৃতিপরায়ণ ছিলাম। গাছপালা নিসর্গ নদী এসব আমাকে আগে থেকেই টানত।' সত্যি, তাঁর *বহে জলবতী ধারা* বইয়ে আমরা তাঁর এই নিসর্গপ্রীতির পরিচয় পাব।

তাঁর একটা নিবন্ধ থেকে এখানে খানিকটা উদ্ধৃতি দিতে চাই :

'সারাদিন এখানে আমার চারপাশে এক অদ্ভুত নৈসর্গিক জগৎ। থেকে-থেকে ডুকরে-ওঠা ঘুঘুর ডাকে নিঃসঙ্গ আর বিষণ্ন। কী যেন একটা সুদূর বেদনা আছে ঘুঘুগুলোর ডাকের ভেতরে...চারদিকে সেগুন, মেহগনি, শিশু আর নাম না জানা সুদৃশ্য গাছে সারাদিন কতগুলো বানর আর হনুমান ঘুরে বেড়ায়। গাছগুলোর ডালে প্রকট শব্দ তুলে এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে খাবার খোঁজে, ফল খায়— জীবনের নির্মম সংগ্রামের ভেতর বেঁচে থাকে।...

পরদিন হঠাৎ একঝাঁক অদ্ভুত পাখি এসেছিল এই বাংলোর বাগানগুলোয়। তাদের গলার স্বর হবহু মানবশিশুর কান্নার মতো...

আজকে সকাল থেকে একটা হলুদ পাখি বাংলোটাকে ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। চারপাশে ঘুঘুরা ডাকছে। দুদিন ধরে একটা বাগডাশা আচ্ছন্ন-চোখে লনটার ওপর দিয়ে বার দুয়েক হেঁটে তার নিজের রাজ্যে চলে গেছে। সামনের কাঞ্চন গাছের ডালে একটা বিশ্রী প্যাঁচা রাগী চোখে কটমটিয়ে চেয়ে থেকেছে... (*কোদালা চা-বাগান, নিউইয়র্কের আড্ডায়*)

তো তাঁর এই নিসর্গপ্রেম এই ষাটোর্ধ্ব বয়সের কোঠায় আসার পরে তাঁকে করে তুলেছে সক্রিয় পরিবেশবাদী। প্রধানত পরিবেশ রক্ষা শপথ (পরশ)-এর আগ্রহে তিনি একটু একটু করে সক্রিয় হতে থাকেন। এখন বিষয়টা তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কাজের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, পরিবেশের প্রশ্নে আমি এখন প্রায় হিংস্র হয়ে গেছি। গাছপালা খেলার মাঠ নদীনালা জলাশয় রক্ষার আন্দোলন, পরবর্তী প্রজন্মকে বঞ্চিত না করে যে উন্নতি, যাকে বলে টেকসই উন্নতির আন্দোলনে তিনি এখন তুমুলভাবে মত্ত।

৭

ভীষণ ব্যস্ত তিনি। একদণ্ড বসে জিরোনোর সময় নেই তাঁর। কেন্দ্রের কাজ, পরিবেশ রক্ষার কাজ, নানা সমিতি নানা সংগঠনের অনুষ্ঠানের দাওয়াত তাঁকে যেন ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে পাগলা ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে। এই বয়সেও যেকোনো যুবকের চেয়ে বেশি কাজ করেন তিনি। যদিও তাঁর স্বাস্থ্য খুব যে ভালো তা বলা যাবে না। বহু পুরনো মাথাব্যথা আছে, পিঠে ব্যথা দেখা দিয়েছে নতুন উপসর্গ হিসেবে। শরীরে একটা অপারেশন হয়েছে গত বছর। কিন্তু এসব তাঁকে টলাতে পারেনি তাঁর অবস্থান থেকে, শ্লথ করতে পারেনি তাঁর চলার গতিকে।

এই ক্লান্তিকর আর বিরামহীন ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁকে পেয়ে বসেছে লেখালেখি করার উদ্দীপনা। সমানে লিখে চলেছেন তিনি। এ পর্যন্ত বেরিয়েছে তাঁর তিরিশটিরও বেশি বই। কবিতা আর ছোটগল্পের বই ছাড়াও বেরিয়েছে তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ : *ভালোবাসার সাম্পান*, *নিষ্ফলা মাঠের কৃষক*, *বহে জলবতী ধারা*, *আমার উপস্থাপক জীবন*, প্রবন্ধের বই : *দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, *বন্ধ দরোজায় ধাক্কা*, *নিউইয়র্কের আড্ডায়*, *বিদায় অবন্তী*, *উত্তর প্রজন্ম*, *রস্ট্রাম থেকে* ১ ও ২ ইত্যাদি।

জনপ্রিয়তার চুড়ো স্পর্শ করেছিলেন তিনি, টেলিভিশনের উপস্থাপক হিসেবে। সেই সূত্রে এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও অন্যান্য কাজে তিনি যাতায়াত করেছেন ক্ষমতাকেন্দ্রের অনেকটা কাছাকাছি পর্যন্ত। কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যক্তিগত উন্নতির দিকে তিনি কখনও পা বাড়াননি। একবার একজন সেনানায়ক-রাষ্ট্রপতি তাঁকে তার উপদেষ্টা/মন্ত্রী হওয়ার জন্যে আহ্বান জানালে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি হলেন ক্ষত্রিয়। আর আমি হলাম শিক্ষক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ কখনও ক্ষত্রিয়ের অধীনে থাকতে পারে না।'

স্যার একটা ছোট্ট বাসায় থাকেন। অর্থ-সম্পদের মোহ তাঁর একদমই আছে বলে আমার কখনও মনে হয়নি। এই ক্ষেত্রে মনে হয়, ছোটবেলায় তাঁর বাবার দেওয়া উপদেশ 'বোকা হোস' তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছেন।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পর্কে একটা কথা আমার খুব মনে হয় : তাঁর ভালোবাসার ক্ষমতা অসাধারণ। তাঁর যাবতীয় কাজকর্মের পেছনে আছে তাঁর বিশাল হৃদয়, মানুষের জন্যে তাঁর ভালোবাসা। আমি যতবার তাঁর *ভালোবাসার সাম্পান* পড়ি, দেখতে পাই, সবকিছু ছাড়িয়ে তাঁর ভালোবাসার গুণটাই আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। এই বইয়ে প্রতিটা সৃষ্টিশীল মানুষ, লেখক, কবি, শিল্পীদের সম্পর্কে তিনি কতটা ভালোবাসা নিয়েই না কথা বলছেন। ষাটের বা সত্তরের দশকের একেকজনের সাহিত্যিক কীর্তি সম্পর্কে তিনি বলছেন এতটা ভালোবাসা আর গর্ব নিয়ে, মনে হয়, যেন তিনি নিজেরই সাফল্য বা নিজের সন্তানের গৌরবের কথা বয়ান করছেন। আবার তাঁর উত্তরসূরি টেলিভিশন উপস্থাপকদের প্রত্যেকের সম্পর্কে তিনি উচ্চধারণা পোষণ করেন, তাঁদের সম্পর্কে সুখ্যাতি গেয়ে বেড়ান। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার ভালোবাসাটা কিন্তু ব্যক্তির জন্যে নয়। ব্যক্তির জন্যেও আমার খুব ভালোবাসা আছে, কিন্তু এ ধরনের ভালোবাসা তো মরে যায়। আমার ভালোবাসা ব্যক্তির সম্ভাবনার প্রতি। কারো মধ্যে কোনো একটা সম্ভাবনা দেখলে আমি আন্তরিকভাবে চাই সেটা বিকশিত হোক।' দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে, সমাজের জন্যেও রয়েছে তাঁর সহজাত ভালোবাসা। এ থেকেই তিনি নিজের কবিত্বের বিকাশের চেয়ে অন্যকে কবি করে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন বেশি উৎসাহ নিয়ে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তোলেন, পরিবেশ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে দ্বন্দ্বে মাতেন। হুমকিরও শিকার হন। হুমকি শুনে তিনি হেসে বলেন, আমি তো অনেক বেশি বেঁচে ফেলেছি, ৬৩ বছর, অনেক গান শুনে ফেলেছি, অনেক আনন্দ করে জীবন পরিপূর্ণ করেছি, এখন আর এসব ভয় দেখিয়ে কী হবে?

৯

স্যার বইপড়ার আন্দোলন করে বেড়ান বটে, কিন্তু তিনি জানেন বেশি বই পড়লে মানুষ বাস্তব জীবনে তেমন কেজো হয়ে উঠতে পারে না। আমাকে তিনি বলেছেন, দ্যাখো, বই থেকে নিয়ে লিখো না, লেখার উপাদান নেবে জীবন থেকে।

স্যারকে আমি কখনও হতাশ হতে দেখিনি। তাঁকে বলি, স্যার, আপনার হতাশা আসে না? এই যে দেশটার উন্নতি হচ্ছে না, আবার দেখেন এক বুশ-ব্লেয়ার সমস্তটা পৃথিবীর যাবতীয় সুনীতি-ন্যায়বিচারকে কী রকম অর্থহীন ব্যাপার বানিয়ে ফেলল।

তিনি বলেন, 'মুহূর্তের ঘটনায় আমি বিমর্ষ হই। কিন্তু হতাশ হই না। কারণ মুহূর্তের ঘটনা দিয়ে জগতের হিসাব করলে চলবে না। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস ক্রমাগতভাবে কল্যাণের দিকে যাত্রার ইতিহাস। বড় পটভূমির বিচারে মুহূর্তের ব্যর্থতা ধোপে টেকে না।' বাংলাদেশের ব্যাপারেও স্যার খুবই আশাবাদী। মুক্তিযুদ্ধে জাতির জেগে ওঠার আর ঐক্যবদ্ধতার আর সাহসিকতার আর ত্যাগের উদাহরণটাকেই তিনি সামনে আনতে চান।

১০

মাঝে-মধ্যে আমার নিজের মধ্যেই যে প্রশ্নটা জাগেনি, এমন নয়— বই না পড়লেই বা কী ক্ষতি? বহু মানুষ তো পাঠ্যবইয়ের বাইরে একটা বই না পড়েও দিব্যি আয়-উন্নতি করে চালিয়ে নিচ্ছে এবং কখনও কখনও দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রকে চালাচ্ছে। চলছে না?

সম্প্রতি এই প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি। বুশ আর ব্লেয়ার মিলে পৃথিবীর যে এত বড় ক্ষতি করল, প্রাণহানি, মানবিক বিপর্যয় ছাড়াও মূল্যবোধের ওপরে যে আঘাত, তা ভাবলে খুবই বিষণ্ন লাগে। কোনো কাজে আর উৎসাহ আসে না। এই নিয়ে ভাবতে গিয়েই মনে হত, আচ্ছা যদি এমন হত, বুশকে দিয়ে তার ছাত্রাবস্থায় কিছু ভালো কবিতা পড়িয়ে নেওয়া যেত, ভালো সংগীত, উৎকৃষ্ট চিত্রকলা, উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্রের একজন রসগ্রাহী ভোক্তায় পরিণত করা হত তাকে, তাহলে কি লোকটা একটা প্রাচীন সভ্যতার ওপরে এইভাবে নির্বিচার বোমাবর্ষণ করতে পারত?

নিশ্চয় পারত না।

হায়, বুশের ছেলেবেলায় বুশের শহরে যদি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থাকত!

এই ভাবনাটা আসার পরে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কর্মকাণ্ডের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিরঙ্কুশ হয়েছে, তিনি আসলে ভেতরে ভেতরে শুশ্রূষা জোগাচ্ছেন সমস্তটা সভ্যতাকে, মানুষের যাবতীয় কল্যাণমুখিনতাকে, কোমলতাকে, সুকুমার বৃত্তিকে, সৌন্দর্যকে, শ্রেয়োবোধকে, তিনি আসলে পরিচর্যা করে চলেছেন মানুষের মনুষ্যত্বকে।

গাছের বোঁটায় ধরা ফলের মতো তার ফলটা হয়তো চোখে পড়ে না, কিন্তু তা আছে, তা কাজ করে চলেছে সভ্যতার ভেতরে ভেতরে।

২০০২

আনিসুল হক : সাহিত্যিক, সাংবাদিক

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুন নূর তুষার

স্যারকে নিয়ে হ য ব র ল চিন্তা

১৯৮৪ সালের শেষে, সবে এসএসসি দিয়ে কলেজে পা রেখেছি। একটু তাড়াতাড়ি পড়ার কারণে নাকের নিচে গোঁফের রেখা তখনো পুরোপুরি দৃশ্যমান নয়। আমাদের কলেজে এলেন গুম্ফধারী, পাঞ্জাবিওয়ালা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। একাদশ শ্রেণির পাঠদান এক ঘণ্টার জন্য বন্ধ রেখে আমাদের ক্লাসে তিনি বক্তৃতা দেবেন। মানবিক শাখার ছেলেরাও চলে এল বিজ্ঞান শাখার শ্রেণিকক্ষে। তিনি সত্তর মিনিট কথা বললেন। এই সত্তর মিনিট ছেলেরা হাসল, চুপ করে থাকল, তালি দিল, ভাবে গম্ভীর হল, উদ্দীপিত হল। এই সত্তর মিনিটে আমি অবাক হয়ে দেখলাম—একজন মানুষ কী সুন্দর কথা বলেন।

আমার মনে হল বক্তৃতা দিলে এই লোকটির চাইতেও ভালো বক্তৃতা দিতে হবে। কথা বলে যদি যাদুই করা যায় তবে আমিও সেই যাদুকর হব। কিন্তু কেন্দ্রে আসবার ইচ্ছা হয়নি তখনো। তিনি চলে যাবার পরে আমাদের ক্লাসের ২৮ জন ঠিক করল, তারা কেন্দ্রে যাবে। আমি আগের মতো বলে বসলাম, ওখানে গেলে লোকে পেকে যায়। আমি যাব না। হঠাৎ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল এক বন্ধু। ১০০০ টাকার বই তো তুই পরীক্ষা দিয়ে পাবি না। সেজন্যই যাবি না। স্কুলের বাংলা খাতার নম্বর আর কেন্দ্রের বই পড়ার প্রতিযোগিতার পরীক্ষা তো আর এক হবে না। দেখা যাবে তোর দৌড়।

জেদ চেপে গেল। তারপর আমি হলাম ২৯ নম্বর। আমরা ২৯ জন নাম দিলাম। দেখা গেল সময় যত পার হতে লাগল আমরা বাকি ২৮ বন্ধুর সবাই কোচিং, পরীক্ষা আর নোট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল আর আমি পড়ে থাকি কেন্দ্রে। কেন্দ্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাইব্রেরি, মাযহার ভাই, সাইদুর ভাইয়ের সাথে বসে থাকা। ভুট্টো ভাই আর আনোয়ার ভাইয়ের সাথে নানারকম কাজ। ইসফেন্দিয়ার জাহেদ হাসান মিলনায়তনের পেছনে কয়েকটি ছোট্ট ঘরে দুপুরের ঘুম, কেন্দ্রের কাছেই জহুরা মার্কেটের পেছনে হোটেলে গিয়ে খাওয়া। একসময় ১০০০ টাকার সেই দশটি মাত্র পুরস্কারের একটি বগলদাবা করে ঘরে ফেরা। দু'বছর পরে আমার ছোটভাইও ১০০০ টাকার সেই বই নিয়ে ঘরে ফিরেছিল। আমাদের বাসায় তাই কেন্দ্রের কলেজ বইপড়া কর্মসূচির দুটো বিরাট বইয়ের সোনালি ফিতে বাঁধা বান্ডিল। আমার মা দুটোই যত্ন করে রেখে দিয়েছেন ওভাবেই। বইগুলো অবশ্য পড়েছি আমরা।

তারপর একসময় পিতা-পুত্রের মতো একসাথে যেতাম স্কুল কর্মসূচির কাজে। স্যারের পাবলিকা গাড়ির পেছনে পুরস্কারের বই। আর মাইক ও স্পিকার। স্যার গাড়ি চালাতেন। আমি পাশে বসে তাঁর সাথে বোকার মতো নানারকম আলাপ করতাম। তিনি সোৎসাহে আমার সাথে মাথা নাড়তেন, গল্প করতেন। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সাথে কথা বলতাম আর দেখতাম— তিনি কী করেন, কী বলেন। মনে আছে, গেলাম কামরুন্নেসা স্কুলে। কাছাকাছি বয়সের মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে একটু বেশি দুষ্ট হয়। আমাকে চিরকুট পাঠিয়ে দিল কয়েকজন। তাতে নানারকম মন্তব্য। স্যারের সাথে চলি-ফিরি, ভাবখানা আমিও ছোট্ট 'স্যার'। তাই সেসব চিরকুট খুলেও দেখার দরকার মনে করিনি। এখন ভাবি, না জানি কোন রূপবর্তীর চিরকুট হেলায় ফেলে দিয়ে এসেছিলাম হাটখোলার মোড়ে।

অগ্রণী স্কুলে গেলাম। সেখানে বড় আপা মিসেস মনসুর। তাঁর চোটপাটই আলাদা। সকলকে রেখেছেন ধমকের ওপর। এমনকি আমাদেরও সামান্য ধমক দিলেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই। মমতাজউদ্দিন আহমদ বললেন। স্যার বলবেন। আর আগে বলবেন আপা। আমি উপস্থাপক। মাঠভর্তি মেয়েদের সামনে আমি বললাম, মেয়েরা, এবার বড় আপা আমাদের উদ্দেশে কিছু ধমক দেবেন। সকলের অট্টহাসির মধ্যে নিতান্তই লাজুক ভঙ্গীতে আপা বললেন— মেয়েরা, বল তোমরা, আমি কি শুধু ধমকাই? তোমাদের আদর করি না?

সেই বোধহয় স্যার বুঝলেন, আমার মধ্যে তাৎক্ষণিক উপস্থাপনা করার বিশেষ কোনো গুণ আছে। কেন্দ্রের প্রায় সকল অনুষ্ঠানে মঞ্চে ডাকতেন তিনি আমাকে। আমিও মাইক পেয়ে যেমন খুশি তেমন বল প্রতিযোগিতা করতাম। স্যারের বিশেষ স্নেহধন্য লুৎফর রহমান রিটন ও আমীরুল ইসলাম। আর তার অশেষ প্রশংসা ছিল ডা. লিয়াকত আলী, ডা. মিজানুর রহমান আর মিজারুল কায়েস-এর প্রতি। এখনো স্যার বলেন, দেশে ব্রিটিশদের চেয়েও ভালো ইংরেজি জানে কায়েস। আর

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিয়াকত আলীর দর্শন নিয়ে পড়াশোনার ভূয়সী প্রশংসা ছিল তাঁর। রিটন হল অসাধারণ বুদ্ধিমান। তার মতো তাৎক্ষণিক লেখার ক্ষমতা আর কারো নেই। আমি শুনতাম আর ঈর্ষায় কাতর হতাম। স্যার কি কখনো আমার প্রশংসা করবেন? আমি এখনো জানি না, স্যার আমার প্রশংসা কখনো করেন কি না।

এ বছর সায়ীদ স্যার তাঁর একটি বই আমাকে উৎসর্গ করেছেন। বইটির প্রায় পুরোটা জুড়েই আমি আছি। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন আমি লেখক ও সুবক্তা। 'সুবক্তা' শব্দটি দেখে আমার চোখে জল চলে এল। আজো কি পেয়েছি আমি সেই ৩০ বছর আগের মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকা তুষারের মতো একটি ছেলেকে জাগাতে? বিস্ময়ের প্রাবল্যে যে ঠিক করেছিল কথা বললে এই লোকটির মতোই কথা বলতে হবে। এখনো কি পেয়েছি খুঁজে আমার সেরা বক্তৃতাটিকে? যে কথায় হৃদয় জেগে ওঠে, রক্তের মধ্যে ভাইরাসের মতো বিস্তার লাভ করে মানুষের জন্য ভালোবাসা।

আমার কাছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে মনে হয় রূপকথার সেই বাক্সটির মতো। যে বাক্সের মধ্যে আরো বাক্স। আরো বাক্স। বাক্স পাহারা দেয় শত সহস্র রাজকুমার আর রাজকুমারী। সবশেষ বাক্সটিতে আছেন প্রাণভোমরা সায়ীদ স্যার।

সেই বাক্সে পৌঁছানোর মন্ত্রটি জানি আমরা— মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়, আশার সমান মহান।

২০১৪

আবদুন নূর তুষার : টিভিব্যক্তিত্ব, লেখক

ধ্রুব এষ

সার্থক সে, যে দেয় অনেক

বইভর্তি গাড়ি কিংবা
গাড়িভর্তি বই
দেখে তাজ্জব হই।
কোথায় দেখি?

রাস্তায়। এত এত বই নিয়ে গাড়ি চলে যায়। একটা দুটো না, কয়েকটা গাড়ি। বই নিয়ে যায় এদিক ওদিকে। যানজটে তেমন একটা গাড়ির পাশে কখনো আটকা পড়ে গেলে, দেখা যায় এক আশ্চর্য জগৎ। গাড়ি ভর্তি রঙ বেরঙের বই। কত আগে পড়া কত বইয়ের নাম চোখে পড়ে, মনে পড়ে। *বুড়ো আংলা, চাঁদের পাহাড়, আম আঁটির ভেঁপু, ঠাকুরমার ঝুলি ...*। যানজটের বিরক্তি থাকে আর কিছুতে? ক্রমশ যন্ত্রজালে আটকে পড়া আমাদের মগজে ঠাণ্ডা এক ঝলক হাওয়া ঢুকে পড়ে হঠাৎ। বকুল ফুলের গাছ বাহিত হাওয়া মনে হয়। এমন স্নিগ্ধ।

কিছু নিয়ম আছে, থাকতেই হবে, বইয়ের গাড়ি থেকে বই নিয়ে পড়া যায়। কারা পড়ে? ১৬ বছরের বালক বালিকা থেকে ৬১ বছরের বুড়োবুড়ি। যে কেউ, যে কোনো বয়সের। বিস্ময়ের ঘটনা বটে। তবে না এত কথা শোনা যায়, বই আর পড়ে না মানুষজন? বিশেষত ছেলেপুলেরা, নেট সার্ফিং করে কুল পায় না, আবার পড়বে বই! পরিসংখ্যান বলছে, না এটা ধারণা? নাকি নিছক ব্যবসায়িক হাহাকার? যেমন তেমন বই ছাপিয়ে মাতম, পাঠক কমে যাচ্ছে! পাঠক কমে যাচ্ছে! আরে পাঠক, পাঠকরা কী বোকা? বাজে বই কেন পড়বে? ভালো বই এখনও ঠিকই পড়ে। বইয়ের গাড়ির বই তো পড়ছে। এ যে কী অসাধারণ একটা ব্যাপার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-পাড়া ও-পাড়ায়
বইয়ের গাড়ি দাঁড়ায়
যারা পড়ার তারা বই নিয়ে পড়ে।

আমাদের চর্যার কথা বলি। মাসুক ভাইয়ের মেয়ে। আর্টিস্ট মাসুক হেলাল। চর্যারা থাকে মিরপুর এলাকায়। কয়েক বছর আগে ছোট্ট চর্যা একদিন ফোন করে কী যে খুশি গলায় বলল, 'জানো ধ্রুবকাকা, আমাদের কলোনিতে না আজ বইয়ের গাড়ি এসেছিল!'

'তাই নাকি? বাহ!'

'হ্যাঁ-এ-এ। শোনো, আমি না একটা বই নিয়ে পড়েছি। *চুক আর গেক*। বইটা কী মজার জানো? হি! হি! হি!'

চুক আর গেক। আর্কাদি গাইদারের। আমিও পড়েছি। সেই কোন ছোটবেলায়। এখন চর্যা, চর্যারা পড়ছে!

চর্যার সঙ্গে এরপর আরও অনেকবার আমার কথা হয়েছে বইয়ের গাড়ি নিয়ে। মন ভালো হয়ে গেছে শুনে, কত বই পড়ছে আমাদের ছোট্ট মেয়েটা। বইয়ের গাড়ি না থাকলে কি এমন একটা ঘটনা ঘটত?

মাস চারেক আগে আড্ডা হচ্ছে ছাদে, মাসুক ভাই বলল, 'চর্যার তো খুব মন খারাপ, ধ্রুব।'

'কেন মাসুক ভাই? কী হয়েছে?'

'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইয়ের গাড়ি নাকি বন্ধ হয়ে যাবে।'

'কী? কে বলল?'

'গাড়ির লোকজনই নাকি বলেছে।'

ফোনে কথা হলো চর্যার সঙ্গেও।

'জানো ধ্রুবকাকা, বইয়ের গাড়ি তো আর আসবে না।'

আহারে! কী মন খারাপ গলারে মেয়েটার।

আমারও কি কম মন খারাপ হলো? এটা কি রকম? ভালো কিছুই কি আমাদের থাকবে না? আমরা ধরে রাখতে পারব না? কিন্তু এটা কেন ঘটবে? বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে আমরা সংক্ষেপে বলি কেন্দ্র। কেন্দ্রে যাব? কথা বলব কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের সঙ্গে? আমাদের 'স্যার'।

বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া আমি সময় নষ্ট করতে যাই না স্যারের। কর্মনিষ্ঠ মানুষ, এমন মানুষের প্রত্যেকটা মুহূর্তই মূল্যবান। তার মতো মানুষদের সময় নষ্ট করাকে অবশ্যই বিবেচনা করি, অপরাধ। আবার এই সু-বিবেচনার পরও মাঝেমধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় নষ্ট করতে যাই তার। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ সংকটের কথা বলি। কেন? কেন নয়, জানি তো যে, এই মানুষটার হৃদয়ের কোথাও আমার জন্য একটা রোদের কণা আছে। আর একটা কথা উল্লেখ করি। এখন, এই লেখা যখন লিখছি মজার একটা অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার বয়স একুশ। স্যারের সঙ্গে সেই বয়সেই প্রথম দেখা হয়েছিল। আমীরুল ভাই, শিশুসাহিত্যিক আমীরুল ইসলামের তদারকিতে। কম দিন আগের ঘটনা? কত কিছু ঘটে গেল তারপর দুনিয়ায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবে নোবেল পেয়েছিলেন, সেই নোবেল পদক চুরি হয়ে গেল। এ নিয়ে আবার *নোবেল চোর* সিনেমাও হয়ে গেল সেদিন। যায় দিন যায়। এর তার সঙ্গে আমার বয়সও বেড়েছে। কিন্তু স্যারের কাছে বাড়েনি। আমার দিক থেকে। স্যারের কাছে যখনই যাই আমার বয়স একুশ হয়ে যায়। দু-একটা কথা যা বলবার বলি, বসে থাকি এবং মুগ্ধ হয়ে স্যারের কথা শুনি। স্বপ্ন ছাড়া স্যার মুহূর্ত বাঁচেন না। স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখান। বলি, জাদুকর। একা একহাতে যা করেছেন মানুষটা!

মাসুক ভাইয়ের কথা শুনে কেন্দ্রের হযরত আলীকে ফোন দিলাম। স্যার সময় দিলেন পরদিন সন্ধ্যায়। আমি থাকি পুরানা পল্টনে। না রিকশা মিলল, না অটো। কেউ বাংলামোটরের দিকে যাবে না। যাবে যে কিভাবে যাবে? 'কালান্তক' যানজট রাস্তায়! হাঁটা দিলাম। হাঁটতে হাঁটতে বাংলামটর, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের গলি।

নবনির্মিত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ভবনের আটতলায় বসে আছেন স্যার। কথা বলছেন আর দুজনের সঙ্গে। কেন্দ্র নিয়ে কথা, দেশ নিয়ে কথা, যানজট নিয়ে কথা। সঙ্গে চা এবং বিস্কুট। অতিথি দুজন চলে গেলেন। এবার স্যারের মূল্যবান সময়ের কিছুটা শুধু আমার জন্য বরাদ্দ।

'স্যার, একটা কথা শুনলাম। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির গাড়িগুলো নাকি বন্ধ হয়ে যাবে?'

বিষাদ ফুটল স্যারের কণ্ঠে, 'হ্যাঁ। এত খরচ। চালানো আর সম্ভব হচ্ছে না, বুঝেছ?'

'কিন্তু স্যার এত সুন্দর একটা প্রজেক্ট। রাস্তায় যখন ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লেখা গাড়িগুলো দেখি, বুকটা যে কিরকম ভরে যায়। এই প্রজেক্টটা বন্ধ হয়ে যাবে?'

'উপায় নেই হে। এত টাকা আমি পাব কোথায় বলো? কে দেবে? এটা চালাতে গিয়ে এর মধ্যেই কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে।'

সত্যি তাহলে চর্যাদের কলোনিতে আর বইয়ের গাড়ি যাবে না। রাস্তায়, যানজটে, বইভর্তি গাড়ি কিংবা গাড়িভর্তি বই আর দেখা যাবে না। নিরাশার মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশাবাদী হওয়ার মতো আরও একটা ব্যাপারের তাহলে অপমৃত্যু হলো? কেউ কিছু করবে না?

ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি থেকে কেন্দ্রের নবনির্মিত ভবন নিয়ে কথা।

স্যার বললেন, 'তুমি কি আমাদের আর্ট গ্যালারি দেখেছ?'

'জি না, স্যার।'

'আসো তোমাকে আর্ট গ্যালারি দেখাই। হযরত, গ্যালারির চাবি কোথায়?'

আর্ট গ্যালারি লিফটের চারে। দুইতলায় লাইব্রেরি। অন্যান্য ফ্লোরে সেমিনার রুম, হল রুম, ছাদে ক্যাফেটরিয়া। সব স্যার সঙ্গে করে ঘুরে দেখালেন। পরম মমতায়। এই তার স্বপ্নের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। একা একহাতে গড়ে তুলেছেন। এই শহরের সবচেয়ে আলোকিত ভবন। ঘুরে দেখলাম আমাদের দেখা সবচেয়ে স্বপ্নবান মানুষটার সঙ্গে, যে মানুষটা নিজের জন্য না স্বপ্ন দেখেন সকলের জন্য, উৎকর্ষ ঘটুক সবার মেধা ও মননের। এই ফ্লোর, ওই ফ্লোর দেখতে দেখতে স্যারের আরও অনেক স্বপ্নের কথা শুনলাম। বিষাদক্লান্ত একটা সন্ধ্যা যে কিভাবে স্বপ্ন ঝলমলে হয়ে গেল! স্যার এ পারেন।

বাসায় ফিরলাম আবার হেঁটে। ঝলমলে অনেক স্বপ্ন মাথায় নিয়ে। নিরাশ হওয়া যাবে না তাহলে। স্যারের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকলে এটা ঘটে। নিরাশা পালায়। কিন্তু কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রজেক্টটা বন্ধই হয়ে গেল! বইভর্তি গাড়ি। স্বপ্নভর্তি গাড়ি। আলোভর্তি গাড়ি। দেখব না আর?

অন্য দুজন মানুষের কথা একটু বলি এখানে। একজন এক গ্রাম্য পিতা। পুঁথিগত বিদ্যার দিক থেকে অল্পশিক্ষিত মানুষ। তার লেখক ছেলের কাছে কথাটা শুনেছি। ছেলেদের সেই পিতা বলতেন, 'বাবারে, শরীরের নুনের লগে মগজের নুনও দরকার।'

আরেকজন মানুষ হলেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। সুনামগঞ্জ সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান স্যার। স্যার একটা কোটেশন প্রায় বলতেন, 'When you truly want something the world conspires to make it happen.'

হঠাৎ এই দুজন মানুষের কথা কেন? প্রথম জনের কথা কেন, মনে হয় বলতে হবে না। দ্বিতীয় জনকে স্মরণ করলাম কারণ এই কয়েকদিন আগেই শুনলাম, স্যারের স্বপ্নের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি বন্ধ হচ্ছে না। বরং গাড়ির সংখ্যা আরো বাড়ছে। সরকার অনুদান দিচ্ছেন। কৃতজ্ঞ হলাম। আবার তাহলে গাড়িভর্তি বই কিংবা বইভর্তি গাড়ি দেখা যাবে রাস্তায়। একদিন হয়ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারা দেশের সব রাস্তায়। ছুটে যাবে 'আলোকিত মানুষ চাই' লেখা কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির গাড়ি। আলোকিত হবে নানান জনপদ। অনেকের জন্য এরকম স্বপ্ন দেখেন বা দেখতে পারেন কয়জন? পারেন আমাদের স্যার। চিরস্বপ্নবান আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

শেষ করি স্যারের *বিস্রস্ত জর্নাল* বই থেকে একটা কোটেশন দিয়ে, 'সফল সে, যে পৃথিবীর কাছ থেকে নেয় অনেক; সার্থক সে, যে দেয় অনেক।'

২০১৫

ধ্রুব এষ : চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টোকন ঠাকুর

সায়ীদ স্যারের উপস্থিতি

অবশ্যই আমাকে ফিরে তাকাতে হবে নবগঙ্গা নদীটির দিকে। নবগঙ্গা খুব ছোট্ট নদী। এই নদীতীরেই ছোট্ট শহর— ঝিনাইদহ। ঝিনাইদহ শহরের প্রধান দুটি সড়কের নাম গীতাঞ্জলি সড়ক ও অগ্নিবীণা সড়ক। রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের নামে হয়তো অনেক কিছুই আছে উপমহাদেশে; কিন্তু দুটি কাব্যগ্রন্থের নামে দুটি রাস্তা— এ আমার জানার মধ্যে আর নেই। তো, সেই ছোট্ট শহরটাতেই আমি বড় হচ্ছিলাম। ফলে, সে শহর ছেড়ে অনেক দূরে, পৃথিবীর আরও কত বড় বড় শহরে আমি ঘুরি বটে, তবু, অবশ্যই আমাকে ফিরে তাকাতে হয় গীতাঞ্জলি সড়কের দিকে, অগ্নিবীণা সড়কের দিকে, আমাদের ঝিনাইদহ শহরের দিকে।

ঝিনাইদহের প্রধান কলেজটির নাম সরকারি কেশবচন্দ্র কলেজ। আমি একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলাম এই কলেজে। এই কলেজেরই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন গল্পলেখক শহীদুর রহমান। এবং আমি শহীদুর রহমানের ছাত্র, সে ভালোলাগাও আমার চিরদিনের। এই চুপচাপ মফস্বলে কাটিয়ে দেওয়া কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক শহীদুর রহমান বা আমাদের শহীদ স্যার— স্যারই আমাকে চিনিয়েছিলেন তাঁদের সায়ীদ ভাই বা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে। বাংলাদেশে 'স্যার' হিসেবে সর্বাধিক মান্যযোগ্য কে? নিশ্চিত, 'সায়ীদ স্যার'ই বাংলাদেশে সর্বোচ্চ পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য 'স্যার'। এই রচনায় সায়ীদ স্যারকে নিয়ে আত্মজৈবনিক আঁচড় কাটব বটে, তবে, তার আগে, আমাকে ফিরে তাকাতে হবে ঝিনেদা'র শহীদ স্যারের দিকে। শহীদ স্যারই ঝিনাইদহে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন। সেই কর্মসূচিতে আমি অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর মতো অংশগ্রহণকারী হয়েও সংগঠক শহীদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যারের প্রধান সহযোগী হয়ে কাজ করতাম। জেলা পর্যায়ের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়া কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়েই আমি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে চিনে নিতে পারছিলাম। আমার সায়ীদ স্যারকে চিনে ওঠায় শহীদ স্যারের ভূমিকাই ছিল প্রথম। সেই ভূমিকা অতি মূল্যবান। সারাজীবন বয়ে বেড়ানোর মতো।

সে সময় অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একদিন ঢাকা থেকে ঝিনেদায় এলেন। ঝিনেদা'র বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কার্যক্রম দেখবেন। শহীদ স্যারের বাসা ছিল কে সি কলেজের ঠিক পেছনেই। সায়ীদ স্যার ঝিনেদা'র সার্কিট হাউজে উঠলেও তিনি শহীদ স্যারের বাসায় এলেন আড্ডা দিতে। এটা এমন এক সময়ে, যখন এন্টেনার বাঁশ ঘুরিয়ে মানুষ বিটিভি'র অনুষ্ঠান দেখত। সায়ীদ স্যারও বিটিভি'র অনুষ্ঠান করতেন। যাই হোক, সায়ীদ স্যার শহীদুর রহমানের কিছু অগ্রজ। শহীদুর রহমানেরও সেই উঠতি যৌবন থেকে মাঝবয়স পর্যন্ত কেটেছে ঢাকাতেই। সেই *সমকাল*, *কণ্ঠস্বর*, *পূর্বমেঘ*, *স্বাক্ষর*-এর দিনে ঢাকায় শহীদুর রহমান এক ভিন্ন ধারার গল্পকার। কবিতাও লিখতেন। আলাদা ধারার মানুষ। '৬১-তে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পালনের বিরোধিতা করেছে আইয়ুব সরকার। ছায়ানটের জন্ম হচ্ছে যে সময়। নাগরিক বাঙালির মধ্যে একটা স্বাধিকার চেতনার উন্মেষণ ঘটে গেছে। সে সময় শহীদুর রহমান বা তাঁর বন্ধু আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রফিক আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সিকদার আমিনুল হক— এঁরা সব তরুণ কবি, তরুণ লেখক। সবাই জানে, *কণ্ঠস্বর* সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এই তরুণগণের প্রশ্রয়দানকারী। *সাম্প্রতিক ধারার গল্প* নামে একটা বই দেখেছিলাম ঝিনেদা পাবলিক লাইব্রেরিতে। '৬৪ সালে প্রকাশিত বইটি। ছয়টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত সেই নতুন ভঙ্গির গল্পকারগণ ছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শহীদুর রহমান, ইমরুল চৌধুরী আর অন্যজন কে— আমার এ মুহূর্তে মনে নেই। ১৯৬৪-তে প্রকাশিত সেই গল্প সংকলনের সম্পাদক ছিলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। বইটা আমি ১৯৮৯ সালের দিকে ঝিনেদা সরকারি পাবলিক লাইব্রেরিতে ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেলাম। এ কথা তখন আমি শহীদ স্যারকে গিয়ে বললাম। পরে, সায়ীদ স্যারকেও বলেছি।

যাই হোক, আমার কলেজজীবনে পাওয়া শিক্ষক গল্পকার শহীদুর রহমানের কাছেই আমি সাহিত্যের কত কিছু যে শুনে শিখেছি। শহীদ স্যার মারা গেলেন ১৯৯২ সালে। ঝিনাইদহে। তখন খুলনা আর্ট কলেজে পড়তাম। পরে, '৯৪ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে চলে আসি খুলনা আর্ট কলেজ থেকে মাইগ্রেট করে। তারপর থেকেই তো ঢাকায় থাকি।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলামটরের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের এখন নতুন ভবন হয়েছে। আমাদের মনে থেকে যাবে সেই পুরনো ভবন, সে সময়ের আড্ডা-অনুষ্ঠানগুলো। মূলত সায়ীদ স্যারের মতো একজন আলোকবর্তিকা বাতিঘর ছিলেন বলেই এদেশে তারুণ্য গত তিন-চার দশক শাণিত হয়েছে বই পাঠের মাধ্যমে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মানেই তো অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মানেই বাংলাদেশের পাঠচর্চায় মনোযোগী প্রজন্মের কাছে শ্রদ্ধেয় 'স্যার'। 'স্যার' মানেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। জড়তাগ্রস্ত, দরিদ্র, পাঠবিমুখ এক অশিক্ষিত জাতিতে এরকম মানুষ আর দ্বিতীয়টা আসেনি বাংলাদেশে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একাই অনেক। সায়ীদ স্যার মানেই তাই দেশের মেধাবী ছেলেমেয়ের স্বপ্নের মানুষটি। স্যার স্বপ্ন দেখেন এবং দেখান। আমরা স্বপ্ন দেখেছি, আমাদের আগেও আরও দুই-তিন প্রজন্মের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা স্বপ্ন দেখেছেন, এবং এই স্থবির দেশের আগত নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও আলোকিত স্বপ্ন দেখবে— সেই ভিত্তিও স্যার গড়ে দিয়েছেন। সে কারণেই, দেখা হলেই স্যার যেভাবে কথা বলেন, মনে হয় তিনি আমার অভিভাবক। অভিভাবক তিনি এদেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের, যাদের হাতে পাঠ্যবইয়ের বাইরে তিনি তুলে ছিলেন শত শত বই। পৃথিবীর নানান ভাষার সাহিত্যের বই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই। সায়ীদ স্যারের এই জীবনব্যাপী কর্মের মূল্যায়ন আনুষ্ঠানিকভাবে হবে না হয়তো। কিন্তু আগত দিনের বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম ঠিকই বেড়ে উঠবে স্যারের স্বপ্ন-দর্শনে। এটা আনন্দের।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত *কণ্ঠস্বর*-এ লিখতে পারিনি। তখন সেই ষাটের দশকে তো আমার জন্মই হয়নি। তবে নতুন করে স্যার সম্পাদক হলেন, ২০০৭-এর দিকে, বের করলেন সাময়িকী *আবহমান*। আমি *আবহমান*-এ কবিতা লিখেছি। ষাটের দশকের *কণ্ঠস্বর* থেকে একুশ শতকের সূচনা দশকে এসে বের হওয়া *আবহমান*-এ আমি একটি চিঠি লিখেছিলাম সায়ীদ স্যারকে উদ্দেশ্য করে। পরবর্তী সংখ্যা *আবহমান*-এ দেখি আমার সেই চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। কবিতার মতো সেই চিঠিরও সম্মান পেয়েছি আমি। এ আমার ভালোলাগা।

এবার একটা কথা বলি। দু'চার পঙ্‌ক্তি কবিতা লিখি বটে, সিনেমা নির্মাণে জড়িয়ে আছি বটে, কিন্তু আমার পক্ষে কোনোভাবেই এদেশের কৃতিমানব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে প্রাপ্য মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। স্যারকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, স্যারও কাছে টেনে নিয়েছেন। এরকমই। আমার কবিতার বই *ঘামসূত্র* উৎসর্গ করেছি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে। স্যার র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাওয়ার পর এক রেস্টুরেন্টে কিছু মানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিমন্ত্রণ করে ব্যাপক খাওয়া-দাওয়া করালেন। আমিও আমন্ত্রিত হতে পেরে সৌভাগ্যবান মনে করেছি সেদিন নিজেকে।

রসপ্রিয় কিন্তু সাংগঠনিক, হাস্যপ্রিয় কিন্তু চরম দায়িত্ববান এই মানুষটির সান্নিধ্য পাই, পেয়ে এলাম— ভাবলেই ভালো লাগে। দেখা হলেই, কেমন যেন নিজের সন্তানের মতো করে কাছে টেনে নেন। বন্ধুত্বও দিতে পারেন বর্ষীয়ান এই তরুণ প্রাণ। মাঝে মাঝে ভাবি, এরকম একজন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ না থাকলে কী হত? আমি এটুকু বুঝি যে, অনেক মেধাবী কবি, কথাসাহিত্যিক, সিনেমাকর্মী, সাংবাদিক তৈরি হত না এদেশে। হয়তো হত, মানের হত না। সায়ীদ স্যার এক মান রচনা করে দিয়েছেন গোড়াতেই। সায়ীদ স্যার মানেই বই, অসংখ্য বই, মান রচনা করে দেয় সেই বই। বইয়ের প্রাণময় অক্ষরগুলো। এত যে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকি, এর জন্য দোষ যদি হয়, সে দোষের গুরু সায়ীদ স্যার। এই দোষে দোষ কী?

বহু বহুকাল পরে, ততদিনে আর স্যার বেঁচে থাকবেন না, বেঁচে থাকব না আমরাও, কিন্তু বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র থেকে যাচ্ছে। সেখানে বই থেকে যাচ্ছে। সারাদেশে অসংখ্য শাখা পর্যায়ের কার্যক্রম চলছে কেন্দ্রের। নতুন নতুন ছেলেমেয়েরা যুক্ত হয়ে পড়ছে কেন্দ্রের সঙ্গে, বইয়ের সঙ্গে, মানেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-আলোর সঙ্গে— অর্থাৎ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ থেকে যাবেন। তাঁর স্বপ্ন থেকে যাবে। স্বপ্নেরা ডানা মেলে উড়তে থাকবে। নতুন একটি ছেলে, সে হয়তো হয়ে উঠবে প্রতিভাবান এক কবি। নতুন একটি মেয়ে, সে হয়তো হয়ে যাবে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা। তর্ক-বিতর্কে, স্বপ্ন-চর্চায় বা আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বেঁচে থাকবার ইচ্ছার মধ্যেই সায়ীদ স্যারের উপস্থিতি থেকে যাচ্ছে, থেকে যাবে।

২০১৪

টোকন ঠাকুর : কবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম

তারুণ্যমত্ত জীবন

১

আজকের বিদ্বজ্জনসমাজে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তরুণ ও জনসাধারণের মধ্যেও তিনি বিখ্যাত। কাজেই নতুন করে তাঁর পরিচয় দেয়া নিষ্প্রয়োজন। ষাটের দশকের *কণ্ঠস্বর* পত্রিকার মধ্য দিয়ে তাঁর যে খ্যাতি, সেটা সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে ততটা নয়, যতটা সে পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে। *কণ্ঠস্বর*-এর মধ্য দিয়ে তিনি সে সময়ের সাহিত্য আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। একদল উদীয়মান তরুণ-তাজা-প্রাণ সাহিত্যপ্রেমিকের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি নিজের অজান্তে। কিন্তু তাঁর মননশক্তি সে নেতৃত্বেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তার ফলে সমান শক্তি তিনি দিতে পেরেছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রায় প্রথমপর্বের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনায় ও উপস্থাপনায়। পত্রিকার সম্পাদকতা ও এর লেখকগোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিল তাঁর অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ। বিটিভির দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দবিনোদনেও তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একদল সাহিত্যিক গড়ে তোলায় তাঁর যে ভূমিকা, সব অর্থে বুদ্ধদেব বসুর *কবিতা* পত্রিকার সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে হয়তো তার তুলনা চলতে পারে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এবং এর পরিচালনা তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি। পুরনো অনেক কিছুকে ছাড়িয়ে নয়, সে সবের যোগে আজ তাঁর পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে— তিনি এ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং এর প্রচারিত শ্লোগান : আলোকিত মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাই। এ প্রতিষ্ঠানের নাম অন্তত আজ সারাদেশের মানুষ জানে। এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সঙ্গে কারো মতের মিল হোক আর না হোক, আমাদের সমাজে এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে— এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই। এসবের ভিতর দিয়ে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সেটা এককথায় তারুণ্যের।

তারুণ্য ব্যাপারটাকে অনেকেই খামখেয়ালি অর্থে ব্যবহার করতে চান। কিন্তু তা ঠিক নয়। তারুণ্যকে বলা হয়েছে জীবনের অপরিমেয় সম্ভাবনা ও সার্থকতার প্রতীক। জীবনকে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলাই তার লক্ষ্য। জীবনে যিনি সম্ভাবনা দেখতে পান, আমাদের দেশের মনীষীরা তাঁকেই বলেছেন দ্রষ্টা। কাজেই তারুণ্য ব্যাপারটাকে নিছক খামখেয়ালি মনে করা খেয়ালখুশি মাত্র।

২

বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে যে মানুষ জীবনের প্রতি আস্থাশীল ও স্থিতধী, বেদান্তে তাঁকেই বলা হয়েছে 'অভয়চিত্ত'। আমরা প্রায়শ 'অভয়' হয়ে উঠতে পারি না তার কারণ আমরা বর্তমানটাকেই বৃহৎ করে দেখি। আর প্রত্যেক কালে প্রত্যেক মানুষের কাছে তার বর্তমানটাই বিভীষিকাপূর্ণ, বিধ্বস্ত ও ভগ্নদশা বলে মনে হয়। এজন্য দেখা যায়, মানুষ তার মহত্তম জীবনের কথা ভুলে কেবলি হাহাকার, হতাশা আর আর্তনাদে, হাতে পাওয়া বর্তমানের জীবনটাকে আকীর্ণ করে তোলে।

আজকে আমরা চোখ মেলে যে বাংলাদেশ দেখতে পাই তার অবস্থা উল্লিখিত ধারণা থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু আজকের উদ্যমহীন, আশাহত সমাজই তো চিরকালের সমাজ নয়! এ যদি মানুষে চরম বলে বিশ্বাস করে, তবে আধুনিক মানুষ তাকেই বলবে যথার্থ নাস্তিক। আজ নানা দিক থেকে আমাদের জাতীয় জীবনে সঙ্কট ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। তাকে প্রতিহত করা যায় কীভাবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে তাই ভেবে দেখা জরুরি। এজন্য সমাজে যথার্থ মানুষ দরকার। এ মানুষ দশজনের মধ্যে একজন নয়— এগারোজন। 'এগারোজন' মানে একজন নয়। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এমন মানুষকেই বলেন 'পাগল মানুষ'। এই মানুষের স্বরূপ কী? তার মানসপ্রকৃতি যে একান্তভাবে উদরসর্বস্ব নয়, সেটা বুঝতে মোটেও দেরি হয় না। কিন্তু সেই 'পাগল মানুষ'-এর স্বরূপ জানতে আমাদের আগ্রহ হয়।

আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর *পান্থজনের সখা* বইয়ে ফ্রান্সিস হার্বার্ট ব্রাডলির একটি সুন্দর কথা উদ্ধৃত করেছেন। সেটা এই যে, "মানুষ মানুষই নয় যদি সে সামাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না হয়, তবে সে পশুর চেয়ে খুব একটা ঊর্ধ্বে ওঠে না যদি সামাজিকের চেয়ে বেশি-কিছু না হয়।" এ কথায় বোঝা যায়, মানুষের প্রকৃতি কেবল সামাজিক নয়— তার চেয়েও বড়। তারুণ্য সেই বড় সম্ভাবনাকে স্পর্শ করতে চায়, মানবপ্রকৃতিকে সে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখতে চায়। ব্যাপারটা দার্শনিকের সমস্যা হতে পারে কিন্তু সাধারণের কৌতূহলও অমূলক নয়। তাই মানুষ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলী হওয়া স্বাভাবিক। কেননা দেহের ভিতর আমরা প্রত্যেকেই জীবন ধারণ করি।

৩

বিজ্ঞানে দর্শনে মানুষকে যেভাবেই দেখা হোক, মানুষের আসল পরিচয় তার কর্মে। এ কর্ম জ্ঞানহীন নয়। অসংখ্য মানুষকে আমরা প্রতিদিন দেখি। হাটে-বাজারে, অফিসে-আদালতে, নানারকম সভা-সমিতিতে, চলতি পথে— এমনি সংখ্যাহীন কর্মস্থলে। তাতে মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাই কি তার যথার্থ পরিচয়? আমরা প্রতিদিন যে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা করি, নানা কাজে, নানা কর্মক্ষেত্রে, তাতে মানুষের যে পরিচয়— কিঞ্চিৎ হাসি-তামাশা কিংবা মান-অভিমান, এটা যেন সামাজিক মানুষের কতকগুলো বিধিবদ্ধ সৌজন্যমূলক পরিচয়মাত্র। এতে মানুষের আসল পরিচয় নেই। কিন্তু এই মানুষই যখন ঘরে ফিরে বউকে পেটায়, ঝি-কে মারে এবং অপর মানুষকে খুন করার জন্য পরিকল্পনা করে, পররাজ্য লুটের জন্য নকশা আঁকে; আবার নির্জনে বসে এ মানুষই যখন জ্ঞানের সাধনা করে, মানুষের কল্যাণের জন্য তুচ্ছ স্বার্থ পরিত্যাগ করে— তখন এসবের ভিতর দিয়েই তার সত্যকার পরিচয় মেলে। আরও সংবেদনশীল হৃদয় ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে মানুষের ইতিহাস ও তার সুখ-দুঃখে ভরা আশা-নিরাশা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, মানুষ যেন এখানে এক-একটা নাটকে অভিনয় করে চলেছে, যার খানিকটা ঘটছে পর্দার সামনে, অনেকটাই তার আড়ালে। কিন্তু ট্র্যাজেডি ও কমেডির মতো বাস্তব জীবনে এ দৃশ্য যেমন মনোগ্রাহী তেমনি ইঙ্গিতময়। এ জন্যই হয়তো ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছেন, মানুষের মতো আশ্চর্য প্রাণী দুনিয়ায় আর কিছু নেই; এ মানুষ যেমন জটিল তেমনি রহস্যময়!

বাংলাভাষার আদি লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত বলেছেন মানুষের সত্তায় 'দ্বৈধ' আছে। একদিকে সে যেমন 'পিশাচ', অন্যদিকে সে তেমনি 'দেবতুল্য'। এই দ্বৈতসত্তার মানুষকে নিয়েই আমাদের সমাজ। এ সমাজ তাই জটিল। একে কোনও একটা ছাপমারা তত্ত্ব দিয়ে বেশিদিন চালানো যায় না। কাজেই নতুন চিন্তা দরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। নতুন চিন্তা পুরাতন হয়, আবার পুরাতন চিন্তা নতুন হয়। সত্যকে তাই বারবার হারিয়ে নতুন করে ফিরে পেতে হয়। মানুষের জীবন এমনি করে পুরাতনের ভিতর দিয়ে নতুন হয়। এভাবে মানুষ বারবার নিজেকে অতিক্রম করে।

প্রেম ও হিংসা মানুষের মৌল সত্তায় বিরাজমান। মানুষকে তাই বলা অন্যায় যে, সে খারাপ; বলা চলে না যে, সে ভালো। মানুষ যেখানে ভালো কাজ করে, সেখানে সে মহৎ। সে কাজের যে গৌরব তার ভাগীদার সকলেই। কিন্তু যেখানে সে নিন্দনীয়— সেখানে সে স্বতন্ত্র। এজন্য মানুষকে হতে হয় বিচারশীল ও যুক্তিপরায়ণ। কেননা মানুষের সত্য পরিচয় এরই ভিতর দিয়ে পাওয়া যায়। বিচারশীল ও যুক্তিপরায়ণ মানুষ প্রত্যেক সমাজেই কম। কেননা এ মানুষ সমাজের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত নয়। অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত মানুষই প্রকৃত মানুষ। প্রচলিত সমাজের সঙ্গে এই মানুষের বিরোধ অনিবার্য। কেননা অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষকে সমাজ ভয় পায়। সমাজের মঙ্গলবোধের সঙ্গে তার মঙ্গলবোধ মেলে না। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন— এটা সাধারণত সমাজ চায়নি। কেননা সেখানে চাওয়াটা নতুন অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত। এখানে দ্বন্দ্বটা পুরাতনের সঙ্গে নতুনের, অর্থাৎ তারুণ্যের। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের জীবনে ও কর্মে এই তারুণ্যের একটা চমৎকার সম্মিলন আমাদের চোখে পড়ে। তিনি নিজেকে বলেছেন 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক'। কিন্তু সেটা নেতিবাচক নয়— ইতিবাচক অর্থে। এখানে তাঁর বিনয়টা খুব সূক্ষ্মভাবে স্বপ্রকাশ। তারুণ্য এই বিনয়ের মূলে। কথাটার একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

'বিনয়'কে আজকাল লোকে ভুল অর্থে ব্যবহার করে। লোকে বিনয় বলতে বোঝে দুর্বলতা। কিন্তু দুর্বলতা আসে বিনয় থেকে নয়— ভয় থেকে। এই ভয়ের সঙ্গে বিনয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। চাণক্য ছিলেন অর্থশাস্ত্রী ও রাজনীতিবিদ। তাঁর বাণীকে 'হিন্দু-শাস্ত্র' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ-শাস্ত্রে বিনয়কে বলা হয়েছে বিদ্যার ভূষণ। এই বিনয়ের সঙ্গে আমাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার বিরোধ নেই। যাদের চরিত্রে চাটুকারিতা ও স্তাবকতা সমানভাবে বিরাজ করে এবং তার ভারে যারা সর্বত্র মাথা নত করে, তাদের বিনয়ী বলা যায় না। সত্যের সঙ্গে বিনয়ের যোগ প্রত্যক্ষ কিন্তু চাটুকারিতা ভিন্ন জিনিস।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বিদ্যাসাগর নন। তাই তিনি বলেন না যে— 'এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাতপুরু মাটি তুলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এদেশ ভালো হয়।' তিনি রবীন্দ্রনাথ নন। তাই বলেন না যে— 'সাতকোটি

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালিরে হে মুগ্ধ জননী/রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করো নি।' কিন্তু তিনিও শিক্ষক ছিলেন। দীর্ঘদিন ছাত্র পড়িয়েছেন। কিছুসংখ্যক তরুণকে সাহিত্যসৃষ্টির পথে উজ্জীবিত করেছেন। তারপর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বানিয়ে আরও কিছুসংখ্যক তরুণকে নিয়ে মানুষ ও তার সমাজ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। এরপরও তিনি যা দেখছেন, সেটা তাঁর আশার অনুরূপ নয়। তাই তাঁর শিক্ষিত মনের অভিব্যক্তি 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক' হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি ভেবে নিয়েছেন, দেশের মানুষের মর্মমূলে আজ যে বেদনা এ যেন তাঁর নিজেরই কর্মফল! স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন মানুষের বেদনা এভাবে নিজেকেই আঘাত করে। এমন মানুষই আত্মদহনে পোড়েন! কারণ একান্ত আপন দুঃখ হয়তো এঁরা সহ্য করতে পারেন কিন্তু বৃহত্তর দুঃখ কিছুতেই সইতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ এই বৃহত্তর দুঃখের নাম দিয়েছেন 'অপার বেদনা'। তিনি বলেছেন এই অপার বেদনাই অলৌকিক আনন্দ হয়ে বেরিয়ে আসে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের জীবনে ও কর্মকাণ্ডে এই বেদনার প্রকাশ দেখা যায়। এবং সেটা তাঁর ভিতর থেকে বিনয়ের রূপ নিয়ে বেরিয়েছে। এখানেই তাঁর বিনয়টা ইতিবাচক।

৪

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর। এর একটা লক্ষ্য ছিল। পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলে নয়— তাকে যথাসম্ভব অতিক্রম করে কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ মানুষের একটি সমাজ গড়ে তুলবে বাংলাদেশ। তারই সঙ্গে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রও একটা ভূমিকা রাখবে। দেশের সঙ্গে আলাদা হয়ে নয়— যুক্ত হয়ে। কিন্তু আজকের যে বাংলাদেশকে আমরা দেখতে পাই, তার চেহারা তার মূল উদ্দেশ্য থেকে পৃথক! বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। এখানেই সে আলাদা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র দেশের সঙ্গে আছে কিন্তু দেশ বলা চলে তার সঙ্গে নেই। এ কথা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের হয়ে দেশের প্রতি অবজ্ঞা নয়। বরঞ্চ দেশ যথেষ্ট অবজ্ঞাহীন নয় বলে তার জন্য আমাদের দুঃখ হয়। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এ দেশকে তাই 'নিষ্ফলা মাঠ' বলে অভিহিত করেছেন!

পরাধীন জাতির ধর্মটাই প্রধান শক্তি। আর গণতন্ত্র বলতেও সে বোঝে পণ্যের ন্যায় মানুষের পরিমাণ অর্থাৎ বাক্‌সে ভোট কত পড়ে, কেবল তাই দিয়ে তার বিচার! এমন গণতন্ত্রে মানুষের মূল্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর না হয়ে উপায় নেই। মানুষের চিন্তা ও তার কর্মকাণ্ডের অভাবিত সম্ভাবনাকে এরকম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পণ্য হিসেবে দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

বলে, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফূরণ এখানে হতে পারে না। এমন রাষ্ট্রে তাই ধর্মের অপব্যবহার স্বাভাবিক। সুস্থ বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐশ্বর্য এমন রাষ্ট্রে উপেক্ষিত। অথচ জ্ঞানকে বলা হয়েছে শক্তি। জ্ঞান যে শক্তি— তার কারণ জ্ঞানে মানুষ কেবল বাইরের জগৎকেই জানে না, নিজেকেও জানে। সেজন্য জ্ঞান ছাড়া আত্মোপলব্ধি নেই। আত্মোপলব্ধি ব্যতীত মানুষ স্বাধীন হতেই পারে না। তাই বিদ্যাবন্ত মানুষ জীবন্ত। এর থেকে মুক্ত মানুষই ধার্মিক। এই বাস্তব অবস্থাটা মোতাহের হোসেন চৌধুরী একটি অতুলনীয় বাক্যে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সে অবিস্মরণীয় কথাটা এই : 'ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম।'

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকালে কোথাও বলেননি যে, তিনি জনসাধারণের ধর্মটা উচ্ছেদ করতে চান। কিন্তু দেশের লোক শিক্ষিত ও মার্জিত হয়ে উঠুক এবং প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠুক— এটা তাঁর একান্ত কামনা। তাঁর চিন্তা ও কর্মে সেটা প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি এক লেখায় বলেছিলেন—

"আমরা যে যুগের অধিবাসী হবার দূরদৃষ্ট লাভ করেছি, রুচির বিচারে সে যুগ আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে দুশ্চরিত্র সন্তান। আমাদের সংস্কৃতির এ এমন একটা সময় যখন কাল ও পরিপার্শ্ব অভাবিত দুর্ঘটনায় আত্মাহীন, শরীর ব্যভিচারী, বোধ অকর্ষিত ও রুচি গর্হিত। ...

সবচেয়ে খেদের কথা, রুচি নেই এ যুগের। মানতেই হবে— নেই। নিজের প্রতি জন্মান্ধ বিশ্বাসে শতচ্ছিন্ন কোনও রক্তাক্ত নায়ক এ যুগে আমরা দেখছি না। গাছের মতো মহান ব্যক্তিত্ব নিয়ে কেউ দাঁড়াতে পারছে না। দাঁড়াতে পারছে না সেই রুচির উদ্ভাস, কিংবা সেই সর্বজনীন উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ, যেখান থেকে বৈদগ্ধ্যের উন্নতমান বিচ্ছুরিত হতে পারে জানালায় জানালায়। সংশয় এবং নৈরাশ্য, নিঃস্বতা ও ক্ষয় অধিকার করে ফেলেছে আমাদের যুগের মহত্তম হৃদয়। স্বকীয় আত্মশক্তির অধর্ষ বিশ্বাসে কোনও গভীর আরণ্যক লিখিত হতে পারছে না।"

এ কথাগুলো লিখেছিলেন তিনি আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগে। কথাগুলোর মূলভাব একেবারে তাজা। আমাদের সামাজিক অবস্থার মাত্রাগত কিছু হেরফের হলেও মানুষের গুণগত তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। সেজন্য বক্তব্যটি নতুনত্ব হারায়নি। এ প্রসঙ্গে দুঃখের কথা হচ্ছে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে যে অমিত শক্তির প্রকাশ হতে পারত তাঁর হাত দিয়ে, বাংলাসাহিত্য মনে হয় তা থেকে অনেকটা বঞ্চিত হয়েছে। তবুও তাঁর বেশকিছু মূল্যবান গ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে— যেগুলো তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও মননের কর্ষিত ফসল।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের পরিচয় তার সৃষ্টিতে। কোন্ মানুষ কত বড় সেটা জানা যাবে স্রষ্টা হিসেবে তিনি কত বড়, অর্থাৎ সৃষ্টির ভিতর দিয়ে তিনি নিজেকে কতখানি প্রকাশ করতে পেরেছেন, তাতেই তাঁর মনুষ্যত্বের পরিচয়। এই সৃষ্টি মানে— মানুষের মননের প্রকাশ, আনন্দ ও প্রেমের প্রকাশ। এ প্রকাশে সৃষ্টির আর সব প্রজাতি থেকে সে আলাদা। মানুষ যখন বুঝতে শেখে কোথায় সে মহৎ আর কোথায় সে ক্ষুদ্র, তখন এ বোধ তাকে মানুষ করে। আর এ বোধহীনতা তাকে সৃষ্টির অন্যান্য জীবের সঙ্গে সমান করে রাখে। মানুষ যা সহজে পায় সেখানে তার কোনও কৃতিত্ব নেই কিন্তু যা সে সাধনায় অর্জন করে, সেখানে সে প্রকৃতির থেকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ সে মানুষ। মানুষ যখন তার সৃষ্টির ভিতর দিয়ে নিজের সত্য পরিচয় পায় তখন তার যে আনন্দ, সেটা তার আপনাকে দেখার আনন্দ। কিন্তু এ আনন্দ তার একার নয়। একার আনন্দ, আনন্দই নয়— বন্ধন। লটারির কোটি টাকা পাওয়ার যে আনন্দ, সেটা কি তার সৃষ্টির আনন্দ? এ টাকা তাকে মুক্তি দেবে না, বেঁধে রাখবে। কেননা এ টাকার সঙ্গে যে সুখ আসবে, সে সুখ দুঃখকেও টেনে আনবে। এটা স্বস্তি ও শান্তি কিছুই দেবে না। রবীন্দ্রনাথ যাকে সৃষ্টি বলেছেন সেটা আলাদা জাতের জিনিস। বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করা যাক।

মানুষ যা খুশি তাই বানাতে পারে না। সে বানানোর মূলে কোনও একটা সর্বগ্রাহ্য সত্য থাকা চাই। এ না হলে সৃষ্টিটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ সৃষ্টি না ব্যক্তিমানুষকে, না সমাজকে তাঁর দিকে টানতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন সুচিন্তিতভাবে বুদ্ধি ও কল্পনা দিয়ে একটা বিশ্বজনীন সত্য মূর্তি বানায়— যেখানে সকল মানুষের অংশগ্রহণ বাধাহীন হয়, সেখানে সকল মানুষের আনন্দ। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন— এটা তাঁর একার আনন্দের জন্যে নয়। বৃহতের সঙ্গে নিজের সত্যপরিচয়কে মেলাবার জন্যেই এই সৃষ্টি। ঠিক যেমন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির ভিতর দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্যস্রষ্টা মানুষটি নিজেকে মেলাতে চান, এ-ও তেমনি। এমন চাওয়ার মধ্যে যে বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা দরকার— আমাদের সমাজে এ মানুষ নিতান্তই কম। সৃষ্টির সত্যটাকে স্থূলভাবে ধরলেও বলতে হয়, এ সৃষ্টি কেবল বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস রচনার ব্যাপার নয়, কেবল সুকুমার বিদ্যাও নয়, এটা মানুষের সহজ জ্ঞানের প্রকাশও বটে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্কের মধ্যেও এ সৃষ্টির যথার্থ রূপ পেতে পারে। কিন্তু এ-ও কিঞ্চিৎ শিক্ষা ও পারিবারিক ঐতিহ্যসাপেক্ষ। এই মানুষ যে সমাজে যত বেশি— শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন— সেই সমাজই তত বড়, তত সমৃদ্ধ এবং উন্নত। শিবনাথ শাস্ত্রীর কথাটা

এই : 'চরিত্রবান মানুষই একটা জাতির প্রধান সম্পত্তি। কোন্ দেশে কত ধন-ধান্য আছে, তাহা দিয়া সে দেশের মহত্ত্বের বিচার নহে, কিন্তু সে দেশ কত চরিত্রবান, গুণী, জ্ঞানী মানুষকে জন্ম দিয়াছে, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতিতে কত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সদানুষ্ঠানে কত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, এই সকলের দ্বারাই মহত্ত্বের বিচার।' মানুষের 'মহত্ত্ব' কিংবা তার 'পশুত্ব' বিষয়ে আমরা যদি কৌতূহলী হতাম, তবে আমাদের সমাজে মানুষ যে আজ অবহেলার বস্তু হয়ে উঠেছে, তা হয়তো হতে পারত না। সেজন্য কিসে মানুষের গুরুত্ব আর কোথায় সে কেবল জড়পিণ্ড মাত্র— এ বিষয়ে সম্যক আলোচনা দরকার।

দুঃখের বিষয়, যে মানুষ যে কাজের যোগ্য আমাদের সমাজ তাকে সে কাজ করতে দেয় না। এ কথার প্রমাণ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নিজেই। তাঁকে আমরা নানা অনুষ্ঠানে অর্থাৎ বিয়েবাড়ির আড্ডা থেকে সাহিত্য-সংগীতের মতো সুকুমার শিল্পের আলোচনায় সভাপতি বা প্রধান অতিথি হিসেবেও দেখি। এটা আমাদের সমাজের বাস্তব অবস্থা। এ অবস্থার শিকার তিনি। তা না হলে বিয়ের মজলিশেও তাঁকে বিস্তর সময় ক্ষয় করতে হত না!

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে আমরা অনেকেই দেখিনি কিন্তু লোকমুখে শোনা যায়, বিয়ে পড়ানো থেকে শুরু করে তিনি তাঁর সমাজের মিলাদ মাহফিলেও যোগ দিতেন নিয়মিত। সামাজিক মানুষ হিসেবে এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু দেখা যায়, আমাদের সমাজ গুরুত্বপূর্ণ মানুষকেও সামাজিকতায় অভিভূত করে রাখে। এ ব্যাপারে তোষামোদ একটা বড় ভূমিকা পালন করে। অতিবড় কঠিন মানুষও এই তোষামোদকে ভয় পায়। কেননা জিনিসটা মূলে তৈলাক্ত। তাই পিছলে পড়ার আগেই তিনি তাতে ধরা দেন। এ না হলে তাঁর রক্ষা নেই। তোষামোদের শক্তি কম, কিন্তু পৃথিবীতে সে স্থায়ী পদার্থ। কারণ জৈবপ্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে তার বাস। আর এ মানুষ সমাজে চিরকালই অধিক।

৬

বাংলাদেশের প্রায় সূচনা থেকে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের চোখে মানুষের মহত্তম আদর্শের স্বপ্ন সাকার হয়ে উঠেছিল। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মাধ্যমে তিনি যে জাতির নির্মাণে অংশ নিতে চেয়েছিলেন সে জাতি অবশ্যই বৃদ্ধ, অথর্ব, উদ্যমহীন, শ্রমবিমুখ ও আলস্যবিলাসী নয়; যে জাতি তারুণ্য আর উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা মনে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠবে, সে জাতির স্বপ্ন তাঁর ভিতরে সপ্রাণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেজন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রায় সমস্ত কার্যক্রম ও কর্মসূচি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও সর্বস্তরের তরুণদের উদ্দেশে গঠিত ও রচিত।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মাধ্যমে যে কাজটি করছেন ঘটনাক্রমে সেটা বিমূর্ত। সেজন্য চট্ করে কাউকে বোঝানো শক্ত যে, দেশের জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। দেশের ভিতর ব্যাঙের ছাতার মতো নানারকম এনজিও গড়ে উঠেছে। সে সবের ভালো-মন্দ তাৎক্ষণিকভাবে লোকে বুঝতে পারে। কেননা সেগুলোর দান ও গ্রহণ প্রত্যক্ষ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যে কাজ করছে তা সমাজের গুণগত পরিবর্তনের প্রয়াস থেকে। সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম যাঁদের জানা, কেবল তাঁর পক্ষেই অনুভব করা সহজ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ভূমিকা কোথায় গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা মানুষের কেবল মাত্রাগত পরিবর্তন আনে না— গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। এজন্য শিক্ষার ব্যাপারে সর্বকালের, সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এত আগ্রহ। মানুষকে মানসিক ও শারীরিকভাবে গড়ে তোলায় আমাদের শিক্ষা যথেষ্ট সার্থকতার স্বাক্ষর রাখেনি। স্বাধীনতার পরকালে দেশের ক্রমপরিণতি মানুষের কাছে যে উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে, তার মূলে দেশের অধিকাংশ মানুষ আজও কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ জনশক্তিতে পরিণত হয়নি। দেশের মানুষ যেভাবে বেড়েছে ঠিক একইভাবে আমের মুকুলের মতো ঝরে পড়ছে। মানুষ আমের মুকুল নয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে তার ঝরে পড়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা দেখে চিন্তাশীল মানুষেরা তাই মনে করছেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র তরুণদের মধ্যে শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমাজের একটা গুণগত পরিবর্তন চায়। এই আশা রক্ষা করেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তরুণদের নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

২০০৪

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম : সহ-পরিচালক, গবেষণা উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি

গোলাম মোর্তোজা

স্বপ্নের নির্মাতা

১

স্মৃতিচারণমূলক লেখা পড়তে ভালো লাগে। নিজে লিখতে ইচ্ছে করে না। স্যারকে নিয়ে লিখতে গেলে, পেছনে না ফিরে উপায়ও নেই। বাইশ-তেইশ বছর আগে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আঙ্গিনায় ঘোরাঘুরি করতাম! ভাবতেই ভয় লাগে, ওরে বাবা কত আগে!!

লাল ইটের নান্দনিক ছোট্ট বিল্ডিং, সামনে বহু পুরনো ড্যাম্প-ধরা আরেকটি বিল্ডিং, তার সামনে সবুজ লন। কাঠমালতি, কাঁঠালচাঁপা, করমচা...।

জীবনজীবিকার চিন্তাহীন কৈশোরের সেই মোহমুগ্ধকর সৌন্দর্য-পিপাসা ...। শিহরণ-জাগানো অনুভূতি। কেন্দ্রের ছাদের সেই নিরবচ্ছিন্ন আড্ডা। বই তো মূল আকর্ষণ বটেই। ড্যাম্প-ধরা বিল্ডিংয়েরই আরেক আকর্ষণ, সমৃদ্ধ মিউজিক লাইব্রেরি। ঢাকা শহরে বইয়ের লাইব্রেরি অনেক ছিল, আছে। কিন্তু এমন সমৃদ্ধ মিউজিক লাইব্রেরি আমি আর কোথাও দেখিনি। ভালো গান শোনার একটা অভ্যেস যে তৈরি হয়েছে, সেটা এই মিউজিক লাইব্রেরির কারণে। সুমনের সেই বিখ্যাত *তোমাকে চাই* গানটি আমরা শুনেছিলাম সুমনের ক্যাসেট প্রকাশের আগে। ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছিল '৯২ সালে। আমরা শুনেছিলাম সম্ভবত '৯০ বা '৯১ সালে। আশ্চর্য হলেও এটা সত্যি!

এইচএমভি থেকে ক্যাসেট প্রকাশের আগে, সুমন অনেকটা ঘরোয়াভাবে *তোমাকে চাই*সহ আরও অনেক গান রেকর্ড করেছিলেন। সেই ক্যাসেট সুমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়েছিলেন ডয়চে ভেলেতে একসঙ্গে কাজ করা তাঁর এক বন্ধুকে। সেই বন্ধু দিয়েছিলেন সায়ীদ স্যারকে। ক্যাসেটের ইতিহাসটা সম্ভবত এরকমই।

২

ঢাকা কলেজ। এক সময়ের স্বপ্নের কলেজ। আয়তনে বিশাল। মেধার বিশালত্ব আরও বড়। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। বাসে করে এসে হাঁটতে হাঁটতে কলেজের ভেতরে ঢুকছেন।

তখন হয়তো পুরোটা ভেবে উঠতে পারিনি, এখন অনুভূত হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যগুলোর একটি। যা আমরা দেখেছি।

টেলিভিশনে দেখা বহুদূরের মানুষ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তিনি শিক্ষক, ঢাকা কলেজের শিক্ষক— এটা জানতাম। তাঁকে সামনে থেকে দেখব, সালাম দিয়ে কথা বলার সুযোগ হবে, প্রায় কল্পনার বিষয়। কল্পনারও অতীত তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে মোহনীয় ভঙ্গিতে কথা বলে যাবেন।

এসব অপূর্ব, অবিশ্বাস্য ঘটনার স্পর্শ পেলাম ঢাকা কলেজে। সেই ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রে আসা। বইপড়া, গান শোনা, কাজ করা, স্যারের সান্নিধ্য, আরও অনেক অনেক গুণী মানুষের কথা শোনা, সান্নিধ্য পাওয়া, কারণ এই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

ঋণ, কৃতজ্ঞতা এসবের কোনোকিছুই অনুভব করি না। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আমাদের 'নিজস্ব'।

নিজের কাছে নিজের কৃতজ্ঞতা বা ঋণের কিছু নেই।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের স্বপ্ন। বাংলাদেশকে যারা সুখী-সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলবেন, সেই সম্পন্ন মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান।

অনেকে এসেছেন, অনেকে চলে গেছেন। কারও স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, কারও স্বপ্ন বেগবান হয়েছে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ রয়ে গেছেন দৃঢ় অবিচল। সময়ের চেয়েও দ্রুতগতিতে যিনি স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন নির্মাণ করেন। আমরা স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় ভেঙে দুমড়ে-মুচড়ে পড়ি। পেছন ফিরে হাহাকার করি। পুরনো স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকি।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের গতি ক্ষিপ্র। বিশাল স্বপ্নের অগণিত শাখা-প্রশাখা।

পেছনে নয়, তিনি দেখেন সামনে। জীবনের মানে শুধু এগিয়ে যাওয়া, শুধুই সামনে এগিয়ে যাওয়া ...।

গড়পড়তা মানুষেরা তাঁর সঙ্গে তাল মেলাতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের রক্ত-শ্রম-ঘামে গড়া লাল ইট আঁকড়ে থাকতে চাই। এক জায়গায় আটকে থাকতে চাই।

অতীত নিয়ে হাহাকার করি।

স্বপ্নদ্রষ্টা ইটের পর ইট... ভাঙা-গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আগামীর স্বপ্ন নিয়ে, বিশালত্বের দিকে ধাবমান।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেন।

২০১৪

গোলাম মোর্তোজা : সাংবাদিক; সম্পাদক, সাপ্তাহিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান

একলব্যের নোটবুক

'একজন আদর্শ গুরু তিনিই, যাঁর কাছে একজন নবীন শিষ্য এসে মনে করে, এই গুরুকে ছাড়া আমি এক পা-ও চলতে পারব না। আর যখন তার শিক্ষা শেষ হয় তখন শিষ্যের মনে হয়, এই গুরু সঙ্গে না থাকলেও আমি পথ চলতে পারব।'

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত এই সংজ্ঞাটির মাধ্যমে একজন গুরু বা শিক্ষকের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে শিষ্যকে তৈরি করার যে মানসিকতা তা যে ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের এই অঞ্চলে প্রবাহিত হয়ে আসছে সে কথাটি অসাধারণভাবে বোঝাতেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। শিক্ষক, সংগঠক, লেখক, উপস্থাপক, সম্পাদক, সাহিত্য সমালোচক, নিষ্ঠাবান পাঠক, পরিবেশকর্মী— নানা পরিচয় থাকলেও সবার আগে একজন শিক্ষক হিসেবেই তিনি আমাদের মতো অনেকের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছেন। এ কারণে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পর্যন্ত অনেক শিক্ষকের সংস্পর্শে এলেও শুধু 'স্যার' বলতে এখনো একজনকেই বুঝি। তিনি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

২

একটুকরো কাগজ কখনো কখনো জীবনের ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে। কলেজ জীবনের শুরুতে সমাজ বদলের জন্য ছাত্র রাজনীতিতে অংশ নেয়া কিংবা সাংস্কৃতিক সংগঠনে যোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে অনেক লিফলেট হাতে এসেছে। এসব লিফলেট যেভাবে এসেছে সেভাবেই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু হলুদ রঙের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ছোট লিফলেট কেমন করে যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল। সেটি যেখানে টেনে নিয়ে এল, দেখলাম আমার মতো অনেকেই এই 'হলুদ নিমন্ত্রণে' সাড়া দিয়ে হাজির হয়েছে বাংলামটরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে।

এটি ছিল কলেজ কর্মসূচির সপ্তম ব্যাচ। পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল। আমি ছিলাম 'ক' গ্রুপে। ক্রমিক নম্বর ১১৪। প্রায় নয় বছরের সামরিক শাসনের পতনের পর পুরো দেশেই তখন বইছে ভিন্ন হাওয়া। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারকে কেন্দ্র করে একদল উজ্জ্বল শিক্ষার্থীর পেছনে নিষ্প্রভ উপস্থিতি নিয়ে বসে থাকি। একজন নীরব শ্রোতা হিসেবে পেছনের সারিতে বসে সমসাময়িকদের মেধা অনুভব এবং বক্তব্য শুনে একইসঙ্গে বিস্মিত এবং চমকিত হতে হতে পরীক্ষার সময় এসে হাজির হয়ে গেল! মাঝখানে শুধু একদিন ক্লাসের আলোচনায় 'অংশগ্রহণ', সেটাও বাধ্য হয়ে। পঠিত বইয়ের মধ্য থেকে ভালোলাগা অংশ পড়ে শোনাতে হবে। সেদিন আলোচনা ছিল কৃষণ চন্দরের *গাদ্দার* বইটি নিয়ে। এমনিতেই ছোট বই। তারপর আবার পছন্দের লাইনগুলো অন্যরা পড়ে শুনিয়েছে। আর যে কথাগুলো বলব বলে ভাবছিলাম তা-ও অন্যরা বলে ফেলেছে। বহু গবেষণা করে ছোট একটি লাইন পড়া শুরু করলাম, 'এই সেই হাত ...'

কথা শেষ করতে পারিনি, এরই মধ্যে শুনতে পেলাম ব্যঘ্রগর্জন— 'এই সেই হাত মানে কী... এটা কার হাত? এটা কি তোমার হাত? ..এতে কেউ কিছু বুঝবে?'

হাত থেকে খাতা খসে পড়ে যায় আর কী!

৩

কলেজ কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্ব প্রাক-মৌলিকে সব ব্যাচ মিলে একটি ব্যাচ হল। শুরুতেই স্যার জানিয়ে দিলেন, আমাদের বই পড়ার পর্যায় শুরু হল মাত্র। প্রাক-মৌলিক পর্যায় থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা, কেন্দ্রের কাজে যুক্ত হওয়ার কাজগুলো শিক্ষার্থীরা শুরু করে। এইচএসসির দ্বিতীয় বর্ষের সময়টি যেন হুট করেই শেষ হয়ে যায়। পরীক্ষা-পরবর্তী সময়ে কিছুদিন সময় দিলেও বুয়েট, মেডিক্যাল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা এবং ক্লাস শুরু হলে ধীরে ধীরে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কমতে থাকে। এই পর্যায়ে শুরু হত মৌলিক উৎকর্ষ কার্যক্রম। সাধারণত এর মেয়াদ তিন থেকে ছয় মাস হত। কেননা এরপর ব্যাচগুলোতে আর শিক্ষার্থীরা থাকত না। আমাদের ব্যাচেরও একই অবস্থা হত।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু মূলত সহপাঠী নাহিদ আহসানের উদ্যোগের কারণে আমাদের ব্যাচটি টিকে যায়। বিস্ময়করভাবে আমাদের মৌলিক কার্যক্রম চলে প্রায় আঠারো মাস। পাঁচশ শিক্ষার্থী দিয়ে শুরু হওয়া আমাদের ব্যাচের শেষ দিনে উপস্থিত ছিলাম সাতজন। আমাদের ব্যাচের আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'অধীয়ান'। অবশ্য কেউ কেউ মজা করে ডাকত 'বিচ্ছিন্ন ব্যাচ'।

মৌলিক উৎকর্ষে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি যে বইটি পড়ানো হল তা হচ্ছে জওহরলাল নেহরু-র লেখা *বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ*। বইটি পড়ানোর সময় স্যার প্রতিটি চ্যাপ্টার থেকে পড়া ধরতে লাগলেন। ফলে অল্প সময়ে ক্লাসের উপস্থিতি অর্ধেক এবং একপর্যায়ে আরো কমে গেল। একদম শুরু থেকেই ক্লাসে অংশগ্রহণের বিষয়ে মহাভারতের চরিত্র অর্জুনের চেয়ে একলব্য অনেক বেশি অনুসরণীয় ছিল। একলব্য স্টাইলে 'দূরশিক্ষণ' পদ্ধতিতে আমরা যারা পেছনে বসে কেবল 'শ্রবণ কর্মসূচি' পালন করছিলাম তাদের জন্য মহাবিপদ উপস্থিত হল। প্রতি ক্লাসে স্যার গড়ে ছয়-সাত জনকে পড়া ধরতেন। আমরা নির্দিষ্ট যে দুই-তিনজন পেছনে বসে থাকি বিষয়টি স্যারের নজর এড়ায়নি। তিনি পেছন থেকে পড়া ধরতে লাগলেন। এবার পেছনে এবং সামনে থেকে ছয়-সাতজন বাদ দিয়ে মাঝে বসতে লাগলাম। যেন যেদিক থেকে শুরু হোক না কেন, আমরা তার ভেতর না পড়ি! কিন্তু একদিন স্যার সরাসরি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এই তুমি সামনে আসো।'

তিনি তাঁর ঠিক সামনের চেয়ারে আমাকে বসিয়ে এমন একটি মুচকি হাসি দিলেন যে আমার আত্মা মোটামুটি ঠাণ্ডা হয়ে গেল! বললেন, 'তুমি নাকি লেখক? দেখি তুমি কী পড়েছ।'

স্যার যে প্রশ্নগুলো করলেন সবগুলো উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁর সামনে অবলীলায় সব ভুলে গেলাম। একটি উত্তরও মনে করতে পারলাম না।

স্যার গম্ভীর গলায় বললেন, 'যে বই পড়ে না সে কখনো ভালো লেখক হতে পারে না।'

ভালো লেখক হওয়ার চেষ্টা অবশ্য এখনো করে যাচ্ছি।

বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ এই বইটি এবং স্যারের পড়ানোর অসাধারণ ভঙ্গির কারণে ইতিহাস বিষয়টি এত বেশি প্রিয় হয়ে উঠল যে সায়েন্স বিসর্জন দিয়ে ইতিহাস নিয়ে পড়তে আর দ্বিধা রইল না। পরবর্তী সময়ে *রুটস* প্রকাশের পেছনেও যে এই বিষয়গুলো প্রবল ভূমিকা রেখেছে তা বলতেই হয়। ইতিহাস জীবনের অংশ হয়ে যায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

কেন্দ্রের ছাদে বসে লেখক চক্রে নিজ লেখা অন্যদের শুনিয়ে লেখকরা যেমন নিজেদের প্রকাশের সুযোগ পেতেন তেমনি স্যারসহ অন্যদের আলোচনার ভেতর দিয়ে নিজের ভুল-ত্রুটি শুধরে নিতে পারতেন। একবার লেখক চক্রে আমাকে গল্প পড়তে বলা হলে বিরস বদনে বসে ছিলাম। স্যার এলেন। প্রথমে একজন হবু ইঞ্জিনিয়ার ও নাট্যকর্মী তার গল্প পড়ে শোনালেন। পরাবাস্তব গল্প। কিন্তু স্যার যেভাবে তাঁর লেখা নিয়ে আলোচনা করলেন, তা ছিল অতি বাস্তব! কান মোটামুটি গরম হয়ে গিয়েছিল। এরপর আমার পালা। গল্প পড়ে শোনানোর শেষ আগ্রহটুকুও তখন কেন্দ্রের ছাদ থেকে পালাতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত পড়া শুরু করলাম গল্প *আদিম*। সবকিছু ভুলে গিয়ে মাথা নিচু করে পড়ে যাচ্ছি। যখন শেষ করলাম, মাথা তুলে দেখি সবাই চুপ। অন্ধকারে কারো মুখ দেখা যাচ্ছে না। স্যারের দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি দুই চোখ বন্ধ করে আছেন!

এমন গল্প পড়লাম যে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল! মৃদুস্বরে স্যারকে বললাম, 'স্যার পড়া শেষ হয়েছে।'

তিনি চোখ বন্ধ করেই মাথা নাড়ালেন। তারপর চোখ খুলে তাঁর মতামত দিলেন। লেখকজীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিন হয়ে উঠল সেটি। স্যারের চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ানোর দৃশ্যটি এখনো আমার কাছে অন্যতম সেরা স্বীকৃতি।

কারো সামনে প্রশংসা করা আর তার গলা কেটে ফেলা সমান— এমন একটি হাদিসের কথা তিনি প্রায়ই বলেন এবং অন্তত নিজ ছাত্রছাত্রীদের বেলায় মেনে চলেন। পরে শুনেছি, তিনি গল্পটি প্রসঙ্গে একটি শব্দ পরপর তিনবার উচ্চারণ করেছেন। যা বিশ্বাস করা আমার জন্য প্রথমে কঠিন হয়ে পড়েছিল! এরপর বিভিন্ন সময় তিনি আমাকে 'ওহে গল্পকার' বলে ডাকতেন। অন্যদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতেন এইভাবে— 'ও হল মুখচোরা। কিন্তু ওর কলমে খুব ধার!' আরেকবার আরেকটি গল্পে বর্ণনার পরিমাণ কম থাকা প্রসঙ্গে হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার গল্পে হাড় বেশি আর আমার গল্পে মাংস বেশি!'

৫

স্যারের গাড়িটি চলতে চলতে প্রায় সময়ই বিকল হয়ে যেত। যাত্রী হিসেবে যারা থাকতেন তখন তাঁদের প্রধান কাজ হত গাড়ি ঠেলা। এ কারণে তাঁর গাড়িতে চড়তে বললে অনেকেরই মুখ কালো হয়ে যেত। স্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছেন তাঁর গাড়ি চালাতে চালাতে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মাসিক মুখপত্র *ঘরোয়া খবর*-এর সম্পাদকের দায়িত্বও তিনি আমাকে দিলেন গাড়িতে বসে। সাধারণত জুনিয়র রিপোর্টার বা সাবএডিটর হিসেবে পত্রিকার জীবন শুরু হয়। আমার পত্রিকাজীবন শুরুই হল সম্পাদক হিসেবে! পত্রিকাটি শুরু করার পর্যায় থেকে অনেক স্মৃতি আছে। ছোট এই পত্রিকাটিতে অনেক বড় লেখক লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিলেন। স্যারের *বিস্রস্ত জর্নাল*, লুৎফর রহমান রিটনের *যত্রতত্র কয়েক ছত্র*, আমীরুল ইসলামের *ঘরোয়া ছড়া* ছিল নিয়মিত বিষয়। প্রচ্ছদ ধ্রুব এষের। এর বাইরে ভিন্নধর্মী লেখা লিখেছিলেন কেন্দ্রের বেবি অস্টিন গাড়িটি নিয়ে সুশীল সূত্রধর, বিমানবন্দরের স্মৃতিচারণ করেছিলেন জুয়েল আইচ, বিটিভির আনন্দমেলা নিয়ে মিষ্টি স্মৃতিচারণ করেছিলেন আব্দুন নূর তুষার, কেন্দ্রের গাছপালা নিয়ে লিখেছিলেন গোলাম মোর্তোজা। এই তালিকা বেশ দীর্ঘ। এই সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল স্যারের লেখা নিয়ে। তিনি তখন একেবারেই লিখতে চাইতেন না। *বিস্রস্ত জর্নাল*-এর ছোট একটি লেখা 'আদায়' করাই যথেষ্ট কঠিন হত। অবশ্য তখন তিনি তাঁর শিক্ষকজীবন, সম্পাদক জীবন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, *কণ্ঠস্বর*, সংগঠক জীবন, তাঁর শিক্ষকদের নিয়ে, বেশ কিছু গল্প এবং উপন্যাসের কয়েক হাজার পাতা ভবিষ্যতে লেখার সম্ভাব্য হিসাব আমাদের দিতেন। যা আমরা গোল চোখ করে তাকিয়ে শুনতাম। কিন্তু দুই লাইন নতুন লেখা পেতাম না। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তিনি সত্যিই সেই হাজার পাতার লেখাগুলো লিখেছেন।

স্যার আমাকে সম্পাদকের দায়িত্ব দিলেও পেশা হিসেবে সাংবাদিকতায় প্রবেশকে তিনি ঠিক পছন্দ করেননি। তাঁর বিবেচনায় সাহিত্যের মতো মানুষও দুই রকম! এক দল সমসাময়িক, আরেক দল চিরায়ত। তিনি মনে করেন, আমি দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ। 'যার নিজের একটি জগৎ আছে তার জন্য এ কাজ নয়'— এই বলে তিনি বেশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তবে পরে অবশ্য তিনি আমাকে সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন!

৬

জীবনযাপন এবং নিত্যকার বিষয় নিয়ে স্যারের কিছু নিজস্ব তত্ত্ব আছে। তখন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের উল্টো দিকের গলিতে তিনি থাকতেন। প্রায় সময়ই প্রয়োজনে স্যারের বাসায় যাওয়া হত। কেন্দ্রের কোনো কর্মীকে ফাইল বগলদাবা করে হাঁটতে দেখলেই অন্যরা বুঝে ফেলতেন তিনি স্যারের বাসায় যাচ্ছেন। স্যারের বাসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের দ্বিতীয় অফিসে পরিণত হয়। তিনি নিজেও ছোট এক প্যাকেট ছোলাবুট কিনে খেতে খেতে অফিসে আসতেন, আবার কখনো বাসায় যেতেন। একদিন স্যারের সঙ্গে তাঁর বাসায় যাচ্ছি। বাংলামটরে ভীষণ গাড়ির ভিড়। রাস্তা পার হতে পারছি না। আমি বললাম, 'কতক্ষণ লাগবে কে জানে!'

স্যার বললেন, 'আমি হিসাব করে দেখেছি, পথে যত গাড়ির ভিড় থাকুক না কেন, প্রতি তিন মিনিটে একবার হঠাৎ এক বিচিত্র শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তিন মিনিট অপেক্ষা করবে। দেখবে রাস্তা পার হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে।'

স্যারের এই তিন মিনিট তত্ত্ব এখনো আমি ব্যবহার করি এবং প্রায়ই চমৎকৃত হই!

৭

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সূচনা সময়ের শিক্ষার্থী মিজারুল কায়েস পররাষ্ট্র সচিব থাকাকালে হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিদেশে চিকিৎসার পর দেশে ফিরে এলে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা একটি সৌজন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ধানমন্ডির বেঙ্গল গ্যালারিতে। স্যার সেখানে আসেন। তাঁর সঙ্গে লম্বা সময় পর দেখা হয়। সেদিন বেশ ভালো মুডে ছিলেন। তিনি আমার পিঠে একটি কিল বসিয়ে দেন। নানা রকম কথার ফাঁকে হঠাৎ আমি বলে বসি, 'স্যার, কেন্দ্রে আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন, বাইরের জগৎ সেই নিয়মের পুরো উল্টো চলছে।'

কথাটি স্যার এতটা গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন ভাবিনি। তিনি নানাজনের কথার ফাঁকে আমাকে বোঝাতে লাগলেন। এমনকি রাতের খাবারও বেশি খেলেন না। খাবারের টেবিলে বসেও কথা বললেন। আমি কলেজজীবনের মতো মাথা নিচু করে তাঁর কথা শুনতে লাগলাম। একপর্যায়ে তিনি তাঁর নিজের জীবনের উদাহরণ টানলেন।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র যখন শুরু করেন তখন দিন-রাত পরিশ্রম করতে হয়েছে। এই সময় নায়েমের একজন প্রবীণ শিক্ষক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী সায়ীদ কেমন আছ?'

স্যার হতাশ কণ্ঠে তাকে উত্তর দিলেন, 'কাজ করতে করতে বুড়া হয়ে গেলাম!'

সেই প্রবীণ শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে তাকে অদ্ভুত জবাব দিলেন, 'কাজ না করলেও হতে।'

স্যার বললেন, এই জবাবটি শুনে তিনি চমকে উঠেছিলেন।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাজ করি বা না করি একটা সময় মৃত্যু আমাদের নিয়ে যাবে,' তিনি শান্ত স্বরে বললেন। তারপর আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে স্যার বললেন, 'তুমি যেটাকে সত্য হিসেবে মনে করেছ সেটাকেই আঁকড়ে ধরে থাক। যদি অন্যরা এটাকে ভুল মনে করে তবুও। তুমি তোমার সত্যের জন্য লড়াই করো। একটা সময় মরতে হবে। আর মরবেই যখন নিজের স্বপ্নের জন্য মরো।'

২০১৪

মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান : সাংবাদিক; সম্পাদক, রুটস

আতিকুজ্জামান

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ র'বে না আর, র'বে মানুষের স্বপ্ন তখন:
সেই মুখ আর আমি র'বো সেই স্বপ্নের ভিতরে।
—জীবনানন্দ দাশ/স্বপ্ন

১

গ্রিক মিথের পুত্র ইকারুস একদিন নিজের ডানায় ভর করে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু কালের বাস্তবতায় সে কাহিনী আজ রূপকথার গল্প। বর্তমান আলোকোজ্জ্বল যন্ত্র-সভ্যতার আগে অতিবাস্তবতা, রূপকথা কিংবা মিথ আমরা যাই বলি না কেন, এগুলো প্রচলিত ছিল। মিথের বাজারদর এখন কম, বলতে গেলে নেই-ই। কিন্তু যখন হাওয়াই জাহাজে চেপে নিউইয়র্ক কিংবা প্যারিস গমন করি তখন একবারও কি আমাদের সেই ইকারুসের প্রচেষ্টার কথা মনে আসে না? মনে আসে নাকি আধুনিককালের সেই রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা— যারা ইকারুসের মতো উড়তে চেয়েছিল আকাশে। এত কথা বলার বা ভূমিকা করার যে উদ্দেশ্য সেটি হল— 'মানুষের স্বপ্ন'। মানুষ যা স্বপ্ন দেখে, ভাবে, আশা করে তা সে একসময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যায়, পেয়েও যায়। গ্রিক মিথের ইকারুস আজ কালিক সংস্করণের পথ পেরিয়ে অ্যারোপ্লেন হয়ে আকাশকে জয় করেছে। কীভাবে সম্ভব হল? ইকারুস স্বপ্ন দেখেছিল, আর আজ ক্রমাগত প্রচেষ্টায় সেই স্বপ্ন সত্যি হল।

পুঁজিবাদের উত্থানের সাথে সাথে আমাদের যে বড় উপহার সেটি হল আমরা মানুষেরা যান্ত্রিক হয়ে গেছি। সমষ্টি থেকে বিছিন্ন হয়ে ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যতা আজ নগ্নভাবে প্রকাশিত। আর যদি সেটি হয় আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের কথা তবে বলা যায়— *লালসালু*র মজিদের কিংবা *চাঁদের অমাবস্যা*র কাদেরের প্রতিমূর্তিই হচ্ছি আমরা বেশিরভাগ রাষ্ট্রসদস্য। আমরা ফন্দি করি, আমরা ফিকির করি, আমরা মেকিতায় পরিপূর্ণ হয়ে অন্যের দিকে মুচকি হেসে, অন্যের জন্য ওপরে ওপরে জান দিয়ে তলায় তলায় যুতসই বাঁশ-ই দেই। কিন্তু কেন আমরা এমন করি? কারণ একটাই— আমাকে এই স্বপ্ন-সম্পদের ভেতর থেকে অন্যদের চেয়ে ভালোমতো বাঁচতে হবে।

গোটা জাতির যখন এই অবস্থা, বর্তমান রাজনৈতিক দলের নেতারা যখন নানা মাত্রিকতায় অহরহ প্রতিটি রাষ্ট্রসদস্যকে ধর্ষণ করে চলেছে তখন আমাদেরকে সেই ডিডেলাস কিংবা ইকারুসের মতো আগামী সুন্দরের প্রত্যাশায় আশ্রয় নিতে হয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নামক এক শুদ্ধতম বৃক্ষের ছায়ায়। কালিক বাস্তবতায় তিনি এক অনবদ্য ইকারুস। হাজারো পঙ্কিলতার মধ্যে বাস করেও, ক্লেদ-ভাঁওতাবাজির মধ্যে অবস্থান করেও, তিনি অনবরত অবক্ষয়ের মধ্যে ক্ষয়িত হয়েও এক চমৎকার জলপদ্মের স্বপ্ন দ্যাখেন। সে জলপদ্ম-স্বপ্ন আগামীর বাংলাদেশ। তিনি নিজে স্বপ্ন দেখেন— গোটা জাতিকে স্বপ্ন দ্যাখান। তিনি ডাস্টবিনে পচা ময়লা স্তূপের মধ্যে হঠাৎ কেঁদে ওঠা নিষ্পাপ শিশুর ত্রাতা, তিনিই আমাদের একজন শুদ্ধতম পিতা। মানুষকে শেষ পর্যন্ত কিছু একটা আঁকড়ে ধরেই তো বাঁচতে হয়। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্বপ্নকে অবলম্বন করেই বাঁচেন, সাথে সাথে প্রজন্মকেও বাঁচান।

পথের দাবী-র সব্যসাচীকে আমাদের মনে হয় মনে আছে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের জীবন ব্যাপক কর্মময়। তিনি সব্যসাচী, এটা মোটেই বাড়িয়ে বলা নয় কিংবা ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে বিনীত শ্রদ্ধাবশত কোনো উক্তিও নয়। ৬০-এর দশকের যে নতুন সাহিত্যধারা, সেই *কণ্ঠস্বর*, একে আমরা কীভাবে বিচার করব? স্বাধীন বাংলাদেশে সায়ীদের মাঠপর্যায়ে যে কর্মকাণ্ড, সামাজিক-রাষ্ট্রিক পর্যায়ে এক তুখোড় মাঠকর্মী— কোন্‌টা বাদ দিয়ে কোন্‌টা ধরা যায়। একজন চমৎকার শিক্ষক, একজন দক্ষ সংগঠক, একজন সফল সম্পাদক, একজন আকর্ষণীয় টেলিভিশন উপস্থাপক— এ সবের সার্বিক সমন্বয়েই তো আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু স্বপ্ন পরিসরে আমরা ধরার চেষ্টা করব মূলত একজন 'আশাবাদী রাষ্ট্রনাগরিক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে।' যদিও তাঁর কর্মময় জীবনের নানাদিক মূল আলোচনায় আসবে।

২

আমাদের দেশের কালিক সঙ্কটে বেশ কিছু রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী মাঝেমধ্যে অর্ডারি চেতনাবাদী ও জাতির বিবেকধর্মী কিছু বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে থাকেন। আর বিবৃতি শেষে দলগত সরকারি ক্ষমতার ব্যবহারে সেইসব বুদ্ধিজীবী হয়ে ওঠেন এক-একজন কলমপেষা দলগত বুদ্ধিজীবী। সত্যিকার অর্থে বাড়ির পোষা কুকুরের সাথে মনিবের যে সম্পর্ক, মনিবের সম্পদরক্ষার্থে তার যেসব অভিযান, বাইরের অন্য কুকুরের আক্রমণ থেকে নিজ মনিবের পরিবার-সদস্যদের নিরাপত্তা রক্ষা করার যে প্রবণতা— এই দলগত বিকৃতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের সাথে ওই পোষ্য কুকুরদের সত্যি কোনো তফাত আছে কি? আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় দেশে আজ অনেক দলগত বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি। এরা সরকারি পোষ্য। সরকারকে যার যার সময়ে রক্ষা করা এঁদের কর্তব্য। এঁরা পেপার-পত্রিকা, বেতার-টেলিভিশনে সরকারের গুণকীর্তন করেন, ভুলেও গণমানুষের কথা মুখে আনেন না। দেশের বিবেকবান সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ কেউ কলম ধরেন ঠিকই, কিন্তু ওই পর্যন্তই। মাঠে তাঁরা নামেন না। শেষ পর্যন্ত ওই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকেই মহানগরীর আবর্জনাস্তূপ আর ময়লা নর্দমাগুলো পরিষ্কার করতে নামতে হয়। কারণ দেশ ডেঙ্গু মহামারীতে আক্রান্ত। আর নগরকর্তার বেতার-টেলিভিশনে বিবৃতি দান— এখনো মহামারী ঘোষণা করার মতো মানুষ মরেনি। কত মানুষ মরলে পরে মহামারী হিসেবে ঘোষণা দেয়া হবে! আর মহামারী ঘোষণা করলেই বা তাতে কী লাভ? ঘোষণার সাথে সাথে কি আলাদিনের চেরাগের মতো সব সঙ্কটের নিরসন হবে? মঞ্চে-পর্দায় অনেককে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত মাঠে নামতে হয় সায়ীদকে স্বয়ং, সাথে তাঁর উদ্দীপ্ত কর্মীবাহিনী তরুণ সমাজ আর কিছু বিবেকবান সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। সায়ীদ স্বপ্ন দেখেন— চমৎকার আগামী বাংলাদেশের। কিন্তু স্বপ্ন দেখাই কি তাঁর প্রধান কাজ, স্বপ্ন দেখানোতেই কি তাঁর দায়িত্ব শেষ? তিনি খুব বেশি নির্ভরশীল ও বিশ্বস্ত নতুন প্রজন্মের প্রতি। তিনি অঙ্কুরগুলোকে ঠিকমতো পরিচর্চা-প্রতিপালনের এক নিবেদিত-অভিভাবক। আর এ জন্যই তাঁকে বলেছি আমাদের পিতা।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা জাতির আগামী উন্নয়ন-উন্নতি, সমৃদ্ধিতে যে বড় প্রত্যাশা সেটি হল কনিষ্ঠ রাষ্ট্র-সদস্যদের সঠিকভাবে গড়ে তোলা। একজন ভবিষ্যৎ দায়িত্ববান নাগরিক হঠাৎ করেই তৈরি হয় না। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এর পেছনে কাজ করে। আগামী জাতির মানস গঠনে সায়ীদের পরিকল্পনা তাই ব্যাপক ইতিবাচক কর্মযজ্ঞ। তিনি শিশু-কিশোর-তরুণদের মানস গঠনে ব্যবহার করেন সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি। তিনি তাদের চেতনা-জগৎকে জাগিয়ে দেন। তিনি পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরগুলোকে তাদের সামনে হাজির করেন। তিনি স্বপ্ন দেখান সেইসব ব্যক্তিত্বদের যাঁরা মর্তের বুকে শ্রেষ্ঠ সন্তান। কোন্ পথটা নির্বাচন করতে হবে তা তিনি কারো 'পরে চাপিয়ে দেন না। তিনি দেখিয়ে দেন— এই পথটা ভালো, এইটা আলোকিত পথ। তিনি প্রজন্মের মনে দেশের প্রতি আন্তর তাগিদ জাগিয়ে তোলেন। দেশের প্রতি নাগরিকের দায়বদ্ধতাকে তিনি দেখান নিজের কর্ম দিয়ে। তিনি কর্মবাদে বিশ্বাসী। তাঁর অভীষ্ট— 'তোমাকে আসতেই হবে হে মূল্যবোধ, তোমাকে আসতেই হবে এ উজ্জ্বল বাংলাদেশে। হে নতুন প্রজন্মের ত্রাতারা দুঃখের অন্ধকারে তোমরা কিছুতেই না এসে পার না।'

৩

আত্মার তাগিদ এবং দৈশিক দায়বদ্ধতা থেকে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ গড়ে তুলেছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো ইতিবাচক একটি কর্মশালা। শুধু ঢাকা নয়, সমগ্র দেশে জ্ঞানের আলো যাতে ছড়িয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা তিনি করেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিদ্যাসাগরীয় পদ্ধতিতে তিনি প্রয়োগ করেন নানা বৈচিত্র্যময় বিষয় সম্বলিত বই, যা শুধু পড়েই শেষ নয়, ভাবতে হয় পাঠককে। দেশের মানুষকে তিনি ভালোবাসেন। আর তাই জনগণের বঞ্চিত ফলাফলকে নির্ভীক কণ্ঠে উচ্চারণ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। তিনি কারো পক্ষে নন— কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে, তিনি শুধু জনগণের পক্ষে। সমকালীন রাষ্ট্রিক শাসনব্যবস্থার নামে প্রতিনিয়ত নাগরিকের যে শোষিত হওয়ার ঘটনা তা তিনি বলেন এভাবে : 'আমাদের দেশের বর্তমানের মতো অবস্থায় যখন তা (রাষ্ট্র) পুরোপুরি একটা শোষণকারী ও অত্যাচারী একটা সংস্থায় পরিণত হয়েছে। আমি মনে করি আমাদের জাতির প্রধানতম শত্রু আর নির্যাতনকারী সংস্থা আজ রাষ্ট্র।'

দেশের সব মানুষই যে গভীর দায়িত্ববোধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিত্ববান রাষ্ট্রসদস্য হবে তা প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। দেশের নাগরিকদের মধ্যে শতকরা হিসাবে মাত্র ৪ থেকে ৬ ভাগ মানুষ মননশীল হয়। দেশকে নিয়ে, দেশের মানুষকে নিয়ে, এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরা চিন্তাভাবনা করেন। সায়ীদ সেই ৪ থেকে ৬ ভাগ মানুষকে তৈরি করার রসদ যুগিয়ে যান। গড়পড়তা মানুষদেরকে নিয়ে তিনি অভিযোগ করেন না। কারণ দেশের সার্বিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ গড়পড়তা মানুষের তো প্রয়োজন রয়েছেই। কর্মীবাহিনীর জন্য তো গড়পড়তা মানুষ প্রয়োজন। কিন্তু তিনি জাতির দিকনির্দেশনার জন্য সেই ৪ থেকে ৬ ভাগ মানুষকে বেশ গুরুত্বের সাথে বিচার করেন। কারণ এই ৪ থেকে ৬ ভাগ মানুষই তো আর ৯৪ বা ৯৬ ভাগকে নেতৃত্ব দেবে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে অবলম্বন করেই মূলত আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের স্বপ্ন দেখা। তাঁর আশা— 'আগামী বিশ বছরে আমাদের এই প্রচেষ্টা থেকে সমাজে আমরা কিছু 'সম্পন্ন' উজ্জ্বল মানুষ দিতে পারব বলে আমি বিশ্বাস করি। জীবনের সূচনার দিনগুলোতে মানুষের চেতনা জগৎকে যদি একটু সম্পন্ন করে দেয়া যায়, তাকে যদি একটু অনুভূতিময় করে তোলা যায়, তার মানবিক সমৃদ্ধিকে বাড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে সে যখন কর্মজীবনে যাবে তখনও ওই হৃদয়টা, স্বপ্নটা তার মধ্যে থেকে যাবে। সে পৃথিবীকে ওইভাবে গড়ে তুলতে চাইবে। আমরা ছোটবেলা থেকেই একজন মানুষের হৃদয়টাকে সুন্দর করে গড়ে দেবার চেষ্টা করি। তাকে এমন একজন সচেতন আধুনিক ও উদার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই যার সামনে থাকে একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন। একজন মানুষ শারীরিকভাবে জন্ম নেয় একবার। কিন্তু তারপর অনবরত তাকে আরো সত্য-শিব ও সুন্দরের প্রত্যাশায় নিজেকে অতিক্রম করতে হয়, নিজেকে সৃষ্টির মাধ্যমে তার পুনর্জন্ম ঘটে বহুবার। মন মননের উন্নতি, বিচারবুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনার মাধ্যমে উন্নত চিন্তা-চেতনার দ্বারা প্রতিনিয়ত একটি চমৎকার পৃথিবীকে বাসযোগ্য কল্যাণময় ভূমি তৈরি করার প্রত্যয়েই তাঁর এই কর্মপ্রচেষ্টা। সায়ীদ সেই শ্রেয়োবোধ, চিন্তা-চেতনাকে পাথেয় করেই এগিয়ে চলেন সম্মুখপানে। তিনি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নানা প্রকার অবক্ষয়ী প্রবণতা স্বীকার করে নিয়ে অতঃপর তার শুদ্ধিকরণ অভিযানের মাধ্যমে দেশকে সঠিক অর্থে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। একটি দেশ ঔপনিবেশিক ও নব্য-ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ শেষে যখন '৭১-এর জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে নিজস্বতা পায় তখন তিনি স্বীকার করেন— সেই ক্ষুধার্ত পরিবেশে ব্যক্তির অর্থ আগমনই বড় কথা বা স্বাভাবিক। তা সে যে পথেই হোক। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর ৩০ বছর পার হওয়ার পর যখন সেই একই প্রবণতা দেশে চলতে থাকে তখন তিনি সেই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দেশের সেই প্রাথমিক অবস্থা তো

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আর নেই— প্রাথমিক অবস্থায় সম্পদের কালোবাজারি মানলেও তিনি পরবর্তীতে ওই একই অবস্থা মানতে রাজি নন। এখানে তাই তাঁর যুক্তিবাদী প্রত্যাশা আমাদেরকে আরো সচেতন করে তোলে। তিনি বলেন— 'কোনো জাতির জীবনেই প্রথম পুঁজি সৎপথে অর্জিত হয় না। আমাদেরও তা হয়নি। ... নির্বিচার জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় লুণ্ঠনের ভেতর দিয়ে এই সম্পদ অর্জিত হয়েছে বলে এখানে মূল্যবোধের ব্যাপারটিকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নবাবি আমলে জমিদাররা নবাবের দরবারে খাজনা পাঠানোর সময় রাস্তার পাশে ওঁৎ পেতে থাকা দস্যুরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই খাজনা লুটে নিত, ঠিক সেইভাবেই আমাদের জাতীয় দস্যুরা গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমাদের দেশের গরিব মানুষদের জন্যে আসা সারা পৃথিবীর ভিক্ষা— যার অন্য নাম বৈদেশিক সাহায্য— নির্বিবেকভাবে লুট করে সেই সম্পদের পাহাড় গড়েছে। ... একটি জাতির প্রথম পুঁজিগঠনের যুগে এই দস্যুতা অনিবার্য, প্রায় বিকল্পহীন বাস্তবতা। ইউরোপ এই বিত্তের বিকাশ ঘটিয়েছিল সারা পৃথিবীকে লুণ্ঠন করে।' তাঁর এ বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু এর পরই তিনি উচ্চারণ করেন তাঁর আকাঙ্ক্ষাযোগ্য স্বপ্নের কথা— 'আমি বিশ্বাস করি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হাতে এই বিত্তের আশাব্যঞ্জক বিকাশ ঘটবে। মূল্যবোধবর্জিতভাবে বিত্ত অর্জন সম্ভব, কিন্তু ওই পথে বিত্তের বিকাশ বা স্থিতিশীলতা সম্ভব নয়। এর জন্যে আস্থাশীল, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশ দরকার।'

আমাদের প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির হিসাব মেলালে আমরা দেশে যে বিরাট কিছু করে ফেলেছি তা নিশ্চয়ই বলা যাবে না। কিন্তু তার পরেও আগামীতে আমাদের যে ভালো কিছু হবে না, এই হতাশা সায়ীদ কখনো পোষণ করেন না। আর তাই তিনি বলেন, 'আমার দেশের ভবিষ্যৎ নেই এটা বিশ্বাস করে বেঁচে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' অর্থাৎ তিনি আশাবাদী, তিনি দেশকে নিয়ে বরাবরই স্বপ্ন দেখেন। তিনি যুক্তি দেন— 'জাতির জীবন একজন ব্যক্তির জীবন নয়। এ এক বিশাল ব্যাপার। একটা জাতির পাশ ফিরে শুতেও অনেক সময় অনেক মানুষের জীবনের পরিধি পার হয়ে যেতে পারে। আমাদের একটি জীবনকালের মধ্যে একটা জাতির পরিপূর্ণ নিয়তি দেখে যাবার চিন্তাটাই ভুল। কোনো জাতিই তার জনগণকে সেই অভাবিত উপহার দিতে পারেনি। আমাদের জাতিও পারবে না। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। জাতিকে তার নিজস্ব বিকাশের নির্ধারিত সময় দিতে হবে।'

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রত্যাশা-প্রাপ্তি নিয়ে তাঁর যেসব চিন্তা-চেতনা, তা থেকে এটাই অনুমেয়— তিনি দেশকে, দেশের মানুষকে গভীরভাবে অনুভব করেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসেন। ৭০-এর দশকের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশের মধ্যে তো অনেক পার্থক্য। উন্নয়ন-উন্নতি যে হয়নি তা তো বলা যাবে না। প্রত্যাশার তুলনায় প্রাপ্তি কম হলেও আমরা তো এগিয়েছি, এগিয়ে যাচ্ছি। আর এর পেছনে কাজ করছে সায়ীদের মতো কিছু নিবেদিত প্রাণ।

৪

আমাদের সমকালীন সময়ে চারদিকে যখন নৈরাশ্য আর হতাশা তখন সায়ীদ আমাদের চেতনায় জ্বালিয়ে দেন আমাদের আগুনঝরা দিনের কথা। তিনি থেমে যাওয়া চলৎহীন স্থাণু কালকে গতি দিতে তাই উচ্চারণ করেন— 'আর একটা ব্যাপার দেখে গর্বে আনন্দে বুক ভরে উঠত। দেখতাম একটা অপুষ্টিনিষ্পিষ্ট, ভীরু, আত্মকেন্দ্রিক, মেরুদণ্ডহীন জাতি ইস্পাতদৃঢ় জাতীয় অঙ্গীকারের ভিতর ধীরে ধীরে সামরিক পরিচয়ে জেগে উঠছে। অস্ত্রসজ্জিত সুশৃঙ্খল সেই জাতির দিকে তাকিয়ে মনে হত এই জাতি অস্ত্রকে এখন অস্থির বানিয়েছে। এ এখন অপরাজেয়। একাত্তরের যুদ্ধ অন্তত এ কারণেও স্মরণীয় হবে যে, জাতীয় অস্তিত্বের একটা বড় শূন্যতাকে ভরে দিয়েছিল এ যুদ্ধ।' দেশের সার্বভৌম অর্থে আমরা মুক্তি পেলেও সমৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক মুক্তিতে আমরা এখনো পিছিয়ে। সায়ীদ কি তাঁর ওই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রজন্মের কাছে আর এক মুক্তিযুদ্ধের আভাস-ইঙ্গিত প্রদান করেন না! একটি শ্রেণিহীন-শোষণমুক্ত সমতাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সেই শ্রেণিহীন সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রজন্মের কাছে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আগামীতে সে সমাজ প্রত্যাশা করেন। সমাজতন্ত্রের সমকালীন সঙ্কটময় অবস্থাকে মাথায় রেখেও তিনি মনে করেন— 'সমাজতন্ত্র আজ পৃথিবীতে যতবড় সঙ্কটের মধ্যেই নিক্ষিপ্ত হোক না কেন, শ্রেণি-শোষণের অবসান এবং মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ভিতর দিয়ে একটা সুন্দর সুখী পৃথিবী রচনার যে স্বপ্ন এই দর্শন একদিন পৃথিবীকে দেখিয়ে গেছে, আমি বিশ্বাস করি কোনোদিন তার মৃত্যু হতে পারে না। এই স্বপ্ন মানুষের মৌলিক আকুতির সঙ্গে বাঁধা। যত অপ্রাপণীয়ই হোক, দুঃখদিনে মানবজাতি বুকের খুব গভীরে ওই স্বপ্নকে একইভাবে চিরকাল অন্বেষণ করবে।'

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ শেষপর্যন্ত মর্তবাদী তথা জীবনবাদী। তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের বর্তমানতাকে বিচার করেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন এই

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্তজীবনকে আরো সুন্দর করার তাগিদে। 'এই জীবনটাই আমার আনন্দ, আমার গন্তব্য, আমার মোক্ষ, আমার সর্বস্বতা। আমি এই জীবনটুকুকেই শুধু চাই। মৃত্যুকে আমি বাধা দিতে চাই না। সে তার মতো থাক'—এ উক্তি কি আমাদের সেই ঐতিহ্যিক গৌতমবুদ্ধের শূন্যবাদ দর্শনের সাথে মিলে যায় না? আর তাই যদি যায় তবেই তো একজন মানুষ তার ইহজাগতিক বাস্তবতাকে চমৎকারভাবে রূপায়িত করার প্রয়াস পান, এগিয়ে চলেন সামনে তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে। জীবনের পূর্ণতার জন্য, আগামী সুন্দরের জন্য সায়ীদ বিশ্বাস করেন— মানুষ যা স্বপ্ন দেখে মানুষ তা-ই হয়ে যায়। স্বপ্ন থাকলেই মানুষের মধ্যে স্বপ্নের সমান হবার জন্য উদ্যম কাজ করে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের স্বপ্ন এই দেশকে নিয়ে, এ দেশের মানুষকে নিয়ে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নেই— কথাটা তিনি মানতে রাজি নন। কেননা এ তাঁর আত্মবিনাশের সমান। তিনি শত প্রত্যাশার অপ্রাপ্তির মধ্যে দাঁড়িয়েও আমাদের প্রজন্মকে আশার বাণী শোনান। তিনি হাজারো গ্লানি, ব্যর্থতা আর পঙ্কিলতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক চমৎকার জলপদ্ম ফোটানোর আশায় বুক বাঁধেন, ভালোবাসার সাম্পান ভাসান। তিনি আমাদেরকে নির্মাণ করার পথ দেখিয়ে দেন— সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ নির্মাণ।

২০০৫

আতিকুজ্জামান : লেখক

মাহমুদ হাশিম

রেনেসাঁসের স্রোতধারা

জ্ঞানের বেদনা বইবার শক্তি তোমার নেই— বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পুরনো ভবনের সংগীতকক্ষে আলো-আঁধারিতে স্যারের ছোট্ট এ কথাটি ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল আমার সমগ্র সত্তায়, ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল আমার অস্তিত্বকে। জ্ঞানের আনন্দের কথা জেনেছি, কিন্তু বেদনার কথা তো শুনিনি কখনো। জ্ঞানের বেদনাও আছে, আর তা বইতে আমি অক্ষম! প্রচণ্ড আহত আমার ২৬ বছরের তারুণ্যের অভিমান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। একটা ব্যক্তিগত সংকটে পড়ে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিলাম। কোনোভাবেই বের হতে পারছিলাম না সমস্যাটি থেকে। মনে হচ্ছিল মরণ ছাড়া গতি নেই, একমাত্র মৃত্যুতেই এর সমাধান। সিদ্ধান্ত : আত্মঘাতী হব। কিন্তু মরতে সাহস বা ইচ্ছে কোনোটাই হচ্ছিল না। হঠাৎ মনে হল, স্যারের সঙ্গে একটু শেয়ার করি না কেন। কিছুদিন ধরে কেন্দ্রে আসা-যাওয়া করছি। কোনো কোর্স করিনি তখনও। চেহারায় আমাকে চেনেন স্যার।

সেদিন সন্ধ্যায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে গিয়ে স্যারকে বললাম আমার একান্ত কিছু কথা। যথারীতি ব্যস্ত ছিলেন, তারপরও সময় দিলেন। আমাকে নিয়ে বসলেন তাঁর প্রিয় সংগীতকক্ষে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে ঢুকতেই সবুজ লন পেরিয়ে পুরনো ভবনের সামনের অংশে নিচতলায় ছিল গোছানো ছোট্ট সংগীতকক্ষটি। সময় পেলেই স্যার সেখানে বসে মগ্ন হয়ে গান শুনতেন। পাঁচ মিনিট সময় বেঁধে দিলেন, আর ঘণ্টারও বেশি সময় নিয়ে স্যার শুনলেন আমার কথা। মুহূর্তের জন্য চোখ সরালেন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মুখ থেকে। কথা শেষ হলে, কিছুক্ষণ চুপ থেকে, উচ্চারণ করলেন এ লেখার শুরুর বাক্যটি। সান্ত্বনা চাইতে এসে পেলাম উল্টো আঘাত!

— আমি তো কোনো অপরাধ করিনি। তবে, আমি শাস্তি পাব কেন? বিপন্ন আমি জানতে চাই স্যারের কাছে।

— শাস্তির সঙ্গে সবসময় অপরাধের যোগ থাকে না, নিরাপরাধও শাস্তি পায়; আর অপরাধীও পার পেয়ে যায় অনেক সময়— স্যারের কাছে প্রথম শুনলাম এ কথাটিও।

স্যারের অলৌকিক বাক্য দুটি আমাকে প্রবলভাবে ফিরিয়ে আনল জীবনে। সেদিন যে নতুন জগতের দুয়ার খুলে গিয়েছিল আমার চোখের সামনে সে পথে হাঁটতে গিয়ে স্যারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়িয়েছে ২২ বছরে। দীর্ঘ এ সময়ে আমি জেনেছি, দেখেছি— আমার মতো কত অর্বাচীন, পথহারাকে নতুন জীবন দিয়েছেন স্যার, আক্ষরিক অর্থেই জীবনদান। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তাঁর নান্দনিক কল্পনার সৃষ্টি। আমাদের এই জীবনদেবতা রক্তমাংসের, আমাদের সঙ্গে তাঁর নিত্য লেনদেন। এই লেনদেন অলৌকিক সব স্বপ্নের, আশ্চর্য সব সুন্দরের, গভীর বেদনাকে স্বীকার করেও প্রগাঢ় আনন্দের, অভিমানহীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার, নিজেকে এবং সকলকে ভালোবাসবার ঔদার্যের।

সক্রেটিসের বংশধর

বহুমাত্রিক মানুষ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তাঁর সাংগঠনিক শক্তির প্রতীক হয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নতুন ভবনটি। দেশের সীমানা ছাড়িয়েছে তাঁর স্বপ্নের বিস্তার। শিক্ষকতায় তাঁর খ্যাতি কিংবদন্তিতুল্য। ষাটের দশকে সাহিত্য আন্দোলনের তিনি পুরোহিত, প্রধান 'কণ্ঠস্বর'। টিভি উপস্থাপনায় তিনি পাইওনিয়ার। নিজেকে নবীন লেখক দাবি করলেও তাঁর লেখালেখির জগৎটিও ঋদ্ধ। *নিষ্ফলা মাঠের কৃষক, ভালোবাসার সাম্পান, আমার উপস্থাপক জীবন, বহে জলবতী ধারা, ওড়াওড়ির দিন, সংগঠন ও বাঙালি, গণতন্ত্র ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, বিস্রস্ত জর্নাল*-এর মতো বইগুলোতে ছড়িয়ে আছে তাঁর মনীষার দ্যুতি। রাজধানীর মাঠ-জলাভূমি রক্ষায় ব্যানার-ফেস্টুন হাতে নেমে পড়েন রাস্তায়। ডেঙ্গু নির্মূলে রাজধানীজুড়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান— হেনকর্ম নেই তিনি করেননি। তবে সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর বড় পরিচয় শিক্ষক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। স্যার মাঝে মাঝে রসিকতা করে বলেন, বুঝলে হে, আমি হলাম গিয়ে সক্রেটিসের বংশধর, আমিও শিক্ষক, না হয় একটু ছোট শিক্ষক আর কি!

না, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ছোট শিক্ষক নন, বড় শিক্ষক; অনেক বড়। কমবেশি সবাই মানেন স্যার বড়। তবে স্যার কত বড় শিক্ষক, কত বড় মাপের মানুষ সবসময় আমরা ঠিক বুঝতে পারি কিনা আমার সংশয় আছে। খুব কাছে থাকলে বোঝা যায় না। স্যার বলেন, চোখের সামনে হাত রাখলে এভারেস্টও ঢাকা পড়ে যায়। সক্রেটিস, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও'র যোগ্য উত্তরসূরি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। কোথাও কোথাও তাঁদের চেয়ে ব্যতিক্রমীও।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সবচেয়ে পুরনো কোর্স বিশ্বসাহিত্য পাঠচক্র। এ চক্রটির মধ্য দিয়েই ১৯৭৮ সালে ঢাকা কলেজের এই শিক্ষক রোপণ করেছিলেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের রক্তবীজ। গত ৩৬ বছর ধরে স্যার নিজেই ক্লাস নেন এ কোর্সটিতে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নতুন শুরু হওয়া আলোর ইশকুলসহ কিছু কোর্সে যৎসামান্য ফি থাকলেও বিশ্বসাহিত্য পাঠচক্রে কোনো ফি নেয়া হয় না। অথচ কেন্দ্রের আর্থিক সংকট রয়েছে সবসময়। স্যারকে বললাম, পাঠচক্রে আমরা চাইলে বড় অংকের কোর্স ফি নিতে পারি। স্যার কাতরকণ্ঠে বললেন, আমি যতদিন বেঁচে আছি কোনো ফি নিও না! চমকে উঠি স্যারের কথায়, তাঁর কাছেই জেনেছি শিক্ষাদানের বিনিময়ে সক্রেটিস কোনো অর্থ নিতেন না। শুধু এ দিয়ে সক্রেটিসের সঙ্গে স্যারের তুলনা টানছি না। সক্রেটিস তাঁর সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন গ্রিসের মানুষ, বিশেষ করে তরুণদের জ্ঞানে-প্রজ্ঞায় বড় করে তুলতে। এজন্য হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন মৃত্যুকে, কিন্তু মানেননি পরাভব।

এ দেশের তরুণ প্রজন্মকে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, জ্ঞানে-প্রজ্ঞায়, স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্যে, আনন্দে-উৎকর্ষে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার পথ দেখানো স্যারেরও সারা জীবনের ব্রত। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত কোনো ছেলে বা মেয়েকে দেখলে স্যার কী যে খুশি হয়ে ওঠেন, দেখে অবাক হই। নিজের সন্তান হলে মা-বাবা এমন খুশি হন। স্যার বলেন, এরা রক্তের সন্তান না হলেও তাঁর মানস-সন্তান।

তরুণ সমাজকে বিপথগামী করার অভিযোগে সক্রেটিসকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল গ্রিসের রাষ্ট্রযন্ত্র। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চেয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র। সক্রেটিসের অনুসারীর চেয়ে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের অনুসারীরা সম্ভবত শক্তিশালী। তাই যে সংসদ তাঁকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করেছে, সেই সংসদই তাঁর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে। উপমহাদেশের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যারকে কেউ কেউ একালের বিদ্যাসাগর বলে অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানান। তুলনাটা দুজনের কর্মের। রাজা রামমোহনের পর বাঙালির শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বড় কাজ করে গেছেন বিদ্যাসাগর। স্যারও একই কাজ করছেন, কিন্তু তাঁর পথটি ভিন্ন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় হতাশ 'নিষ্ফলা মাঠের কৃষক' বুঝলেন বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় তাঁর কাঙ্ক্ষিত আলোকিত মানুষ, বড় মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই ছেড়েছেন শিক্ষকতার নিরাপদ চাকরি। স্যার বলেন, ছোট মানুষ দিয়ে বড় জাতি হয় না।

৩৬ বছর ধরে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে স্যার তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। কেন্দ্রে বিভিন্ন উৎকর্ষ কার্যক্রম, সারাদেশে স্কুল-কলেজে আনন্দময় বইপড়া কর্মসূচি, মোবাইল লাইব্রেরি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে স্যার বিকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর শিক্ষাভাবনার। তাঁর শিক্ষা-দর্শনের মোদ্দা কথা আনন্দময় এবং বিচিত্রমুখী শিক্ষার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠা। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল। একই ভাবনা থেকেই শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের আলোর ইশকুল স্যারের শিক্ষাভাবনার সর্বশেষ সংযোজন— যেখানে মানবজ্ঞানের বিবিধ শাখায় আনন্দময় বিচরণের মধ্য দিয়ে তৈরি হবেন বহুমুখী মেধা-মননে ঋদ্ধ আগামী দিনের পথের দিশারীরা। গত ৩৬ বছরে এমন মানুষ কিছু কিছু তৈরিও হয়েছেন। দেশে-বিদেশে নিজ নিজ কর্মযজ্ঞে তাঁরা আলো ছড়াচ্ছেন। এভাবে নিষ্ফলা মাঠেও স্যার হয়ে ওঠেন একজন সফল কৃষক।

আমাদের ডিরোজিও

স্যারের সবচেয়ে বড় কীর্তি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নয়তলা ভবন নয়, তাঁর শিক্ষাচিন্তা। আর এ চিন্তার বিকাশে তিনি যে পথ ধরে চলেন তাতে দেখি বাঙালির আরেক মহান শিক্ষকের ছায়া। তিনি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে হিন্দু কলেজের এই তরুণ শিক্ষক তাঁর ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের মনে নতুন জ্ঞান, নতুন ভাব-ভাবনা, নতুন চিন্তার যে আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছিলেন, সেই একই কাজটি করছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। স্যার তাঁর জাদুকরি বাকভঙ্গিতে তরুণদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেন, তাদের চোখে বুনে দেন মহৎ-বৃহৎ আর সুন্দরের স্বপ্ন— বলেন মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। স্যার হয়ে ওঠেন আমাদের স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নের ঝুলি থেকে কণামাত্র স্বপ্নের ঝিলিক একবার যে দেখতে পেয়েছে, প্রাণে যার একবার আগুন জ্বলেছে, নিজেই সে হয়ে উঠতে পারে নিজের প্রদীপ।

স্যার আমাদের সপ্রাণ 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি'। রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাংলার রেনেসাঁসের যে ধারা এখনো বয়ে চলেছে, সেই উজ্জ্বল মশালটি ক্লান্তিহীন ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছেন স্যার। রেনেসাঁসের ধারাটি ব্যক্তিগত বা সীমিত পরিসরে ধরে রেখেছেন অনেক মহাজন। তবে, এ ধারার সবচেয়ে বেগবান স্রোতটির নাম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

২০১৪

মাহমুদ হাশিম : সাংবাদিক; বার্তা সম্পাদক, দেশ টিভি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজীব সরকার

আলোর পথযাত্রী

'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোলকে কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দকে লাইব্রেরির সঙ্গে তুলনা করা যাইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।' বইয়ের কী অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ! কারণ বই মানে শুধু তথ্য বা তত্ত্ব নয়। বই মানে স্বপ্ন, জীবনবোধ, প্রজ্ঞা; বই মানে স্ফুরণ, উন্মোচন, বৃদ্ধি, জ্বলে ওঠা। বইয়ের বহুমাত্রিকতাকে এ যুগে উপলব্ধি করেছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তাঁর কর্মতৎপরতায় বাংলাদেশের লক্ষাধিক কিশোর-কিশোরী বাংলা সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলোর সঙ্গে একাত্ম। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, ক্ষুদ্র মানুষ দিয়ে বড় জাতি তৈরি হয় না। ক্ষুদ্র মানুষ বড় হয়ে ওঠে বৃহৎ স্বপ্ন ও মূল্যবোধের সংস্পর্শে। বই ছাড়া এমন অমূল্য পরশপাথর আর কী হতে পারে। 'আলোকিত মানুষ'ই যে পারে সম্পন্ন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে, তাঁর এমন আকাঙ্ক্ষা শূন্যগর্ভ নয়। তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে মতভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু রোগ নির্ণয়ে তিনি যে অব্যর্থ, তা অস্বীকার করবে কে? দুর্নীতি, ত্রাস, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা যেগুলোর উগ্র বহিঃপ্রকাশে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে বাংলাদেশ; এর মূলে রয়েছে মূল্যবোধের সংকট, নৈতিকতার অভাব। এই ব্যাধিগুলো দূর করে যথার্থ আলোকিত মানুষ গড়ার দায়িত্ব নিয়েছিল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ৩০ বছর আগে। কালের ব্যবধানে সেই প্রয়াস শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও অর্জন করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মযোগী ও স্বপ্নচারী সায়ীদ স্যার আজ ৭০ বছরে পদার্পণ করেছেন। ১৯৪০ সালের ২৫ জুলাই কলকাতায় তাঁর জন্ম। ভাবতে ভালোবাসেন— জন্মের দুই বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছাকাছি কোথাও ছিলেন। শারীরিকভাবে মানুষ একবার জন্মায়, কিন্তু মানসিকভাবে পুনর্জন্ম সম্ভব বলেই শিক্ষিত মানুষকে দ্বিজ বলা হয়। সায়ীদ স্যার দুইবার নয়, আরও বেশিবার জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর কর্মতালিকার দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। ষাটের দশকে তাঁর সম্পাদকীয় নেতৃত্বে ত্রৈমাসিক *কণ্ঠস্বর* গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে আমাদের সাহিত্য আন্দোলনে।

বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক *কণ্ঠস্বর*-এর সঙ্গে বেড়ে উঠেছেন। প্রায় তিন দশক অধ্যাপনা করেছেন তুমুল জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে অসাধারণ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছেন খ্যাতির শিখরে অবস্থান করে। গত তিন দশকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো অনন্য প্রতিষ্ঠানকে। পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা থেকে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত কাজগুলোর যে কোনো একটিই একজন মানুষকে অমরত্বের স্বাদ দিতে সক্ষম। কিন্তু সায়ীদ স্যার ভিন্ন ধাতুতে গড়া মানুষ। সাফল্যে নয়, তাঁর আস্থা সার্থকতায়। একজন সফল সম্পাদক, খ্যাতিমান অধ্যাপক, জনপ্রিয় উপস্থাপকের স্বীকৃতি তাঁকে সন্তুষ্ট হতে দেয়নি। তিনি জীবনকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মনে মহৎ মূল্যবোধ, স্বপ্ন ও দেশপ্রেম রচনার মাধ্যমে। বাগ্মিতা তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি বিশিষ্ট দিক। এই বিশিষ্টতার মধ্যেও তিনি স্বতন্ত্র। বাগ্মী মানেই সব শ্রেণির শ্রোতার হৃদয়হরণকারী বক্তা, এমন নয়। কিন্তু আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তা-ই। আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁর কথার মুগ্ধ শ্রোতা। জনপ্রিয়তা ও মননশীলতার মেলবন্ধন কদাচিৎ ঘটে। তিনি এর উজ্জ্বল উদাহরণ। এমন বর্ণাঢ্য কর্মযজ্ঞের পরও সায়ীদ স্যার অতৃপ্ত, লেখালেখিতে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেননি বলে। ভলতেয়ারের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন, লিখিত উক্তিই বেঁচে থাকে, মুখের কথা হারিয়ে যায়। আগামী দিনগুলোতে তিনি শুধু লিখতে চান। লেখক হিসেবে তাঁর অর্জন মোটেও সামান্য নয়। *নিষ্ফলা মাঠের কৃষক, ভালোবাসার সাম্পান, বিদায়, অবন্তী! বিস্রস্ত জর্নাল, আমার উপস্থাপক জীবন* আমাদের সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কবি, অনুবাদক হিসেবেও তিনি পরিচিত। আর গদ্যের তো একটি বিশেষ স্টাইলই তিনি দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর প্রতিভা বহুতলস্পর্শী হলেও আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আসলে একজন শিক্ষক, জাত শিক্ষক। আড্ডায়, শ্রেণিকক্ষে, পাঠচক্রে, অনুষ্ঠানমঞ্চে, টেলিভিশনে তাঁর ভূমিকা

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ পর্যন্ত শিক্ষকেরই। যথার্থ গণশিক্ষক তিনি। একজন আনন্দময় মানুষ তিনি; যিনি হাসছেন, হাসাচ্ছেন। এটিই তাঁর শিক্ষারীতি। অগণিত শিক্ষার্থীর চোখে তিনি আদর্শ শিক্ষক হলেও নিজে গুরুবাদে বিশ্বাস করেন না। আমার মধ্যে এ প্রবণতা লক্ষ করেই হয়তো এক যুগ আগে একটি বই উপহার দিয়ে লিখেছিলেন বুদ্ধের অমোঘ বাণী— 'নিজেই নিজের প্রদীপ হও'। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। কেন্দ্রে এলেই যে কেউ আলোকিত মানুষ হয়ে যাবে, এমন নয়। এখানে অনুপ্রেরণা পেয়ে সবাই যদি নিজের জীবনকে উচ্চতর বিকাশের দিকে নিয়ে যায়, তবেই সম্ভব আলোকিত মানুষ হওয়া। স্যার প্রায়ই বলেন, 'যদি দারোগাও হও, ভালো দারোগা হয়ো।' তাঁর প্রিয় উপদেশ— 'বোকা হোস।' এই বোকা মানে বেকুব নয়, নিজের স্বার্থের ব্যাপারে বোকা হওয়া।

'আলোকিত মানুষ চাই' শ্লোগানের কল্যাণে অনেকের কাছে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ নিজেই আলোকিত মানুষ। মনে আছে, ১০ বছর আগে ময়মনসিংহে তাঁর যাওয়ার কথা শুনে এক সপ্রতিভ ছাত্রী বলেছিল, 'তিনি এলে তো ইলেকট্রিসিটি না থাকলেও চলে।' কথাটি আক্ষরিকভাবে সত্য না হলেও এর তাৎপর্য অন্যত্র। দেশজুড়ে যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী আলোকিত মানুষ হওয়ার স্বপ্নে নিজেকে তৈরি করেছে, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলে দেশের অন্ধকার সত্যিই কেটে যাবে। 'মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়'— এই প্রত্যয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করছেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। জন্মদিনে তাঁর প্রতি একটিই আহ্বান— 'ও আলোর পথযাত্রী, এ যে রাত্রি, এখানেই থেমো না ...।'

২০০৮

রাজীব সরকার : লেখক, সরকারি কর্মকর্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশাত মজুমদার

হি ওয়েন্ট আপ অন দ্য হিল-টপ এ্যালোন

কত আর হাঁটিবে অন্তহীন তুষারের পথে
অতিদূর ধূসর পুরাণের কালে যে-পথে
অন্নপূর্ণা, কাত্যায়নী-দুর্গা হয়ে নেমেছিল
শ্যামল-সমতলে, সিংহবাহনে;
সেই পথে আজ অসুর বধের শত কোটি বছর পর
অজস্র অসংখ্য সভ্যতা বিনষ্টির পর
কেন চলেছো উজিয়ে দেবতার পুণ্যভূমে
কী নালিশ তোমার? কী সে ব্যথায় বিদীর্ণ হয়ে
এমন বিপদের পথে চলেছো ক্লান্তিহীন ...

পর্বতারোহীদের প্রতি এ এক সাধারণ প্রশ্ন— কেন পাহাড়-চড়া? কেন মৃত্যুর এত কাছে যাওয়া? কেউ বলে, বিকজ ইট ইস দেয়ার, কারো বিজয়-দৃপ্ত উক্তি : বিকজ আই এ্যাম হিয়ার। কেউ-বা বলে, ক্লাইম্বিং ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস হাইয়েস্ট মাউন্টেইনস মেইড ওয়ান অ্যা বেটার পারসন। একই প্রশ্ন আমার নিজের কাছে নিজেরও। নির্ঘুম রাতে যখন উপলব্ধি করি তাঁবুর বাতাসে আমার ফুসফুসের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন নেই আর ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো ছটফট করতে থাকি তখন নিজের কাছে প্রশ্ন রাখি— কেন এলাম পৃথিবীর এই অন্তহীন উচ্চতায়? নিজের মধ্যেই উত্তর খুঁজতে থাকি কেন মানুষ পাহাড়ে আসে; আর কী এক ঘোরের মধ্যে চলতে থাকি পাহাড়ের পথে পথে। উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে চলি; বন্ধুর পথ খানিকটা এগিয়ে থেমে যাই, থেমে বুক ভরে শ্বাস নিই আর নিজেকে বলি : এই যে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট ছোট ঘাসেরা যেমন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে সগৌরবে, তেমন তুমিও পারবে। দৈত্যাকৃতির প্রস্তরখণ্ড অথবা বরফপিণ্ডগুলোকে স্পর্শ করে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে নিজের মধ্যে সঞ্চারিত করি। পৃথিবীর এই মৃত্যুপুরীতে মৃত্যুপথযাত্রীর মতো অক্সিজেন মুখোশ এঁটে আমার দুর্মর জীবনের লড়াই চলতে থাকে।

নিজের সাথে নিজের সংগ্রাম চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। মাঝে মাঝে মনে হয় মানুষ বুঝি তার সর্বোচ্চ সীমা পরীক্ষার জন্যই— হয় জীবন নয় মৃত্যুর— এই পরীক্ষার সামনে নিজেকে অবতীর্ণ করে। হয়তো তাই স্যার এ্যাডমন্ড হিলারি বলেছেন, ইট ইজ নট দ্য মাউন্টেইন উই কনকোয়্যার, বাট আওয়ারসেলভস। চোখের সামনে একের পর এক সহযাত্রীদের প্রস্থান; কখনো পর্বতারোহীদের রক্তাক্ত পথ মাড়িয়ে উপরে উঠে চলা, কখনো অপরাজেয় অভিযাত্রীর নিথর দেহ পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া। এ এক দুঃসহ যাত্রা! তবুও কার আকর্ষণে, কিসের নেশায় চলেছি? উচ্চতাজনিত অসুস্থতা, ইডিমা, হাইপারথারমিয়া, ফ্রস্ট বাইট, তুষারঝড়, পাথর ধসসহ বিভীষিকাময় মৃত্যু নামক সকল ভয়কে দু'পায়ে মাড়িয়ে কোথায় চলেছে তুষারপ্রেমী মানবেরা? এসব প্রতিকূলতা দেখে কখনো কখনো মনটা দমে যায়। মনে হয়, বিপদসঙ্কুল বরফাচ্ছন্ন পৃথিবী ছেড়ে মাটির পৃথিবীতে ফিরে যাই। পরক্ষণেই কোথা থেকে কেউ যেন বলে ওঠে, ম্যান ক্যান বি ডেস্ট্রয়েড বাট নট ডিফিটেড। মন্ত্রের মতো জপতে শুরু করি সেই অমোঘ বাণী। আর সমস্ত শরীর-মনে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তার শক্তি।

শ্রদ্ধেয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের মাধ্যমে পাওয়া এই মোহনীয় মন্ত্রের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে শরীর-মনের প্রতিটি কোষে। স্যার তাঁর বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের মাঝে। স্যারের এই বিশ্বাস অন্য অনেকের সাথে সাথে আমাকেও উজ্জীবিত করেছে দুর্গমতা জয় করতে। দুর্গম পথ মাড়াতে মাড়াতে কখন যে চলে আসি শীর্ষের খুব কাছে। শীর্ষ ছোঁয়ার সে কী আকুতি মানুষের! এই আকুতির পরশ লেগে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মমিরূপী প্রাণহীন মানুষগুলোর মুখমণ্ডলেও। কী আছে পৃথিবীর ওই পুণ্যভূমে? যার জন্য এত বিসর্জন, এত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার, এত এত জীবনের বলিদান! সেখানে আছে জয়ের আনন্দ, আছে আত্মোপলব্ধি; এই বিশাল প্রকৃতির কাছে মানুষ কত একা, কত ক্ষুদ্র। অথচ এই একাকিত্ব, এই ক্ষুদ্রতা নিয়েই মানুষের সে কী অহংকার; অর্থহীন প্রতিযোগিতা, হিংসা, হানাহানি আর যুদ্ধ-বিগ্রহ। সব মিথ্যা, সবই অর্থহীন। সত্য শুধু আরেকটু ভালো মানুষ হওয়া; এই ভালো মানুষ হওয়ার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে যাওয়া।

২০১৪

নিশাত মজুমদার : অভিযাত্রী, বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্টজয়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

আঁখি সিদ্দিকা

উজান স্রোতের সান্তিয়াগো

মা'য়ের আলগোছ আদরে একটু একটু করে বেড়ে ওঠা আমি'র নতুন বইয়ের ভাঁজে তখনও কল্পনার ডানা। বিভাগীয় শহর হলেও মফস্বলীয় ছায়াঘেরা পাড়া'র প্রায় বই শেষ করে তখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠা হবে আর বড় আপুদের হাতের উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের লোগোওয়ালা বই পড়তে পারব, এমনি ভাবনায় ছোট্ট আঁখি দুটির ঘুম যেন আর আসতে চাইত না। দেখতে না দেখতে প্রাইমারির চৌকাঠ পেরিয়ে হাইস্কুলের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হল, আর চোখ চকচক করে উঠল নতুন বইয়ের লোভে। তারপর পাঁচটি বছর কে পায় আমাকে। কল্পনা আর বইয়ের পাতায় পাতায় দিনলিপি লেখা দিনগুলোর সাথে জড়িয়ে গেল একটি নাম আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। দেখিনি তাকে, কেমন তিনি। কেমন মানুষ। তাঁরও কি আমার মতো পিপাসা পায়? তিনিও আমার মতো না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন? কতটা স্বপ্ন দেখলে আমার মতো এত দূরের একটি মানুষের কাছে নতুন নতুন বই পৌঁছে দেন, আর সব বইয়ে কত না মজার কথা, স্মৃতি, ভাবনা। আমার নিভৃত, খেলতে না পারার জীবন। বড় একাকী। একলা আমি কতকটা বন্ধুহীন। মা। কেবল মা বন্ধুটি তুলে দিলেন আমার হাতে বই। আর ষষ্ঠ শ্রেণিতে ত্রিশটি টাকা। বললেন, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের স্কুলসদস্য হতে। আরও বলে দিলেন, আগামী ১৫ দিন আমি বরাদ্দকৃত টিফিনের ২ টাকা পাব না। মন্দ কী! সেবা প্রকাশনীর দোকানে যে আমি লুকিয়ে ৩ টাকা করে রেখে দুটি বই নিতাম, পুরোটা চেপে গেলাম মায়ের কাছে। সাত ক্লাশে প্রথম হওয়ার জন্য পুরস্কার পেলাম 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও আমি'। পড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কাঁদি। এভাবে হয় না কি? অবিশ্বাস্য। মা বললেন, হয়। এই ঘটনা পৃথিবীতে এই প্রথম যে, কেউ বই নিয়ে আন্দোলন করেছেন, সংগঠন করেছেন। আমাদের বাড়িতে টিভি ছিল না, টিপু সুলতান দেখতে কাজলদের বাড়িতে যেতাম। শর্ত ছিল, সব পড়া রাত ৯টার মধ্যে শেষ করতে পারলেই কেবল দেখতে নিয়ে যাবে। টিপু সুলতানের ফাঁকে কোনো এক অনুষ্ঠানের অ্যাডে এক পলক দেখালেন মা, তাঁরও প্রিয় ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-কে। খেলাধুলায় না থাকলেও সৃজনশীলতা আর মননশীলতায় একটু এগিয়ে থাকা আমি স্কুলে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম পুরস্কার পেয়ে গেলাম অষ্টম শ্রেণিতে। আমার মনে পড়ে, অনেকগুলো বই নিচ্ছি আমি সেই মানুষটির কাছ থেকে— যাঁকে কেবল আমি স্বপ্নেই দেখেছি। সারা রাত ঘুম হল না। হাত-পা ঠাণ্ডা। প্রথম স্পর্শ। প্রথম এত্তোগুলো বই। আর হাত উঁচিয়ে একজন মানুষের সেই প্রদীপ উঁচিয়ে রাখার গল্প— 'তোমাদের মশালগুলো যেন পলকের জন্যেও না নেভে'। একটা আমি দশটা আমি হয়ে গেলাম। সেদিন মনে হয়েছিল, আমি কি পারব একটি মানচিত্র বদলাতে?

একজন লেখক বাবা সারাদিন লেখেন, আর ছোট্ট ছেলেটি তাঁর লেখার টেবিলের পাশে বসে খুনসুটি খেলে। বাবা দেখেন। ছেলে খেলে। বাবা কী একটা বড় কাগজে দেখেন, আবার গোল করে রেখেও দেন। তো বাবা একদিন একটি কাজে বাইরে গেছেন। আর ছেলেটি সেই গোল করে রাখা কাগজটি খেলতে খেলতে ছিঁড়ে ফেলল। বাবা ফিরে পিচ্চি ছেলেটিকে খুব বকলেন। ছেলেটি মন খারাপ করে ঘুমিয়ে পড়ল। বাবা রাগ করে আবার বাইরে গেলেন। ছেলেটি ঘুম ভেঙে কাগজটি জোড়া লাগানোর চেষ্টা করল। বাবা ফিরে এলে ছেলেটি কাগজটি বাবার হাতে তুলে দিল। বাবা তো অবাক। কী করে সম্ভব হল, এই দুঃসাধ্য কাজটি। এ তো বাংলাদেশের মানচিত্র! এতটুকু ছেলে মানচিত্রের কোথায় কী, কী করে বুঝল? ছেলেটিকে ঝাঁকিয়ে বাবা জানতে চাইলেন, ছেলেটি মানচিত্রের উলটো পাশ ঘুরিয়ে দেখাল, উলটো পাশে একটি মানুষের ছবি ছিল, মানুষ তো ছেলেটি রোজ দেখে, কোথায় নাক, কোথায় চোখ, কোথায় পা, কোথায় হাত। সেগুলো একপাশে জোড়া লাগিয়েছে, অন্যপাশের মানচিত্রটি জোড়া লেগেছে। কী আশ্চর্য! একটি মানুষ তৈরিতে একটি মানচিত্র তৈরি হয়ে গেল।

সেই স্কুলমাঠে প্রায় হা হয়ে এই গল্প শুনতে শুনতে আমি সত্যি স্বপ্নের সমান বড় হয়ে উঠলাম। তারপর আর দেখা হয়নি, আর শুনিনি সেই মন্ত্রমুগ্ধ কথা, কেবল পড়ে যাওয়া। জীবন অনেক দূর এগিয়ে গেলেও, নিজেকে চেনা, জানা, বোঝা অনেকটা হলেও নিজের বোধের মুখোমুখি কোথায় যেন তৃষ্ণায় গলা বুজে আসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইত। চিন্তার জানালাগুলো ততোদিনে মরিচা ধরার জোগাড় হয়ে যাওয়ার পথে। ছুটছি কেবল। বাঁচতে হবে। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ডানাভাঙা পাখির মতো ছটফটে আমি তখন অফিস ডেস্কে লুকিয়ে পত্রিকা পড়তে পড়তে চোখ আটকে গেল সাদাকালো বিজ্ঞাপনে। পাঠচক্র-২০০৮ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। আর দেরি নয়, মরচেগুলো ঘষে ওঠাবার শিরিষকাগজ পেয়ে গেলাম যেন। ছুটে গেলাম। সাক্ষাৎকারে মাহমুদ হাশিম নামের একজন সমন্বয়কারী আর সেই মানুষটি সামনে। স্পষ্ট মনে আছে সেই দিনক্ষণ। অফিস ঠিকানায় আমার টিকে যাবার চিঠিও গেল বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের গোছানো সুন্দর ছোট্ট খামে। আর এক স্বপ্নরাজ্যে ঢুকে পড়লাম। স্বপ্ন আমাকে নতুন করে স্বপ্ন দেখাল যেন। নিরবচ্ছিন্ন বন্ধুত্ব। ভালোবাসা। আর সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা প্রিয় মানুষটির প্রায় রোজ কথা শোনা। ক্লাসের বাইরেও পেলাম তাঁর অপার স্নেহের ছায়া। ছায়াবৃক্ষ মানুষটি আলী বাবা চল্লিশ চোরের সেই চিচিংফাক গল্পের মতো একটি জগৎ আমার সামনে খুলে দিলেন। শক্তিশালী সেই দৈত্যটি যেমন একটি ঘড়ায় আটকে ছিল আর জেলে তার ঘড়ার মুখটি খুলে দিল আর সে বের হয়ে নিজের বড়ত্ব দাবি করে বাইরের আলোয় নিজেকে মুক্ত করল। তেমনি স্যার যেন সেই জেলের মতো আমার মনের ঘড়ার দরজাটি আলগোছে খুলে দিলেন। এল বন্ধুত্বের হাওয়া। এল নানান বইয়ের চিন্তার আদান-প্রদান। যে বইগুলো আমি একভাবে ভাবতাম আর সেই একই বই অন্যজন অন্যভাবে ভাবছে। গন্তব্যহীন সেই জগতে আমার কেবল একদঙ্গল বন্ধু নিয়ে ছুটে চলার বন্ধু হল। আজ এখানে তো কাল সেখানে। বিষণ্নতা হৈ হৈ করে বেরিয়ে গেল, হতাশারা গাল ফুলিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ভাগল। আমি হয়ে উঠলাম একজন পাগল। স্যার উপাধি দিলেন 'শ্রেষ্ঠ পাগল'। আর বন্ধুরাও তাতে সায় দিল। *দি ওল্ড ম্যান এন্ড দি সি* পড়ার সময় সেই বৃদ্ধ 'সান্তিয়াগো'র চরিত্রে যেন আমি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-কে দেখতে পেলাম।

অতিরিক্ত কবিতা পাঠের দ্বারা বিনষ্ট মানুষটি মাত্র ৩৫ টাকা নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁরই বন্ধুপ্রতিমের বাড়িতে গিয়ে ছাগলের রুমে ঘুমিয়েছিলেন, আর সারা দেশ হেঁটে, কখনো সাইকেলে চেপে, কখনও ট্রেনে, কখনও গাড়িতে, যখন খোঁজ পেয়েছেন কেউ তাঁকে সহযোগিতা করতে চাইছে চলে গেছেন সেইখানে, একা। যুগের দাবির উত্তর দিতে গিয়ে সমুদ্রসমান বা তার চাইতেও বেশি নিগ্রহতার শিকার হতে হয়েছিল তাকে। সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে বাঙালির যেমন চলছিল ধর্মের যুগ, উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত যেমন চলছিল কবিতার যুগ, সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত যেমন

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল আমাদের জাতীয়তাবোধের যুগ, তেমনি একাত্তরের পর থেকে আমাদের চলছিল সংগঠনের যুগ। সেই যুগের দাবিতেই পুরো একটা আস্ত যৌবন থেকে আজ পর্যন্ত লড়াই করে চলছেন এই অভাগা দুর্বল স্বাস্থ্যের বাঙালির জন্য, এই মানুষটি। স্বয়ম্ভু ঈশ্বরের মতো জাগিয়ে রেখেছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। জাতীয় সমৃদ্ধের কুচকাওয়াজে তাই এই দুর্বল জাতি আজ পা মিলিয়ে হাঁটছে। নানান টানাপড়েনের স্রোতে নিজেকে বইয়ে না দিয়ে তার বিপরীতে হাল ধরে টেনে নিয়ে গেছেন গুনটি। আজও তাঁর শক্ত হাতটি উষ্ণতা দেয় স্বপ্ন-পিপাসু, স্বপ্ন ভেঙেপড়া সকল মানুষকে। নিষ্ফলা নয়, সুফলা এক মাঠের সন্ধান দিতে চান রোজদিন এই কৃষক সান্তিয়াগো। বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য, দীপান্বিত এক শিল্পরূপ তাঁর তিল তিল করে গড়ে তোলা এই সংগঠন। চারিদিকে ছোঁক ছোঁক স্বার্থলিপ্সু অসুস্থ মানুষের ভিড়ে বনলতার মতো দুদণ্ড শান্তি যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে। তার আগে কবি মানেই আমার কাছে স্বপ্নচারী পুরুষ বা নারী। কবিরা অন্য কেউ। ঠিক বুঝি মানুষ না বা অন্যরকম মানুষ। একটু বোকা থাকার কারণেই বোধহয় ভাবনাগুলো ছিল খ্যাপাটে। সেই কবি পড়ে গেলেন, বলে গেলেন তাঁর কবিতার কথা। রাত যে গড়াতে গড়াতে মধ্যরাতে ঠেকছে হুঁশ নেই কারও। না শ্রোতার, না কবির। সেই শুভক্ষণে তাঁর শব্দাবলির একখানি দলিল তাঁর স্বহস্তে লিখিত স্বাক্ষর নিয়ে আমার দুহাতের ফাঁকে এসে পড়ল ...

ঝলমল করে উঠল—

...আমার রক্তের মধ্যে
বাঙলার নাগেশ্বর নিয়েছে জন্ম;
চোখ বুজে কান পেতে আমি তাঁর পাতার শব্দ শুনি; বুঝি
হাওয়ার আদরে তারা নড়ে চড়ে;
বুনো নাকে সে গাছের ফুলেদের ঘ্রাণ পাই;
সে ফুলেরা আমার কবিতা।

শব্দাবলির দলিল *মৃত্যুময় ও চিরহরিৎ* হাতে যে সাবলীল হেসে যাচ্ছিল শিশুর মতো আকণ্ঠ আর কবিতায় গলা কাঁপছিল যেন এইমাত্র কবিতায় চুবিয়ে আনা কোনো এক রাজপুত্র।

লোকটাকে অনেকদিন দেখেছি জনাকীর্ণ রাস্তা—
তার সেই একাকী সাইকেল।

ক্ষিপ্ত বেড়ালের মতো বেরিয়ে যায় তার সেই
আশ্চর্য সাইকেল।
স্বপ্নের মধ্যেও রক্তের ভেতর শুনি তার সেই উল্লসিত সাইকেলের
বিরতিহীন মুখর শব্দ।
অনুভব করি দুটো লম্বাটে ঝুলন্ত ক্লান্ত পা
নিদ্রাহারা।

(আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ)

আশ্চর্য সাইকেলে চড়ে চলে এলেন আমাদের উজান স্রোতের সান্তিয়াগো পৃথিবীর বিশাল গ্লোবটার বুকের উপর। দিনরাত একই গতিতে ছুটে বেড়ালেন নিদ্রাহীন। কখনও দোয়েলের দেশে, খুব পাশে, বটপাতার আড়ালে, কখনও দূরে, বিস্রস্ত মাটিতে, নৌকার গলুইয়ে বসে অলস দুপুরে, ক্ষমাহীন ইঞ্জিনের ক্রোধ ঠেলে বেরিয়ে এলেন। আবহমান বাংলার কণ্ঠস্বরে কণ্ঠ রেখে জোর গলায় বললেন— 'জাগো বাহে, কোন্‌ঠে সবাই'। ব্যথিত সাতাশকে পেছনে ফেলে রুপোলি আকাশে পাখা মেললেন রক্তদীর্ণ শঙ্কার শিকার কবি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

অনুচ্চকিত আজন্মের আঙ্গুলের ট্রিগার ছড়িয়ে দিলেন আরও তাঁর লিখে যাওয়া বইয়ের ভাঁজে। *বিস্রস্ত জর্নালের* মমতায় জড়ালেন *ভালোবাসার সাম্পান*। *বহে জলবতী ধারা* আবার নিষ্ফল হয়নি একবারের জন্যেও *নিষ্ফল মাঠের কৃষকে*। উপস্থাপক স্যারকে আমি না চিনলেও চিনে নিলাম *আমার উপস্থাপক জীবনে*। *আমার আশাবাদে* আশা রাখলাম একজন সংগঠক বাঙালি স্যারের উত্তরসূরি হয়ে। স্যার প্রায়ই মহাভারত থেকে একটি কথার রেফারেন্স টেনে বলতেন, 'উত্তম গুরু তখনই, যখন তার শিষ্যরা তাকে ছেড়ে চলতে পারে'। খুব সাহস নিয়ে হাশিম ভাই আমাকে মনে করিয়ে দিলেন সেদিন কথায় কথায়, স্যার কি উত্তম গুরু হয়ে গেলেন, আমরা যে বড় তাকে ছাড়াই চলছি! হয়তো হাশিম ভাইয়ের কথাই ঠিক। তিনি কেবল দিয়ে চলেছেন আমাদের। রেখেছেন অতি যত্নে তার প্রতিভাময় আঙ্গুলের ছায়ায়। প্রথম সমুদ্র দেখা এই আঙ্গুল ধরে। সবাই যখন সমুদ্রে নেমে হৈহৈ করছে, আর আমি বোকাটির মতো সমুদ্রের পাশে এতটুকুন হয়ে বসে আছি, কোথা থেকে এগিয়ে গেল এই আঙ্গুলগুলো। বললেন— চল, তুমিও নামবে। আমি একজন বড় সমুদ্রের হাত ধরে বিশাল সমুদ্রের বুকে পা রাখলাম। সেই বোধ ভাষাতীত। ভাব যেখানে গভীর, ভাষা বোধহয় সেখানে অচল হয়ে পড়ে।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একইভাবে গড়গড় করে সবাই যখন পাহাড়ে উঠে যাচ্ছিল, এই মানুষটি দাঁড়িয়ে থাকলেন আমার জন্য— আমি উঠতে পারব না বলে, তখন পাংশু মুখখানি দেখে বললেন, শুরু করা যাক। প্রথম পাহাড় দেখার সাথে সেই পাহাড়ে ওঠা আজও আমায় মাথা উঁচু রাখতে শিখিয়েছে। অপূর্ব সবুজের মুগ্ধতায় আমার ভিজে যাওয়া চোখগুলো কবি বন্ধু স্যারের জন্য আরও একবার ভেসেছিল জীবনের গানে।

নিঃশব্দে বয়সের অন্ধকারে কি ক্ষয়ে যাবেন উজান স্রোতের সান্তিয়াগো? কখনোই তা হবে না। পাতারা নিঃশব্দে খসে যায়। উদ্যত বল্লমে চিরযৌবনের স্বপ্নস্নায়ু জীবনের মিছিলেই থাকবেন প্রদীপ উঁচিয়ে ...

২০১৪

আঁখি সিদ্দিকা : কবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতাউর রহমান

স্যারকে নিয়ে একপ্রস্থ

১

ফেব্রুয়ারি ২০১১। সায়ীদ স্যারের সাথে আমরা সেবার যাচ্ছিলাম বান্দরবানের নীলগিরি। উঁচু-নিচু যাত্রাপথে মিলনছড়ির একটা রেস্টুরেন্টে মধ্যাহ্নবিরতি। জম্পেশ খাওয়াদাওয়ার পর রেস্টুরেন্টের চমৎকার ঝুল-বারান্দায় তুমুল আড্ডা চলছে। সেই সাথে প্রকৃতিদর্শন। স্যারের পছন্দের গান বাজানো হয়েছে। দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে—*আকাশ ভরা সূর্য তারা...*। স্মৃতিকাতর হয়ে স্যার নিজেই কিছুক্ষণ গলা মেলালেন। সবমিলিয়ে দারুণ এক পরিবেশ।

এর মধ্যে স্যারকে দেখে এগিয়ে এলেন এক লোক। বেশভূষা আর কথাবার্তায় নিতান্তই সাধারণ। কথায় কথায় জানা গেল, অনেক বছর ধরে স্যারের ভক্ত তিনি। হঠাৎ এখানে এই পরিবেশে স্যারকে কাছে পেয়ে সে কী উচ্ছ্বাস লোকটার! বার বার বলে চলেছেন—সেই কবে ছোটবেলায় স্যারের টিভি অনুষ্ঠান দেখেছেন, স্যারের বই পড়েছেন, আরও কত কী! আজ এভাবে স্যারকে এখানে পেয়ে যাবেন, তা ভাবতেও পারেননি ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকক্ষণ ধরে চলল তাঁর উচ্ছ্বাসপর্ব।

এরপর দেশের হালচাল, সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর এদেশে পর্যটনশিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে রীতিমতো জ্ঞানগর্ভ আলোচনার সূত্রপাত করলেন ওই ভদ্রলোক। মজার ব্যাপার হল, সব বিষয় নিয়ে লোকটা তাঁর মতামত দিয়েই যাচ্ছেন। থামার কোনো লক্ষণ নেই। এদিকে বেশ ধৈর্য নিয়েই তাঁর বিভিন্ন কথার উত্তর দিচ্ছেন সায়ীদ স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ থেকে পুরো ব্যাপারটি দেখছি আমরা। সবাই কিঞ্চিৎ বিরক্ত। কারো মুখে চাপা হাসি। কেউ আবার খানিকটা উস্‌খুস্‌ করতেও শুরু করেছে। এমন জমজমাট আড্ডার মধ্যে হঠাৎ এই ছন্দপতন কেন? লোকটা যাবে কখন?

যা হোক, একসময় লোকটা চলে গেল। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের হাসিটা এরপর আর চাপা থাকল না। আড্ডার আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল লোকটার এমন ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাস। এ নিয়ে আমাদের যাবতীয় হাসি আর মন্তব্য স্যার নীরবে শুনলেন। আমরা একটু চুপ করলে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে স্যার কেবল একটা কথাই বললেন— 'তোমরা মানুষের স্মার্টনেস আর মস্তিষ্কটা দেখ, আমি দেখি তার হৃদয়টা'।

২

বছর দুই আগে স্যারের সাথে শান্তিনিকেতন আর ওডিশা গিয়েছিলাম। ঢাকা থেকে যেদিন যাত্রা করছি সারা বাংলাদেশ যেন সেদিন ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল একটা চিনচিনে কষ্টের অনুভূতি নিয়ে। আগের দিন (২২ মার্চ, ২০১২) এশিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনালে বাংলাদেশ খুব অল্পের জন্যে হেরে গেছে পাকিস্তানের কাছে। হাতছাড়া হয়ে গেছে এশিয়া কাপে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ।

সকাল আটটার বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন ধরতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে জড় হয়েছে সবাই। কথাবার্তার শুরুতেই আগের দিনের খেলার প্রসঙ্গটি উঠল। আমরা হৈ হৈ করে উঠলাম। আগের রাত থেকে সকাল অবধি জমে থাকা সমস্ত আক্ষেপ ঝাড়তে শুরু করল সবাই। কী করলে, কীভাবে খেললে এমন কষ্টদায়ক হারটা ঠেকানো যেত তার হরেক রকম ফিরিস্তি।

সকাল থেকেই খেয়াল করছিলাম স্যার খানিকটা বিষণ্ন। আগের দিনের খেলার ফলাফলই এর কারণ কি না জানতে চাইলাম। স্যার বললেন, 'বাংলাদেশ যে কাল হেরে গেল কিংবা এত অল্পের জন্যে চ্যাম্পিয়ন হতে পারল না, সেজন্যে কষ্ট পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমার আসল দুঃখটা অন্যখানে। অমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ খেলাটাতে বাংলাদেশ যদি কাল শেষপর্যন্ত জিততে পারত তাহলে শিশু-কিশোর-তরুণ-বৃদ্ধসহ দেশের সব মানুষের ভেতরে সর্বোপরি সারা জাতির মধ্যে এক ঝটকায় একটা শক্তি, আত্মবিশ্বাস আর কর্মোদ্যম চলে আসত, অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও দেশের প্রত্যেকটা মানুষ যার যার অবস্থান থেকে শক্তিমান হয়ে উঠত, নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার একটা সাহস অনুভব করত। কাল বাংলাদেশ না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেতার ফলে সে উপলক্ষটা আমরা হারালাম, আমার দুঃখটা সেখানেই। কাল রাত থেকেই এজন্যে আমার ভেতরটা বেশ ভারি হয়ে আছে।'

চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। একই ঘটনায় আমরা সবাই যার যার ব্যক্তিগত আক্ষেপের কথা বিরতিহীন বলে যাচ্ছি; আর স্যার পুরো বিষয়টা দেখেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে। বুঝলাম, স্যারের মতো মানুষদের সাথে আমাদের পার্থক্যটা প্রতিভা কিংবা পারিপার্শ্বিকতায় ততটা নয়; পার্থক্যটা বোধ করি আরও মৌলিক জায়গায়—সম্পন্ন জীবনদৃষ্টিতে আর চিন্তাশক্তির উচ্চতায়।

৩

একটা কথা স্যার প্রায়ই বলেন। বক্তৃতায় বলেন, ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেন—'পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই জয় চায়, এই নিদ্রাহীন চাওয়াটা অধিকাংশ সময়ই জীবনে যন্ত্রণা বাড়ায়। তাই জয় চেয়ো না, সবসময় আনন্দ চেয়ো। যে কাজটা করছ, আনন্দ নিয়ে করো। জয়ের পেছনে নয়, আনন্দের পেছনে ছোটো।'

স্যার, কথাটা সত্যিই আপনার মুখেই মানায়। একটা আনন্দময় কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়েই তো আপনি পার করে দিলেন জীবনের ছয় যুগেরও বেশি সময়। পূর্ণ করলেন আপনার ৭৫তম জন্মবার্ষিকী।

আজ ২৫ জুলাই। আপনার ৭৬তম জন্মদিনে প্রত্যাশা করি, আনন্দের ফল্গুধারায় আরো কর্মচঞ্চল আর গতিময় হয়ে উঠুন আপনি।

২৫ জুলাই ২০১৪

আতাউর রহমান : চিকিৎসক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি

জীবনপঞ্জি

১৯৪০ ২৫ জুলাই : জন্ম। পিতা : আযীমউদ্দীন আহমদ তখন করটিয়া কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক।
মা : বেগম করিমউন্নিসা। জন্মস্থান : কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায়, মাতুলালয়ে। জন্মের কিছুকাল পরেই পিতার কর্মস্থল টাঙ্গাইল জেলার করটিয়ায় গমন।

১৯৪৫ করটিয়ায় স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি। মায়ের মৃত্যু।

১৯৪৬ করটিয়া ত্যাগ। পিতার নতুন কর্মস্থল জামালপুরে গমন। জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন পিতা আযীমউদ্দীন আহমদ। জামালপুর গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি।

১৯৪৮ জামালপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। বছরের শেষের দিকে পিতার কর্মস্থল পাবনায় গমন। সে বছর পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ হন তাঁর পিতা।

১৯৪৯ পাবনার রাধানগর মজুমদার একাডেমিতে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি। এই স্কুলে পড়বার সময় স্কাউটিঙে যোগদান।

১৯৫২ রাধানগর মজুমদার একাডেমির অষ্টম শ্রেণির ছাত্র।

১৯৫৩ পাবনা জিলা স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র।

১৯৫৪ ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্র হিসেবে কয়েক মাস অধ্যয়ন ও পুনরায় পাবনায় প্রত্যাবর্তন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৫৫ পাবনা জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ।

১৯৫৭ বাগেরহাট প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ।

১৯৫৮ ভাষা আন্দোলনের অভিঘাতে উদ্দীপ্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ। সাহিত্য প্রতিযোগিতায় তিনটি হলে চ্যাম্পিয়ন। আবৃত্তিকার হিসেবে খ্যাতিলাভ।

১৯৬০ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বাংলাভাষা ও সাহিত্য নিয়ে লেখাপড়া করলেও নিবিড়ভাবে ইংরেজি সাহিত্যও পাঠ করেছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে।

১৯৬১ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ওই বছরই রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ। তাঁর ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুর উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উৎসবে বিচারপতি এম মোরশেদ সভাপতি এবং অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ সাধারণ সম্পাদক হতে সম্মত হয়েছিলেন।

১৯৬১ সেপ্টেম্বর : এমএ পরীক্ষা হবার পরপরই মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজে শিক্ষকতায় যোগদান। কয়েক মাস পর সিলেট মহিলা কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগদান।

১৯৬২ ১ এপ্রিল : রাজশাহী সরকারি কলেজে প্রভাষক পদে যোগদান। ঢাকা ইন্টারমিডেয়েট টেকনিক্যাল কলেজে বদলি।

১৯৬৩ ৫ ও ৬ আগস্ট আগের বছরের শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে পুরস্কৃত প্রাবন্ধিক-নাট্যকার আবদুল হকের *ফেরদৌসী* নাটকের নামভূমিকায় মঞ্চে অভিনয়। ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব লাভ।

ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্থাপত্য বিভাগের খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন। উভয় পদেই প্রায় দুই বছর এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৬৫ *কণ্ঠস্বর* পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত। ষাটের দশকে যে সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে তা যথার্থই বেগবান হয়। তরুণ প্রতিষ্ঠাকামী লেখকমাত্রেরই আরব্ধ হয়ে উঠেছিল পত্রিকাটি। সত্তরের দশক পর্যন্ত প্রধানত তাঁর নিজের লেখালেখিও চলেছিল এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই।

ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের এক অনুষ্ঠানে কবি জসীমউদ্‌দীন-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে টেলিভিশন অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ততার সূচনা।

১৯৬৫ ৫ সেপ্টেম্বর : রওশন আরা (বেগম) সায়ীদের সঙ্গে বিবাহ।

১৯৬৭ ৫ ফেব্রুয়ারি : কনিষ্ঠ অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা কলেজে বদলি। সেখানে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত একটানা কর্মরত। বড় মেয়ে লুনা সায়ীদের জন্ম।

১৯৬৯ ২৯ জুন : *কণ্ঠস্বর* পত্রিকার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন। মুনীর চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় মুনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌধুরীর প্রদত্ত ভাষণটি ক্যাসেটে ধারণ করা হয়েছিল এবং পরে তা হুবহু মুদ্রিতও হয়েছিল।

আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্পগ্রন্থ *সত্যের মতো বদমাশ* নিষিদ্ধ হলে তা নিয়ে আন্দোলনের সূচনা।

১৯৭১ ৩০ আগস্ট : সহকারী অধ্যাপক পদে জগন্নাথ কলেজে বদলি। দ্বিতীয় কন্যা রঞ্জনা সায়ীদের জন্ম।

১৯৭২ *সত্যের মতো বদমাশ* বইটির প্রকাশ্য বিপণন শুরুর নেতৃত্ব দান।

ঢাকা কলেজে প্রত্যাবর্তন। ১৯৯২ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এখানে কর্মরত।

১৯৭৩ বাংলাদেশ টেলিভিশনে ধাঁধার আসর *হারজিত* অনুষ্ঠান উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে নিয়মিত ধারাবাহিক টিভি অনুষ্ঠানের সূচনা।

১৯৭৪ *হারজিত* ডিসেম্বর পর্যন্ত সিরিজ অনুষ্ঠান হিসেবে টেলিভিশনে প্রচার।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে তৃপ্তি মিত্র ও শাঁওলী মিত্রের ছিয়াত্তর মিনিটব্যাপী সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে আলোড়ন সৃষ্টি।

১৯৭৫ টেলিভিশনের জনপ্রিয় সিরিজ অনুষ্ঠান সাপ্তাহিক *সপ্তবর্ণা*-র সূচনা। সূচনায় অনুষ্ঠানটির ব্যাপ্তিকাল ছিল এক ঘণ্টা। *সপ্তবর্ণা* অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তিকাল ৭৫ মিনিটে বৃদ্ধি। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে টেলিভিশনে বিনোদনমূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ধারণার জন্ম।

১৯৭৬ বারো বছর সম্পাদনার পর *কণ্ঠস্বর* পত্রিকা বন্ধ ঘোষণা।

সপ্তবর্ণা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা।

১৯৭৭ জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কার লাভ।

অস্ট্রেলিয়া সরকারের আমন্ত্রণে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন টিভি চ্যানেল দেখার জন্য অস্ট্রেলিয়া সফর।

কমনওয়েলথ কর্মসূচির আওতায় মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফর।

১৯৭৮ সিরিজ অনুষ্ঠান *আনন্দমেলা* ঈদের অনুষ্ঠান হিসেবে রূপান্তরিত। কয়েক বছর ধরে এই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা।

পাঠচক্র হিসেবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সূচনা। তখনও নাম ঠিক হয়নি।

বছরের শেষের দিকে টেলিভিশনের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান *চতুরঙ্গ* শুরু।

১৯৭৯ বছরের শেষের দিকে *চতুরঙ্গ* শেষ।

১৯৮১ বাংলাদেশ টেলিভিশনে *মানচিত্র* নামে শিক্ষামূলক বিনোদনধর্মী অনুষ্ঠান উপস্থাপনা।

কণ্ঠস্বর পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ। *মানচিত্র* অনুষ্ঠানের সমাপ্তি।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র নামকরণ চূড়ান্ত এবং ট্রাস্ট ডিড রেজিস্ট্রি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮২ ঈদের আনন্দমেলা উপস্থাপনা।

১৯৮৭ যুক্তরাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় ইংল্যান্ড গমন। সেইসঙ্গে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ সফর।

১৯৮৯ বাংলাদেশ টেলিভিশনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান *সুবর্ণধারা* উপস্থাপনা।

১৯৯২ ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান থাকাকালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ।

১৯৯৪ সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ১৯৯৪ সালের ক্যালেন্ডারে বাংলাদেশের প্রধান ছয়জন সংগঠকের একজন হিসেবে স্থান লাভ।

১৯৯৫ ইউনেস্কোর আমন্ত্রণে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান। *চারুপাঠ* নামে শিক্ষাধর্মী বিনোদনমূলক টেলিভিশন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা।

১৯৯৮ কাজী জেবুন্নেসা-মাহবুব উল্লাহ ট্রাস্ট পুরস্কার লাভ।
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তাঁর উদ্যোগে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কর্মসূচি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরির সূচনা।

১৯৯৯ রোটারি সিড পুরস্কার লাভ। ইটালি ভ্রমণ। আমেরিকা-প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন 'অবাক'-এর আমন্ত্রণে দু-শ বছরের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতাদানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন। টেকসাসের রাজধানী ডালাস শহরে এই বক্তৃতাটি প্রদত্ত। একই সঙ্গে ন্যুইয়র্ক ভ্রমণ।

২০০০ পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ততা। ডেঙ্গু প্রতিরোধ আন্দোলনের সূচনা ও নেতৃত্ব দান। বুড়িগঙ্গা উদ্ধার, আশুলিয়ায় পরিবেশ রক্ষা ও বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শাখা খোলার জন্য যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ।
বাংলাদেশ বুকক্লাব পুরস্কার লাভ।

২০০১ এম এ হক ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।

২০০৩ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সফর।

২০০৪ জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর। এশিয়ার নোবেল খ্যাত আন্তর্জাতিক পুরস্কার 'র‍্যামন ম্যাগসাইসাই' লাভ। পুরস্কার গ্রহণের জন্য ফিলিপিনস গমন।

২০০৫ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কাজে ইংল্যান্ড গমন। একুশে পদকে ভূষিত।

২০০৬ ডা. ইব্রাহীম স্মৃতি স্বর্ণপদকে ভূষিত। শেলটেক পদক লাভ।

২০০৮ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ। পুরস্কার নিয়ে সুইজারল্যান্ড থেকে ফেরার পথে চেক প্রজাতন্ত্র ও মিশর ভ্রমণ। একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে জার্মানি গমন।
র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কারপ্রাপ্তদের নিয়ে আয়োজিত একটি পুনর্মিলনীতে অংশ নিতে লাওস ভ্রমণ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কাজে যুক্তরাজ্য গমন। বেলজিয়াম ভ্রমণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতিরঝিল রক্ষা আন্দোলন। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পরামর্শক কমিটির সভাপতি নির্বাচিত।

২০০৯ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় পরিবেশ পদকে ভূষিত। মার্কেন্টাইল ব্যাংক স্বর্ণপদক লাভ।

২০১০ চ্যানেল আই-আনন্দ আলো স্বর্ণপদকে ভূষিত।

২০১১ সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক স্বর্ণপদক ও কাজী আজহারুল ইসলাম স্বর্ণপদকে ভূষিত।

২০১২ বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ। জর্ডান ভ্রমণ।

২০১৪ একশন এইড বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের চেয়ারপারসন হিসেবে নেদারল্যান্ডস ও ইংল্যান্ড গমন। অস্ট্রেলিয়া ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থপঞ্জি

স্মৃতিমূলক/ আত্মজীবনী

বিদায়, অবন্তী ॥ প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫। প্রকাশক : পার্ল পাবলিকেশন্স। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ৬৭। মূল্য : ৪৫ টাকা। উৎসর্গ : লুনাকে, আব্বু।

নিষ্ফলা মাঠের কৃষক ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ১৯৯৯। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। পৃষ্ঠা : .২৩৮। মূল্য : ১৬০ টাকা। উৎসর্গ : খুব ছেলেবেলায় হারানো মা করিমউন্নিসা বেগম, মৃত্যু-পূর্ব দিনগুলোয় সন্তানদের ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তায় যাঁর আতঙ্কগ্রস্ত মুখ এখনো চোখের সামনে ভাসে।

ভালোবাসার সাম্পান ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০২। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। পৃষ্ঠা: ২৮৭। মূল্য : ২৫০ টাকা। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। উৎসর্গ : আবদুল মান্নান সৈয়দ।

রৌদ্র ও প্রকৃতির কাব্য ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০২, দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ১২০। মূল্য : ১৫০ টাকা। উৎসর্গ : কবি নির্মলেন্দু গুণ প্রিয়বরেষু।

বহে জলবতী ধারা (প্রথম খণ্ড : ছেলেবেলা) ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩। প্রকাশক : সময় প্রকাশন। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। পৃষ্ঠা : ২২১। মূল্য : ১৭৫ টাকা। উৎসর্গ : ছেলেবেলায় হারানো মা বেগম করিমউন্নিসা, আমার সারা জীবনের কষ্ট।

আমার উপস্থাপক জীবন ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৫, তৃতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১১। প্রকাশক : সময় প্রকাশন। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ২৫৩। মূল্য : ৩০০ টাকা। উৎসর্গ : মুস্তাফা মনোয়ার।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও আমি ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। প্রচ্ছদ : দীপক রায়ের স্কেচ অবলম্বনে ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ২৮৮। মূল্য : ৩৫০ টাকা। উৎসর্গ : দুঃখযাত্রার সহযাত্রীদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বোকা শৈশব (আত্মজীবনী : কিশোর সংকলন)। প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০, চতুর্থ মুদ্রণ : জুন ২০১৪। প্রকাশক : সময় প্রকাশন। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ১২৫। মূল্য : ১৫০ টাকা। উৎসর্গ : ছেলেবেলায় হারানো মা বেগম করিমউন্নিসা, আমার সারা জীবনের কষ্ট।

বহে জলবতী ধারা (আত্মজীবনী ২য় খণ্ড : তারুণ্য থেকে যৌবন) ॥ প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১১। প্রকাশক : সময় প্রকাশন। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ১৩৫। মূল্য : ১৭৫ টাকা। উৎসর্গ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপক, সচেতন জীবন রসিক ও চিত্তহারী বক্তা ড. আমিনুল ইসলাম প্রিয়বরেষু।

প্রবন্ধ

দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রবন্ধ ॥ প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৭৬। প্রকাশক : মুক্তধারা। প্রচ্ছদ : সৈয়দ ইকবাল। মূল্য : ৬ টাকা। পৃষ্ঠা : ৮৯। উৎসর্গ : মামা ড. ফৈয়াজ হোসেন খান। দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, স্টুডেন্ট ওয়েজ। প্রচ্ছদ : সৈয়দ ইকবাল। মূল্য : ৪০ টাকা। উৎসর্গ : বাংলাদেশে ভূতাত্ত্বিক জরিপের পথিকৃৎ এবং অবিস্মরণীয় গ্রন্থ *জিওলজি অফ বাংলাদেশ*-এর প্রণেতা, মামা ড. ফৈয়াজ হোসেন খান, যাঁর কাছে ঋণ অপরিসীম।

উত্তর প্রজন্ম ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২। প্রকাশক : শিল্পতরু প্রকাশনী। প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল। মূল্য : ৬০ টাকা। উৎসর্গ : রোশনা, নিঃশব্দে সহ্য করে সারাজীবন, যে সবচেয়ে সহযোগিতা করেছে।

বন্ধ দরোজায় ধাক্কা ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০০। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ১০১। মূল্য : ১০০ টাকা। উৎসর্গ : আবেদ খান, যাঁর সৎ ও সাহসী সাংবাদিকতার প্রতি আমি সশ্রদ্ধ।
নিউইয়র্কের আড্ডায় ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০১। প্রকাশক : সুবর্ণ। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ১২৮। মূল্য : ১০০ টাকা। উৎসর্গ : অনুজপ্রতিম আনিসুল হক, কবি, কথাসাহিত্যিক ও গদ্যকার্টুন শিল্পী।

সংগঠন ও বাঙালি ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩। প্রকাশক : দিব্যপ্রকাশ। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। দ্বিতীয় সংস্করণ : মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১০। পৃষ্ঠা : ৮০। মূল্য : ১৬০ টাকা। উৎসর্গ : *প্রথম আলো*-র সম্পাদক মতিউর রহমান, যাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা আমাকে প্রজ্বলিত করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও ~ www.amarboi.com ~

অপ্রস্তুত কলাম ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮। প্রকাশক : সময় প্রকাশন। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ১০৩ । মূল্য : ১০০ টাকা। উৎসর্গ : অনুজপ্রতিম বন্ধু ও প্রতিভাবান ফটোগ্রাফার এম এ তাহের, প্রতিমুহূর্তে যার উৎকণ্ঠিত শুভেচ্ছা জীবনের চারপাশে অনুভব করি।

আমার আশাবাদ ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯, তৃতীয় মুদ্রণ : জুলাই ২০১৩। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ১৪৮। মূল্য : ২৫০ টাকা। উৎসর্গ: *দ্য ডেইলি স্টার*-এর সম্পাদক অনুজপ্রতিম মাহফুজ আনাম, বাংলাদেশের ভবিষ্যতের ব্যাপারে যার আশাবাদ দুর্জয়।

গণতন্ত্র ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৪। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ৫৫ । মূল্য: ১০০ টাকা। উৎসর্গ : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের কর্মী আলাউদ্দিন সরকার, আমার বইগুলো প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে যার অবদান সবচেয়ে বেশি।

গল্প

রোদনরূপসী ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। প্রকাশক : বর্ণায়ন, পরিবেশক : পার্ল পাবলিকেশন্স। প্রচ্ছদ : সৈয়দ ইকবাল। পৃষ্ঠা : ৮৪। মূল্য : পঞ্চান্ন টাকা।

খর যৌবনের বন্দি ॥ প্রথম প্রকাশ : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮। প্রকাশক : পার্ল পাবলিকেশন্স। পৃষ্ঠা : ৯৫। মূল্য : ৬০ টাকা। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। উৎসর্গ : সপ্রতিভ টিভি ব্যক্তিত্ব আনিসুল হক ও তাঁর ঘরে-বাইরের সমপ্রভ সহধর্মিণী রুবানা-কে।

নদী ও চাষীর গল্প ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুলাই ২০১৩। প্রকাশক : সময় প্রকাশন। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা ৮৮। মূল্য : ১০০ টাকা। উৎসর্গ : অনবদ্য গল্পকার, পরিশীলিত প্রাবন্ধিক এবং রমণীয় রচনার শিল্পী আবদুশ শাকুর, যাঁর নিদ্রাহীন শিল্পোন্মাদনা আমার বিস্ময়।

কবিতা

মৃত্যুময় ও চিরহরিৎ ॥ প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮৮। প্রকাশক : ঋদ্ধি। প্রচ্ছদ : সৈয়দ ইকবাল। দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মূল্য : ১০০ টাকা। উৎসর্গ : আব্বা, আমারই মতন একজন অখ্যাত কবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাটক

যুদ্ধযাত্রা ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেরুয়ারি ১৯৯৭। প্রকাশক : কৃষ্টি প্রকাশ। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মূল্য : ৪৫ টাকা। পৃষ্ঠা : ৬৩। উৎসর্গ : আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর *কবিতা কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড* কাব্যগ্রন্থে আমার অস্থিরচিত্ততা ও অসহায়তার একটা প্রাণঘাতী ছবি এঁকেছিলেন। কবিতাটা এরকম :

এইবার!
এইবার আমি আমার প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছি, মান্নান!
যাদের মধ্যে জ্বলছে শিল্পের শিখা,
জিজ্ঞাসার ক্ষুধা আর স্বপ্নের অজস্র আক্রমণ!
এক জায়গায় গুছিয়ে নিয়ে বসেছি এবার।
প্রকৃত স্বস্থতা! প্রকৃতি শান্তি! প্রকৃত সমীকরণ!
ক ণ্ঠ স্ব র? টে-লি-ভি-শ-ন?—
লে-খা-লে-খি? শো-ম্যা-ন-শি-প?—
বি শ্ব সা হি ত্য কে ন্দ্র?—
ওসব অনেক হয়েছে।
তুমি তো জানোই, আমি আসলে নাট্যকার,
নাটকের রক্ত বইছে আমার শিরা উপশিরায়।
হ্যাঁ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে
একটি অলিখিত অসম্ভব নাটকের
শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিশাবে আমি শিরোপা দিতে চাই।
(আশা করি, জনাব কবীর চৌধুরী ও জনাব সাঈদ আহমদ অনুমোদন করবেন।)

সেই 'অসম্ভব' না-হলেও অলিখিত নাটকটি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের শিরোপার কোনোরকম দুরাশা না রেখে আবদুল মান্নান সৈয়দকে।

জর্নাল

বিস্রস্ত জর্নাল ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, প্রকাশক : সাহিত্য প্রকাশ। প্রচ্ছদ : রফী হক, মূল্য : ষাট টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেরুয়ারি ২০০১। পরিবর্ধিত সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪, প্রকাশক : সময় প্রকাশন। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ২০৬। মূল্য : ৩০০ টাকা। উৎসর্গ : সানজীদা আখতার, এই ছোট ছোট লেখাগুলো, যার উৎসাহের কাছে ঋণী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বক্তৃতা

রস্ট্রাম থেকে (১ম খণ্ড) ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০০। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ১৪৩। মূল্য : ১২৫ টাকা। উৎসর্গ : জয়াকে, আব্বু।

রস্ট্রাম থেকে (২য় খণ্ড) ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। প্রচ্ছদ : মানবেন্দ্র সুর। মূল্য : ৯০ টাকা।

ব্রাহ্মণের বাড়ির কাকাতুয়া (কিশোর বক্তৃতা সংগ্রহ) ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুলাই ২০১১। প্রকাশক : অনন্যা। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ১২০। মূল্য : ১৫০ টাকা। উৎসর্গ : জয়াকে—আব্বু।

স্বপ্নের সমান বড় (বক্তৃতা সংকলন) ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে ২০১৪। প্রকাশক : সময় প্রকাশন। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ৯৪। মূল্য : ১৩০ টাকা। উৎসর্গ : অনুজপ্রতিম খ্যাতিমান ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন প্রীতিভাজনেষু।

ভ্রমণকাহিনী

ওড়াওড়ির দিন (প্রথম খণ্ড : আমেরিকা)। প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১০। প্রকাশক : সময় প্রকাশন। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ১৯২। মূল্য : ২২৫ টাকা। উৎসর্গ : অনুজপ্রতিম ফরিদুর রেজা সাগর প্রীতিভাজনেষু।

সম্পাদনা

সাম্প্রতিক ধারার গল্প ॥ প্রথম সংস্করণ ১৯৬৪। প্রকাশক : সিটি লাইব্রেরি, ১৩৫, রমাকান্ত নন্দী লেন, ঢাকা। প্রচ্ছদ শিল্পী : আবদুর রৌফ। উৎসর্গ : মা'র স্মৃতিকে। সূচিপত্র : সৈয়দ শামসুল হক / রক্তগোলাপ; শওকত আলী / চৈত্র মেঘ; হুমায়ুন চৌধুরী / গ্রহণের রাত; মনিরুজ্জামান/ চানচুরা; জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত / কেষ্টযাত্রা; আবদুল মান্নান সৈয়দ / মাতৃহননের নান্দীপাঠ; আখতারুজ্জামান ইলিয়াস/ স্বগতমৃত্যুর পটভূমি; শহীদুর রহমান / বিড়াল; হাসান আজিজুল হক / বৃত্তায়ন। পৃষ্ঠা ২৫৪। মূল্য : ৫ টাকা।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ ॥ প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৬। প্রকাশক : মুক্তধারা। প্রচ্ছদ : সৈয়দ ইকবাল। পৃষ্ঠা : ২০১। মূল্য : ১৬ টাকা।

এক দশকের কবিতা ॥ প্রথম প্রকাশ : ২৫ জুলাই ১৯৭৫। প্রকাশক : নলেজ হোম। প্রচ্ছদ : সৈয়দ ইকবাল। পৃষ্ঠা : ১২৬। মূল্য : বারো টাকা

কবিতা ও অন্যান্য : খান মোহাম্মদ ফারাবী ॥ প্রথম প্রকাশ : ১৫ মে ১৯৭৬। প্রকাশক : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী। প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবিব। মূল্য : ৮ টাকা।

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতা ॥ প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৯০। দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১২। প্রকাশক : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ৬৩। মূল্য : ৮০ টাকা।

অনুবাদ

দ্যাগ হ্যামারশোল্ড ॥ মূল : হেনরি পি. ভ্যান ডুসেন। ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত। প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৬৯। প্রকাশক : নওরোজ কিতাবিস্তান। প্রচ্ছদ : কুতুব-উজ-জামান খান। মুদ্রণসংখ্যা : ২২৫০। দাম : ৫.০০। পৃষ্ঠা : ২৩৬।

শৃংখলিত প্রমিথিউস ॥ মূল : এসকিলাস। প্রথম প্রকাশ : ১৯৮২। দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১১। প্রকাশক : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। প্রচ্ছদ : ইউসুফ হাসান। পৃষ্ঠা : ৪৬। মূল্য : ৭০ টাকা। উৎসর্গ : আবদুল হাফিজ– যিনি, জানি না কেন, আমাকে লিখতে বলতেন।

সাক্ষাৎকার

মুখোমুখি ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০১। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ১৯১। মূল্য : ১৫০।

কথোপকথন ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯। প্রকাশক : অন্যপ্রকাশ। প্রচ্ছদ : মাসুম রহমান। পৃষ্ঠা : ১০৬। মূল্য : ১৫০ টাকা। উৎসর্গ : ইমদাদুল হক মিলন প্রীতিভাজনেষু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তরঙ্গ আলাপ ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১২, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০১৪। প্রকাশক : সময় প্রকাশন। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ৭৯। মূল্য : ১২৫ টাকা। উৎসর্গ : খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিক আলী ইমাম প্রিয়ভাজনেষু।

সাক্ষাৎকার সংগ্রহ ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩। প্রকাশক : মাওলা ব্রাদার্স। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ২৩২। মূল্য : ৩৫০ টাকা। উৎসর্গ : বাংলাদেশের কৃষি বিপ্লবের প্রধান কণ্ঠস্বর অনুজপ্রতিম শাইখ সিরাজ প্রীতিভাজনেষু।

গল্পসল্প ॥ প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৪। প্রকাশক : সময় প্রকাশন। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ৭২। মূল্য : ১২৫ টাকা। উৎসর্গ : খ্যাতিমান উপস্থাপক, লেখক ও সুবক্তা আবদুন নূর তুষার প্রীতিভাজনেষু।

সংকলন ও সংগ্রহ

স্বনির্বাচিত প্রবন্ধ ও রচনা ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০১, তৃতীয় মুদ্রণ : জুন ২০১৩। প্রকাশক : অনন্যা। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ৩৭৭। মূল্য : ৪০০ টাকা। উৎসর্গ : প্রয়াত সহযাত্রী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

গল্প-সংগ্রহ ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৩। প্রকাশক : অনন্যা। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ২১৪। মূল্য : ১৭৫ টাকা। উৎসর্গ : লেখক ও খ্যাতিমান অভিনেতা খায়রুল আলম সবুজ।

সেরা লেখা (১ম খণ্ড) ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭। প্রকাশক : অন্যপ্রকাশ। প্রচ্ছদ : মাসুম রহমান। পৃষ্ঠা : ৪৪০। মূল্য : ৬০০ টাকা। উৎসর্গ : আব্বা আযীমউদ্দীন আহমদ।

সেরা লেখা (২য় খণ্ড) ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮। প্রকাশক : অন্যপ্রকাশ। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ৪১৬। মূল্য : ৬৫০ টাকা। উৎসর্গ : মা বেগম করিমউন্নিসা।

কিশোর সমগ্র ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৯, তৃতীয় মুদ্রণ : মে ২০১৩। প্রকাশক : শব্দশৈলী। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ২৮৮। মূল্য : ৪০০ টাকা। উৎসর্গ : প্রতিভাবান শিশুসাহিত্যিক আমীরুল ইসলাম প্রীতিভাজনেষু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনা সমগ্র (১ম থেকে ৮ম খণ্ড) ॥ প্রকাশকাল : ফেরুয়ারি ২০০৬ - ফেব্রুয়ারি ২০০৮। প্রকাশক : অন্যপ্রকাশ। প্রচ্ছদ : মাসুম রহমান। মূল্য : ৫০০-৬০০ টাকা।

বক্তৃতা সংগ্রহ : ১ম খণ্ড ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩। প্রকাশক : সময় প্রকাশন। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ১৮৬। মূল্য : ৩০০ টাকা। উৎসর্গ : প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল প্রিয়বরেষু— একজন শুভহৃদয়সম্পন্ন অনন্য মানুষ।

বক্তৃতা সংগ্রহ : ২য় খণ্ড ॥ প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩। প্রকাশক : সময় প্রকাশন। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। পৃষ্ঠা : ১৯৭। মূল্য : ৩০০ টাকা। উৎসর্গ : স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন প্রিয়বরেষু— একজন শিল্পী, সংগঠক, অতন্দ্র পরিবেশ যোদ্ধা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~